কাপালিক তান্ত্রিক যোগী কথা

সোমব্রত সরকার



আমার কথা

ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গে তন্ত্র জিজ্ঞাসায় বইখানি শ্মশানে-শ্মশানেই তো লেখা। রাতের শ্মশানে অঘোরী সঙ্গ ও ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত তান্ত্রিক ভৈরবী অঘোরী কথা বই দুইখানি একইভাবে রচিত। প্রত্যন্ত গাঁয়ের শ্মশান। ইলেকট্রিক আলো এখনও সেভাবে আসেনি। শ্মশান আলোকিত হয় কেবল মরা মানুষ এলে। না হলে শুনশান, কোলাহলহীন। শিয়াল কুকুর ঘোরে; চিতা থেকে টেনে তোলে মানুষেরই আগুন না-পাওয়া টুকরো পাঁজরা। কুকুরের মুখে মানুষের হাড়ের গায়ে কিছুটা মাংস লাগানো দেখলেই সদানন্দ অঘোরী হাঁক দিতেন, ইঁয়ে ভোলা, ইদিকে আয় দিকি। ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে মাংস মুখে ভোলা এলেই অঘোরী বাবা মুখ নামিয়ে আনতেন ওর কাছে। ভোলা দিব্যি নিজে না খেয়ে চিতাকাঠে সেই আধপোড়া মানুষের হাড়ওয়ালা মাংস অঘোরী সাধুর মুখে ভরে দিতেন। তিনি একটু কামড়িয়ে মাংস তুলে বাকিটা ভোলার মুখে ভরে দিতেন। ভোলা এরপর সাধুর পায়ের কাছে বসে মাংস খুলে হাড় ভাঙত। কটকট একটা শব্দ হত। কখনও বা হত না শব্দ। শব্দহীন মাংস খেলে ভোলা, অঘোরী বাবা বলতেন, ইঁ মনিষটোর কুণ্ডলিনী তো হাঁ হয়ে ছ্যালো বাপ্। শক্তির শ্বাসে শরীরটোর মাতন, তু খা না কেনে ভোলার মুখ থেকে! আমি কী আর সেসব পারি! শ্মশানে থাকি বটে, ভোলা কড়মড় করে হাড় চিবোতে থাকলেই বাবা বলতেন, ইঁ ভোলা, তু দূর যা কেনে। বাসনাভরা শ্বাসটোর শব্দ ইংদিকে এলে কামের ঘোরে কাটান খাবে শরীরটোর। আমার দিকে চোখ উঠিয়ে বলতেন, ইঁ বড় খারাপ জিনিস, তুকে ও শ্বাসটো ছুঁয়ে তুয়ারাও কামের মাতন আসবেক, হেথাকে এ্যাঁয়াছিস। তু তো শিখে লিলে তুয়ার কুণ্ডলিনী শক্তিটো কামের কাটান দিব্যে, তু তো অঘোরী হয়ে যাবি। আমি কী আর অঘোরী হব বলে শ্মশানে পড়ে আছি নাকি!

সাধক বামাখ্যাপার প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন তারা খ্যাপা। ওঁর সাধনপীঠ ছিল পলাশীর মাঠে। চুয়াপুর শ্মশান। সেই শ্মশানভূমি আজ অবশ্য নেই। লোকালয় হয়ে উঠেছে। এখানে একসময় সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। এখন এই অঞ্চলে রয়েছে তারাখ্যাপা প্রতিষ্ঠিত উমাবনম আশ্রম, পঞ্চানন শিবের মন্দির। বর্মার রাজকুমার প্রিন্স থিবোর সমাধি। এটা গৌড়ের এলাকা। গঙ্গার অপর পারে কিরীটি পীঠ— একান্ন পীঠের অন্যতম। খ্যাপা ১৯৩৫ সালে উমাবনম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বামাখ্যাপা, তারাখ্যাপা শ্মশান সাধনা করলেও কখনওই ভৈরবী গ্রহণ করেননি।

তারাখ্যাপার শিষ্যা ছিলেন সুশীলা ভৈরবী। গুরুর মতো আশ্চর্য যোগশক্তির অধিকারিনী তিনি। তাঁর মেয়ে ভৈরবী যোগমায়া আমাকে বলেছেন, মা উমাবনম আশ্রম পেরিয়ে ভরা গঙ্গার জলের ওপর হেঁটে ওপারে কিরীটি পীঠে রাতের বেলায় সাধনা করতে যেতেন। আমি তখন যুবতীবেলার কিছু আগের বয়সের।

যোগমায়া মায়ের গুরু ছিলেন শঙ্কর খ্যাপা। আড়ংঘাটা শ্মশানের গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী উমানন্দ গিরি শ্মশানে গেলেই শঙ্কর খ্যাপার অলৌকিক যোগশক্তির কথা বলতেন। উমানন্দ গিরি শ্মশানে থাকেন ঠিকই, তথাপি শ্মশান সাধকদের মতো অনফর, অল্পশিক্ষিত তিনি তো নন। গেলে পরে তন্ত্রবিদ্যার নানা সাহেবী গবেষণার নথি আমার সামনে পেশ করেন। একবার কুলকুণ্ডলিনী নিয়ে কথা উঠলে তা গিয়ে শেষমেশ দাঁড়ায় অঘোরী সাধনার যোগে। মা বললেন, দাঁড়া তোকে একটা বই দিই আমি। এখানে যে অঘোরী সাধকের শ্মশান সাধনার কথা আছে তাঁর সঙ্গ করেছে রোবার্ট। সেই-ই লিখেছে বইখানা। মাসখানেক আগে এসে দিয়ে গেল। উমানন্দ গিরি আড়ংঘাটা শ্মশানে বসে আমার হাতে তুলে দিলেন Robert E Svoboda নামের সেই ভদ্রলোকের লেখা বই Aghori II : Kundalini. এই বই পড়তে গিয়ে দেখলাম শ্মশান সাধক অঘোরী বিমলানন্দ যেসব যোগশক্তির অধিকারী তার একটি সেই জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। ভৈরবী যোগমায়াও এই বিদ্যাটি জানতেন। ভরা শ্রাবণ। তারাপীঠের কাছে মুণ্ডমালিনীতলায় দ্বারকা তখন ফুঁসছে। মা ওপারে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে। পরক্ষণেই তিনি এ পারে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে! মাকে বললাম, আপনি কি অষ্টশক্তির অধিকারিণী?

আমার কথার উত্তর ঘুরিয়ে তিনি সুশীলা মায়ের প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বুঝলাম মুখে না বললেও তিনি অনেক গুহ্যবিদ্যা জানেন। মহাযোগী পরমহংস যোগানন্দ একখানি বই লিখেছিলেন। Autobiography of a Yogi. বহু প্রশংসিত এই আত্মজীবনীটি ছাব্বিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ওর ভেতরেও রয়েছে জলের ওপর হেঁটে যাওয়ার মতো যোগশক্তিগুলির ব্যাখ্যা। যোগীর দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, নিরাহারা দশা থেকে দুই দেহধারণের মতো শক্তিগুলির প্রয়োগবিদ্যার পাঠক্রম। একাধিক শরীরে আবির্ভূত হওয়াটা একপ্রকার সিদ্ধি, যা পতঞ্জলির যোগসূত্রে উল্লেখিত রয়েছে। উভয়ত্র আত্মপ্রকাশের ঘটনা যুগযুগান্তর ধরে বহু সাধুসন্ত, যোগী, তান্ত্রিক, মতাজিদের জীবনেই প্রদর্শিত হতে দেখা গেছে।

ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গে তন্ত্র জিজ্ঞাসায় তখন বেরিয়ে গেছি। অঘোরী সাধুদের নিয়ে লিখব বলে ছোটাছুটি করছি। বালুরঘাটে নেপাল রাজার বদান্যতায় তৈরি হওয়া একটা অঘোরী আশ্রম আছে। আশ্রম আছে কাশীতে। দু' জায়গাতেই প্রাচীনকাল থেকেই শবসাধনাটা হয়ে আসছে। কামাখ্যার তন্ত্রবিদ্যার প্রাচীনতার মতোই এই দুই জায়গার অঘোরী গুহ্যচর্চার একটা বহুবছর ধরে চলে আসা ধারাক্রমের মান্যতা আছে। কামাখ্যার মন্দিরের সংযোগ রয়েছে কোচবিহারের রাজপরিবারের সঙ্গে। জয়নাথ মুন্সীর লেখাতেই

উল্লেখিত রাজপরিবারে যোগিনীতন্ত্রের চল। সেই তন্ত্রবিদ্যার ক্ষণ-তিথি মেনেই রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী জয়নাথকে রাজোপাখ্যান লিখতে আদেশ করেন। সেটা উনিশ শতকের প্রথম দিকেরই ঘটনা। ১৮৩৫ সালে এই বই সম্পন্ন হয়। সেখানেই রয়েছে নরনারায়ণের সময় অসমের কামাখ্যা মন্দির ভগ্ন হওয়ারও কথা। সেটা ষোলো শতকের ঘটনা। এরপর মন্দির প্রতিষ্ঠা। রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবার জড়িয়ে পড়ে, তন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হন পরিবারের সদস্যরা। বালুরঘাটের অঘোরী আশ্রমটি নেপাল রাজার তত্ত্বাবধানে কোচবিহারের রাজাদের সময়সীমার। সেটা উনিশ শতকের আগেরই ঘটনা। রাজোপখ্যানে এই নেপাল রাজার তন্ত্রচর্চা তথা কাশীর তন্ত্র-সংযোগে কোচবিহারের চর্চা-কাহিনির গুরু-পরম্পরাটি উল্লেখিত। আমি প্রাচীন মরালী তীরবর্তী নদিয়ার একদা জনপথ প্রত্যন্ত হুদা শ্মশানে এসে যে অঘোরিণী মাতাজির দুই দেহ ধারণের মতো যোগশক্তির মুখোমুখি হয়েছিলাম, যা পরবর্তীতে বই হয়ে বের হয় সেই আখ্যানটি নিয়ে রাতের শ্মশানে অঘোরী সঙ্গ নামে। সেই মুণ্ডিত মস্তক দীর্ঘাঙ্গী মাতাজির গুরুঘর বালুরঘাটের অঘোরী আশ্রম। আর তাঁর গুরুর গুরু নাড়া বেঁধেছিলেন কাশীর অঘোরী আশ্রমে। সুতরাং হুদার মাতাজিও শ্মশান সাধনায় শবসাধনার করণক্রিয়াটিকে প্রাধান্য দেন।

প্রথম যেদিন আমায় শবের উপর উঠিয়ে সর্বাণী অঘোরিণী মাতাজি মহাশঙ্খের মালা হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিন আমার শরীরের সাড় চলে গিয়েছিল। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম সদানন্দ অঘোরী মাকে বলছেন, মাগো মালাটো লিয়ে লাও কেনে, উঁয়ার কুণ্ডলিনীটো জাগাং গেছে মহাশঙ্খের মালাটো সেটিং গিয়ে। আমি তো জানতাম চণ্ডালের মাথার খুলি কেটে বানানো জপের মহাশঙ্খের মালা বড় আজব জিনিস। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী তখন সাধনরত তাঁর গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গেণ্ডারিয়া, ঢাকার আশ্রমেই। ঠাকুর চণ্ডী পাহাড়ে যাওয়ার আগে কুলদানন্দ বাড়ি গেলে তাঁর মা তাঁকে কোঠাঘরে নিয়ে গিয়ে সিন্দুক খুলে একগাছা মালা বের করে বলেছিলেন, তোর ঠাকুরকে কত্তার এই জপের মালাছড়াটি দিস, তিনি এই মালাটি প্রত্যহ আহ্নিককালে জপ করতেন। এতকাল আমি গোপনে রেখেছি— কেহ ইহার খবর জানে না। কয়দিন যাবৎ তোর ঠাকুরকে দেব ভেবে রেখেছি। কুলদানন্দ তখন বাবার সেই জপের মালা চিনতে না পেরে মাকে বলেছিলেন, এ যে হাড়ের মালা— ঠাকুর এটা নিয়ে কী করবেন? কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ডায়েরিতে লিখছেন— মা বললেন, তুই বুঝবি না। এটি সাধারণ হাড়ের নয়। মহাশঙ্খের মালা। শনি মঙ্গলবার অমাবস্যায় চণ্ডাল মরলে তার অস্থি দিয়া এই মালা হয়। এ বড় দুর্লভ বস্তু। এ জিনিস কি তা তোর ঠাকুর বুঝবেন। ঠাকুরকে মালাটি দিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলাম— মহাশঙ্খের মালা কখন ধারণের অধিকার জন্মে? ঠাকুর বলেছিলেন— সর্বত্র সমবুদ্ধি' হলে এ মালা ধারণের অধিকার হয়। আর সে অধিকার না হতেই গলায় আমার মহাশঙ্খের মালা। শরীরে তাই শবের দশাপ্রাপ্তি

ঘটেছিল। যোগমায়া ভৈরবীকে ফুলিয়া শ্মশানে বসে এ মালা আমি তো তৈরি করতে দেখেছি খুলি কেটে কেটে।

কত কিছু যে জানার আছে সব আমি শ্মশানে বসে বসে জেনেছিলাম। মন্ত্রেরও নারী-পুরুষ। যুগল ভজনার প্রকৃতি-পুরুষ। এই তথ্যটি প্রথম আমাকে দিয়েছিলেন তাহেরপুরের দয়াল বাবা। একশো পেরিয়ে গিয়ে দিব্যি না খেয়ে-দেয়ে তিনি সারাদিনে একটু গাঁজা সেবা করে বেঁচে আছেন। সাধারণ বাহ্যক্রিয়া শরীরের— পায়খানা পেচ্ছাব কিচ্ছুই তাঁর হয় না। দয়ালবাবা বলেছিলেন, যেসব মন্ত্রের আগে হুঁ কথাটা যুক্ত আছে সেগুলো সব পুরুষ মন্ত্র। আর যে মন্ত্রের শেষে স্বহা কথাটি যুক্ত তা স্ত্রী মন্ত্র। পুং মন্ত্রকে মন্ত্র বলে। স্বহা মন্ত্র হল গিয়ে বিদ্যা। এই দুইয়ের যোগে মন্ত্রবিদ্যা। নমোঽস্তে মন্ত্রটি নপুংশক মন্ত্র।

দেবতার আদিতে ওঁ শব্দ আর পরে নমঃ শব্দ ব্যবহার করে যে মন্ত্র, সেগুলো সব গৃহীদের। তান্ত্রিক সাধকেরা ওঁ শব্দ ব্যবহারই করবেন না।

তন্ত্রবিদ্যার এইসব গুহ্যাচারের প্রধান জায়গা হল শ্মশান। তাই শাস্ত্রিক বিচক্ষণতার বাইরে প্রায় প্রান্তিকভাবেই দাঁড়িয়ে থাকা ভৈরবী। অঘোরী, ভৈরব, কাপালিক, ডাকিনী মা-গুরুদের যুগল সাধনা দেখব বলেই আমার দিনের পর দিন শ্মশানে পড়ে থাকা। পৌঁছে যাওয়া গ্রামের প্রান্তিক হাতায় ভৈরবীদের ডেরায়। সেইসব অভিজ্ঞতাগুলো লিপিবদ্ধ করে তৈরি হয়ে উঠল এই বই। এক অন্য জীবনের সমাজ কাহিনি।

সোমব্রত সরকার

সূচি

ঈশ্বর শরীরে, মূর্তি তো বাইরের ব্যাপার	১৩
শিব-শক্তির যোগের ইশারা	৫৮
প্রকৃতি সাধনার মূল উদ্দেশ্য বিন্দুধারণ	১০৭
মা থেকেই মায়া	১৫৬
দেহে ছেঁকাছেঁকির খেলা চলে অহরহ	২০৭

ঈশ্বর শরীরে, মূর্তি তো বাইরের ব্যাপার

১. দুর্গা হলেন সাধকের দুর্ভেদ্যতা

হালিশহর কোনা মোড় ছাড়িয়ে বিশালাক্ষ্মী ঘাট পেরোলেই শীতলাতলার সম্মুখে পূর্ণ সাধুর আশ্রম। লোকমুখে তিনি ফক্করবাবা। আশ্রম বলতে গঙ্গার কিনারায় বন-জঙ্গলে ঘেরা খানিকটা পরিত্যক্ত জমি, জমির আসল মালিক শুনেছি শ্যামদাস গুপ্তবাবুরা। পূর্ণ তার উপরে ঘর বেঁধে আছে বহুকাল ধরে জমিটার মাঝ বরাবর। মাথায় চালা ঠ্যাকে। হাত ছয় সাত প্রস্থে দৈর্ঘ্যে ছোট, বারান্দাসহ মাটির দেয়াল দেওয়া ঝুপড়ি ঘরখানিতে পূর্ণ থাকে। উত্তর সীমানায় আর একটু বড় আকারের প্রায় অনুরূপ বেড়া দেওয়া টালির ছাউনি ঘর। ওখানেই থাকেন মহেশ বাবা। সঙ্গে আছেন ওঁর সাধনসঙ্গিনী লীলা মা। নিভৃত নিলয়। পশ্চিমে গা ঘেঁষে গঙ্গা বইছে। বর্ষাকালে সীমানার ভাঙন পেরিয়ে উঠে আগে আসত গঙ্গা। এখন প্রতিরোধ পেয়েছে। সরকারি ওয়াল। এর ধারেই অন্য আর এক মালিকের একখণ্ড জমি। সেখানে ইট বাঁধানো দুর্গামাতার আশ্রমবাড়ি। মূর্তি নেই। ঘটে পুজো হয়। লীলা মা পুজো সারেন। মহেশ বাবার দুর্গামূর্তিতে বিশ্বাস নেই। বললে বলেন, শরীরের ভেতরই দুর্গা রয়েছেন। আলাদা করে আর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার দরকার কী? মহেশ বাবা তাহেরপুরের বয়সের গাছ-পাথর পেরোনো সাধক দয়াল বাবার শিষ্য। কেউ বলেন, বাবার বয়স একশ বিশ, কেউ বা একশ তিরিশ। আমি গেছি ওঁর ওখানে। ছিন্নমস্তার উপাসক। বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছেন দিনে একবার গাঁজা সেবা করে। যোগমার্গের সাধক তিনি। মহেশ বাবা তাঁরই উত্তরাধিকার। তাই দুর্গার স্থূলতায় বিশ্বাস নেই ওঁর। গাছগাছালিঘেরা ঘোমটা দেওয়া সেই নির্জন ভূমিতে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম মহেশ বাবাকে, দুর্গা কি আপনার চোখে?

বললেন— দুর্গাই বলুন আর কালীই বলুন দেবী হলেন আসলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। মূর্তি তো তাঁদের স্থূলরূপ বই আর কিছু নয়। সাধক দেবদেবীর দর্শন পান। কীভাবে পান জানেন?

বললাম— কীভাবে?

এই কুলকুণ্ডলিনীকেই জাগ্রত করে। দেবীর বাস মূলাধার চক্রে। আমরা তাঁরই বন্দনা করি দেহাচার দিয়ে। মেরুদণ্ড কী জানেন আমাদের?

— কী?

— মেরুদণ্ড হল মেরুপর্বত। মস্তিষ্ক দেবভূমি। মেরুপর্বতেই দেবী পার্বতীর বাস।

— এর অন্তর্গূঢ় রহস্য যদি একটু বিস্তারিত বলেন?

— রহস্যের কিছু তো এখানে নেই! সবই পরিষ্কার।

বললাম— দেবীর শরীর রহস্যের আধারটি আসলে বিস্তারিত জানতে চাইছি আপনার কাছে? কীভাবে দেবী শরীরস্থ হচ্ছেন?

বললেন— কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠে শক্তিদেবী মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্না বেয়ে সহস্রারে উঠে পড়ে কূটস্থানে বিলীন হন। মেরুদণ্ডকে আমরা বলি মেরুপর্বত। মস্তিষ্ককে দেবভূমি। মূলাধার হল পৃথিবী। যা কিনা আমাদের স্থূল দেহাঞ্চল। যখন শক্তিদেবী বা আমাদের আরাধ্যা দুর্গা মেরুপর্বতের শিখরবাসিনী হয়ে পড়েন তখনই তো তিনি দেবী পার্বতী। দেবীকে তো চণ্ডীই বলছি আমরা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে দেবী চণ্ডী হচ্ছেন? আর দুর্গার ব্যাখ্যাও স্পষ্ট হল না যে! তিনি তো হয়ে উঠলেন পার্বতী।

মহেশ মহারাজ হাসলেন।

বললেন— শক্তির ব্যাখ্যা কি অত সহজ মনে করেন আপনি? শক্তির কল্পনা আমাদের রূপারাধ্য। তাঁর শারীরিক প্রকাশময়তার অর্থটুকু কেবল বলা যায়। এর বেশি কিছু নয়।

— চণ্ডীর প্রকাশ তাহলে, আপনার মতে কীরকম?

— চণ্ডী হলেন পরব্রহ্ম মহিষী। ব্রহ্মশক্তি আপনি বলতে পারেন। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া— এই ত্রিশক্তির সমষ্টিভূতা হলেন দেবী চণ্ডী।

— আর দুর্গা?

— দুর্গা হলেন সাধকের দুর্ভেদ্যতা। দেবী যে সিংহবাসিনী তার কারণ কী মনে হয় আপনার?

বললাম— কী?

— সিংহ তো এখানে শরীরের তাৎপর্য দ্যোতক।

— কীরকম!

— সিংহ হলেন সাধক শরীরের গতি, বিবর্তন, পরিণতি।

— কীভাবে?

— সিংহ তো আর বনের পশুরাজ নয়, সিংহ হল মানুষের পাশবদ্ধতা। পাশ না গেলে মানুষ কীভাবে বা শিব হবেন শুনি?

— অর্থাৎ আপনি বলছেন, কুলকুণ্ডলিনীর বিজয় উৎসবেই সিংহ শরীরের পশুরাজ।

আপনি ধর্ম-আধারের মানুষ। বহু সঙ্গে ঘোরাফেরা করেছেন। এ তো আপনার অজানা নয়। তবু বলি সহস্রারে শক্তি না গেলে পাশবিকতা যাবে কেমন করে? সাধন শরীর দুর্গা তখনই, যখন তার সম্পূর্ণ পাশবিকতা নাশ হয়ে যাবে। পাশ নাশ হলেই তিনি পশুশ্রেষ্ঠ, সিংহাবতার। ধর্মে যে অবতারবাদের অস্তিত্ব সেগুলো কী মনে করেন আপনি?

বললাম— শরীরক্রিয়া বলছেন আপনি?

— কেন ন বলুন? হিন্দুধর্ম দেহগত। তার যে আকার আছে, মূর্তি আছে। সে তো নিরাকারের কথা বলেনি। এই আকারকে আমরা মাটির পুতুল বলে ভুল করি। কিন্তু যখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় পুজোয় তখন মৃন্ময় চিন্ময় রূপ নেয়। এই চিন্ময়তা তো আসলে শরীরের। শরীর ধারণ করে আছে আমাদের মূর্তি কল্পনার যাবতীয় ক্রিয়াবৈকল্য।

— অবতারবাদের শারীরিক তাৎপর্যটা তাহলে কীভাবে আসছে শরীরে?

— কীভাবে আসছে কী! তার যে শরীরে অনায়াস পদচারণা।

— কেমন করে? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— আমাদের ধর্মে প্রথম অবতার কী?

— মৎস্য।

— মনে রাখবেন মৎস্যর সঙ্গে জলযোগ আছে। এই জল কী মনে করেন আপনি?

— মানুষের জ্ঞানসমুদ্রের ইঙ্গিত রাখছেন আপনি এটা বুঝতে পারছি।

— ইঙ্গিত কী! এ যে শরীর অভ্যন্তরের বাস্তবতা। দ্বিতীয় অবতার কী?

বললাম— কূর্ম।

বললেন— মানুষের মানসিক অবস্থান হল গিয়ে কূর্ম। উভচর, জল ও ডাঙায় থাকে। জল, সমুদ্র হল জ্ঞান আর ডাঙা হল ব্যক্তিসত্ত্বা।

— আপনারা তো বলেন এই ব্যক্তিত্বটাই কাটানো আপনাদের ধর্ম।

— তাই তো, বরাহ অবতার তো সেই কথাই বলছে।

— কীভাবে?

— বরাহ ডাঙায় থাকে। যাকে বলছি ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বরাহ সাঁতার দিতে পারে প্রয়োজনে। এটা তো জানেন?

— হ্যাঁ, তবে তারা খুব জলে নামে না।

অতি মৃদু হাসি হাসলেন মহারাজ। আশ্রমে রোদ নরম হয়ে আসার মতো। মেঘ লেগেছে আকাশে। তার ছোঁওয়া আশ্রমের রোদেও। কুলকুল করে নদীর বয়ে চলার মতো করেই এখানে হাওয়া বইছে এখন। দুর্গামাতা আশ্রম। গঙ্গার ধার ঘেঁষে। বহুকাল আগের আশ্রম। ভাটপাড়ার কাছাকাছি এই অঞ্চল। একসময় সংস্কৃতচর্চার জোয়ার বইত এখানে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীজীব ন্যায়রত্ন মশাইরা হেঁটে বেড়াতেন এসব গলিপথে। প্রাচীন এলাকা সব। লীলা মা একেবারে ছোট্ট বয়স থেকেই এখানে। মায়ের গুরুদেব দুর্গানন্দ স্বামী। তিনি দেহ রেখেছেন একযুগ হয়ে এল। এখানে তাঁর সমাধি রয়েছে। পাশে সাধনসঙ্গিনী, ভৈরবী হৃদয়ময়ীর সমাধি। লীলা মা দুর্গানন্দ স্বামীর মানসকন্যা। দুর্গানন্দ স্বামী ও দয়াল বাবা গুরুভাই। দুজনে দুজনার শিষ্য-শিষ্যাকে এক করেছেন তন্ত্রে যুগল সাধনার কারণে। তাহেরপুরে দয়াল বাবার আশ্রমের মহেশ মহারাজ পাকাপাকিভাবে এখানে চলে আসেন ভৈরবী মায়ের গুরুদেব দেহ রাখার পর। পুরনো মানুষজন এখনও বলেন দুর্গানন্দ স্বামীর আশ্রম। তার পাশের একচালাতে বসেই আমাদের কথাবার্তা ভগবানের অবতারবাদে এসে ঠেকেছে এখন।

মহেশ বাবা বললেন— কূর্ম জলে থাকে না সবসময় যেমন, তেমন সব শরীরই কি আর সাধন আধার পায়! পায় না। সেইসব শরীর থাকে ব্যক্তিত্ব নিয়ে হেজেমজে। সাধনে ব্যক্তিত্ব কাটে। তখনই কূর্ম অবতার হতে হয় সাধককে। ব্যক্তিস্বরূপকে তখনই আবদ্ধ জলাশয়ে না রেখে সাধক সাঁতরে পেরোতে চান। এরপরই জেগে ওঠে সেই নৃসিংহ অবতার। যার মাথা সিংহের। শরীরটা মানুষের। এই অবতার মানুষের পশুচেতনাকে ইঙ্গিত করে। যেখানে ক্ষুদ্রতা, নীচতা সব আবদ্ধ থাকে। তার থেকে উত্তীর্ণতার জন্যই তো এই প্রতীক অবতারের জন্ম।

— আর পঞ্চম অবতার বামন অবতার?

— ওই যে বললাম, ক্ষুদ্রতা, নীচতা এসবই হল বামনত্বের লক্ষণ। তারপরই দেখুন আবার জন্ম হচ্ছে পরশুরামের। যেখানে মানুষের বিকাশপথের সূচনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে?

বললেন— পশুর অর্থ রামের শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরই অবতার হয়ে আসছেন তো রাম। পশুত্বের বিনাশ এখানে এমনভাবে হচ্ছে।

বললাম— অষ্টম অবতার বলরামের ইঙ্গিত কী নির্দেশ দিচ্ছে?

— বলরাম কথার অর্থকী?

— হলধর।

— এই হল আসলে সাধকের শরীর কর্ষণের বস্তুচিহ্ন। বস্তুবোধ এই কর্ষণের পরে বিলুপ্ত হয়ে যায় সাধকের। সাধক তখন নিষ্কলঙ্ক কল্কি হয়ে ওঠেন। এভাবেই বুঝলেন দশ অবতার আমাদের শরীরের যোগকে সামনে আনে। তন্ত্র বলে আগে ভোগ তারপর হল গিয়ে যোগ। অনেকে ভাবেন ভোগ হল ভৈরবী শরীর। কিন্তু এ তাঁরা বোঝেন না, ভোগ হল শরীর যোগের প্রস্তুতি। শরীরকে ভোগ করতেই যোগ লাগে। শরীরের ভোগেই দুর্গা-কালীর জন্ম হয়। জন্ম হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক আর গণেশের। এগুলোর ক্রিয়ারূপ জানেন কিছু?

বললাম— আপনার কথাই যে শুনতে এসেছি। আপনি বলুন আপনার বোধ, উপলব্ধি।

বললেন— লক্ষ্মী হলেন সর্বৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যের রশ্মিতে আলোকিতা দেবী। এই ঐশ্বর্য তো আসলে প্রতীকীরূপ। সমুদ্র মন্থনের ফলে লক্ষ্মী উঠলেন প্রথমে। কী এই লক্ষ্মী জানেন?

— কী?

— ইন্দ্রিয় মন্থন করেন সাধক। কাম, ক্রোধ, লোভ সবই তাঁরা সমুদ্ররূপী শরীর থেকে বের করে দেন। এরফলে তিনি সহস্রারে গিয়ে মহাজ্যোতির্ময় প্রভা দেখে থাকেন, যা লক্ষ্মীরূপ। তা সাধক শরীরে উত্থিতা দেবী-অবয়ব। এগুলো হল গিয়ে সব সাধকের সত্ত্বগুণ। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, তপস্যা, ক্ষমা, সেবাভাব ও তিতিক্ষা। এসব লাভের জন্যই সাধককে পেচক বৃত্তি পালন করতে হয়। তিনি লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাও হয়ে ওঠেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে সাধক পেঁচা হন?

বললেন— লক্ষ্মীর জাগতিক রূপ কী জানেন?

বললাম— ধন, মান, ঐশ্বর্য, যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি এইসব।

— তা এইসব পেতে তো অধ্যাবসায় লাগে। পরিশ্রম করতে হয়।

— তা তো করতেই হবে।

— ঠিক, ঠিক। ঠিক বললেন আপনি। পেঁচা কী মনে হয় আপনার?

— আপনি বলুন। আপনার কথাই তো শুনতে এসেছি।

— পেঁচা হল শরীরের অন্ধকার। সাধক ধ্যানে, যোগে, মনোনিবেশে এইসব অন্ধকারকে দূর করেন যে। পেঁচাকে বাহন করেই এগিয়ে যান। এগিয়ে যান তিনি লক্ষ্মীলাভে। একইভাবে যে তিনি সরস্বতী লাভ করেন। সরস্বতী জ্ঞানের প্রতীক।

লক্ষ্মী সম্পদের। কার্তিক শৌর্যের। আর গণেশ শ্রমের। এসবই কিন্তু দুর্গাবার্তাতে সামিল। সাধক সব নিজ শরীরে সাজিয়ে নিজেই দুর্গার অভ্যন্তরের সাধনায় মেতে থাকেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে সাধক এই শরীরময়তায় মাতেন?

বললেন— শক্তি মুক্তা হন গণেশের সাধনায়। মূলাধারের কুণ্ডলিনীর বন্ধনে গণেশ থাকেন ঘুমিয়ে। শক্তিদেবী তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বন্ধন মুক্ত করেন। গণেশের বাহন কি জানেন?

— কী?

— আমাদের ইন্দ্রিয়বত্তা। সেগুলোকে কাটাকাটির ফলেই তো জ্ঞানবিস্তার। এখানে সরস্বতীর জাগরণ ক্রিয়া। হংস কেন তাঁর প্রতীক জানেন?

— কেন?

— হংস পাখি দুধ ও জল মিশিয়ে দিলে তা থেকে দুধটুকু তুলে নিতে পারে ঠোঁটে। সাধকের জ্ঞানবত্তাও যে তেমন। জ্ঞান এলেই ঐশ্বর্য আসছে। তখনই লক্ষ্মীর আগমন। কার্তিকের বাহন ময়ূর কেন?

বললাম— কেন?

বললেন— ময়ূরের মনোলোভা সৌন্দর্যের উপলব্ধি সাধকের নাড়িক্রিয়ায় হয়। সাধক তখন শৌর্যবান হন। শরীরের সমস্ত যোগাস্ত্রকে সাজিয়ে দেব সেনাপতি হয়ে ওঠেন। দুর্গারূপী শক্তিদেবী তখনই যে অসুরবোধে সামিল হয়ে বধে মত্ত হয়ে ওঠেন।

— কীভাবে দুর্গা অসুর বধ করেন?

— অসুর তো সাধক শরীরের অশুভ নিয়ন্ত্রা সব। যার নিধন হয় যোগে। এগুলো সব হল গিয়ে মানসিকতা।

বললাম— আপনাদের কল্পনা সব।

— কল্পনা কী বলছেন! এগুলো সব আকর। মূল তো শক্তির উপলব্ধি। শক্তি ছাড়া একদণ্ড চলে কী জীবন, পৃথিবী?

— বলছেন সেই শক্তির ক্রিয়ারূপ দেবদেবী?

— শুধু দেবদেবীর ভাবনা কেন! শক্তির ক্রিয়া তো আমরা নিজে। সবাই আমরা যে শক্তির বশীভূতা।

মহেশ মহারাজ যতক্ষণ কথা বলছিলেন, চুপ করে বসেছিলেন তাঁর সাধনসঙ্গিনী ভৈরবী লীলা মা। আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিং থাকায় সময়মতো উঠে গেলেন মহারাজ। তখন আমি আর মা পাশাপাশি বসে।

লীলা মা বললেন— অধ্যাত্মবাদের রূপারূপ সবই যেমন দেহগত বাবা, তেমনই আধার তার ঘুরেফিরে দেহকে ব্যবহারিক পর্যায়েরই। তাই এখানে ভ্রূণ আসে।

বললাম— ভ্রূণ তো নতুনের আগমন। তার জন্য তো শারীরিক মিলন দরকার।

— হ্যাঁ, সে তো আমাদের সাধনার অঙ্গ বাবা।

— কিন্তু সেখানে ভ্রূণ কোথায়! আপনারা তো সংসারধর্মে, সন্তান ধারণে বিশ্বাসী নন একেবারে।

— তা ঠিক। দেহ পরমশূন্যতা। সেখানে শক্তি সাজে। এই সাজই তো ভ্রূণ বাবা। দুর্গার কথা চলছিল, তাঁর পুজোর সময় মূর্তির পেছন যে শিবরূপ সাজানো তার তো দুই রূপ।

— ঠিক স্পষ্ট হল না আপনার কথা।

লীলা মা বললেন, এক রূপে সূক্ষ্মতায় শিব-শক্তির মিলন। আর স্থূলতায় সাধক ও সাধিকার মিলন। এই মিলনের স্থূলতাই তো সূক্ষ্মতায় চলে যায় বাবা। সেখানে সৃষ্টি হয় শুধু শক্তির উপলব্ধির বোধ। আর কিছুই নয়। শক্তির প্রজনন সাজে যে।

বললাম— কীভাবে?

বললেন— শক্তি পুজো কী জানো বাবা?

—কী?

— শক্তিপুজো উর্বরাশক্তিতে সামিল, দুর্গাদেবী উর্বরতার প্রতীক। বোধনে যে তাঁর মূর্তি নেই, সাক্ষীরূপ বেলগাছ; তারপরই নবপত্রিকা স্নান, এসব কী জানো?

— কী?

— সব হল গিয়ে শস্যময়তা। নবপত্রিকাতে গাছ নির্বাচন দ্যাখো তুমি।

বললাম— কলাগাছ।

— এই গাছ শক্তিদণ্ড, বেলগাছ শক্তিধারক। এতো মিলনের ইঙ্গিত।

বললাম— তা ঠিক। এই মিলন তো হল আপনার বলা সেই সূক্ষ্মতার প্রতীক।

— স্থূলতা তার যা সবই প্রজননের।

— কীভাবে?

—নবপত্রিকাতে কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান কচু ও ধান বেঁধে দেওয়া হয় কলা গাছের সঙ্গে। এভাবে নবপত্রিকা শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে হয়ে ওঠেন শস্যবধূ। এগুলো হল সব ভ্রূণচিহ্ন স্থূলতার।

— এখানে সূক্ষ্মতা কী?

— এগুলো সব দেবীশক্তি। বেদে শক্তির ষোলো নাম আছে। নবপত্রিকায় নয়টি প্রতীক ষোলো নামের নয়টি শক্তিনাম।

— কলাগাছ কীসের প্রতীক?

— ব্রাহ্মণী।

বললাম— তাহলে সেটি শক্তিদণ্ড হল কীভাবে।

ব্রহ্মাণ বিদ্যা লাভ হয় সাধনায়। তার শক্তি হলেন ব্রাহ্মণী। তাহলে শরীররূপী কলাগাছ শক্তিদণ্ড হল না? ঠিক এইভাবে কচু কালিকা, হরিদ্রা দুর্গা, জয়ন্তী কার্তিকী, বিল্ব শিবা, ডালিম রক্তদন্তিকা, অশোক শোকরহিতা, মান কচু চামুণ্ডা, ধান লক্ষ্মীর প্রতীক। তুমি আমি সকলেই বাবা শিবমত্ততার প্রতীক। শক্তি সেখানে বিরাজমানা। সক্তি নিহিতার্থ বোধ। যা শনাক্তের দাবি রাখে। শক্তি জিজ্ঞাসার আধার। যা জানতে তুমি এতদূর এসেছ বাবা। এই জানাজানির শেষ হবে না কোনওকালে। শক্তি তাই মহাকালী। শক্তি তারণ। শক্তি তন্ত্র। তারই জিজ্ঞাসায় তোমার-আমার সকলের ছুটে মরা। শক্তি অনন্তস্রোত। দ্যাখো এই গঙ্গার জোয়ার-ভাটারই মতো। আসে, চলে যায়। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

আমি এই শক্তির মূর্তির সংজ্ঞায় এখন বসে আছি দুর্গামাতার আশ্রমে। এক শিষ্যার আহ্বানে মা উঠে চলে যাওয়ার পর একা বসে বসেই ভাবছি ঘাটের গায়ের এই একচালায়, শক্তি কি তাহলে দেবায়তনের প্রাণপরিসর কেবল! যা মহেশ মহারাজ আর লীলা মায়েদের যৌথতায় নিহিত আছে। না কি শক্তি একার নির্জিত প্রতিনিধি হয়েও দাঁড়িয়ে আছে যার যার নিজের ভেতর! দুর্গাশক্তির জয় হোক আমাদের একক ও যুগল সাধনায়।

২. শরীরের নাড়িগুলোর ওপর প্রভুত্ব ফলাচ্ছেন রাম

মাজদিয়া স্টেশনে নেমে ভ্যানরিকশাতেই পৌছানো যায় শিব নিবাস। নেমে অবশ্য মরা জলঙ্গীর শাখা পেরোতে হয়। নদীর ওপর নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। সাঁকো পেরোতে পারানি লাগে এখন পঞ্চাশ পয়সা। পেরোলেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এলাকা। শিবনিবাস। লোকে অবশ্য মরা জলঙ্গীর সোঁতাকে খড়ে নদী বলেই ডাকে। শিবনিবাসেই প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঝোপজঙ্গল ভরা পলেস্তারা খসা বাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আর এখানেই রয়েছে বলা হয় এশিয়ার বৃহত্তম শিবলিঙ্গ। মই দিয়ে বেয়ে উঠে বাবার মাথায় জল ঢালতে হয়। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে মেলা বসে। লোকে বলে শ্রাবণী মেলা। এখানে রামনবমীতেও মেলা বসে। রয়েছে রামসীতার মন্দির। নিত্য পুজো, অন্নভোগ হয়। লোকজন আসেন। তবে দর্শনার্থী ভিড় করেন বেশি রামনবমীর সময় আর শ্রাবণে ও চৈত্রে। তারকেশ্বরে

যাওয়ার যেমন ধুম পড়ে, নদিয়ার মানুষ যাঁরা অতদূর সব সময় পারেন না শ্রাবণে, চৈত্রে বাবার মাথায় জল ঢালতে ছুটে যেতে তাঁরা এখানে আসেন। ভিড় করেন। জল ঢালেন। পুজো দেন। এছাড়া সোমবার বাবার জন্মবার বলে প্রায় সোমবারই বেশ কিছু মানুষের সমাগম ঘটে। রামসীতার মন্দিরে মাসের দু'পক্ষের নবমী তিথিতেই বেশ পুজো পড়ে। রামসীতার সিংহাসনের দ্বারে রক্ষী হনুমানও আছেন। শনি, মঙ্গলবার তাঁকেও পুজো দিতে ছুটে আসেন পার্শ্বস্থ গ্রামের মানুষ। সুতরাং কমবেশি ভিড়ভাট্টা এখানে সবসময়ই কিন্তু লেগে থাকে। একবার রামনবমী তিথিতেই গিয়েছিলাম শিবনিবাসে দয়াল বাবার আমন্ত্রণে। বাবা একশোর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। তাহেরপুরে তাঁর আশ্রম আছে। তন্ত্রসাধক হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি আছে দয়াল বাবার। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তশিষ্য আসেন তাঁর কাছে। আমারও সেখানে যাতায়াত আছে। শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ দয়াল বাবা। বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, সাংখ্যদর্শন, যোগের নানা ব্যাখ্যা তাঁর একেবারে ঠোঁটস্থ। ভাবময় মানুষ তিনি। সবসময় সেখানে বিচরণ করেন। তা এই বাবার ডাকেই গিয়েছিলাম শিবনিবাসে। রামায়ণের পাঠ নয়, ব্যাখ্যা নাকি রাখবেন তিনি সেখানে রামনবমী তিথিতে। বাবার কথামতো সেবার বেলাবেলি গিয়ে পৌঁছলাম শিবনিবাসে। দুপুরে অন্নভোগের প্রসাদ পাবার পর বিশ্রামের সময়ই বাবা মেতে উঠলেন রামায়ণের শরীরী ব্যাখ্যায়। ভক্তশিষ্য কেউ নেই। দু'একজন ইতিউতি রয়েছেন বাবার ঘরের মেজেয় বসে। আমি খাটে হেলান খেয়ে। টুলের ওপর রাখা 'বাল্মীকি' আর 'কৃত্তিবাস'। আমার চোখ চলে গেল একসময় 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর প্রচ্ছদপটে আঁকা রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনবাসের ছবির ওপর। জ্বলজ্বল করছে রাম- লক্ষ্মণের সুঠাম শরীর। তাঁদের মাঝখানে সলাজ সীতাও চলেছেন বনপথ অতিক্রম করে। আমার মনস্কতায় বাবা এবার নড়ে উঠলেন।

বললেন— মাধুরীর কিছু নেই রে ওখানে। সবই শরীর পড়ে আছে। তোর আমার শরীর সব রামায়ণের মূল চরিত্রগুলোর পাতায় পাতায় লেখা রে। রামায়ণ হল শরীর। ও কী আর গল্প রে। ও হল আধ্যাত্মিকতার স্তর। সাধক শরীরের প্রয়োগ। রামায়ণ হল পরীক্ষিত সত্য সাধকের।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে রামায়ণ পরীক্ষিত সত্য সাধকের? একটু যদি খুলে বলেন।

বললেন— রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি কে?

বললাম— অবশ্যই রাম।

বাবা বললেন, এই রামই শরীর।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে রাম শরীর হল?

বললেন— রাম হলেন প্রভুত্ব শক্তি আমাদের শরীরের।

বললাম— প্রভুত্ব তো সাধক শরীরকে একমাত্র কুণ্ডলিনীশক্তি করে বলেই জানি।

হাসলেন বাবা।

বললেন— তোর কথা তো একেবারেই সঠিক। রামায়ণকে শরীর বলছি আমি সাধকের আর সেই শরীরে কুণ্ডলিনীর জাগরণ থাকবে না তা কি হয় রে কখনও?

জিজ্ঞাসা করলাম, কুণ্ডলিনী বা শক্তি তো নারী আধার। তাহলে রাম কীভাবে কুণ্ডলিনীর...

বলতে দিলেন না বাবা।

বললেন আমাকে থামিয়ে দিয়ে।

— রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র তুই-ই বললি যে রাম। তাহলে রাম কীভাবে শক্তি হবে রে? শক্তির আধার তো তার কেন্দ্রে রে। রামই হল আসলে সাধকের শরীর।

— কোন যুক্তিকতায় কীভাবে রাম শরীর পাচ্ছে সাধকের? না কি এ শুধু কল্পনা শরীরের?

— কল্পনা কেন হবে রে। আধ্যাত্মিকতা হল গিয়ে অতীন্দ্রিয় দর্শনের রূপ। যে দর্শনে সাধকের মনে সূক্ষ্ম দর্শন ঘটে। তার জন্য আগে স্থূলত্বের বিনাশ যে দরকার বাবা।

— কীভাবে হয় তা?

— একমাত্র উপায় হল গিয়ে তার যোগ। মানবদেহে পরমাত্মার বিরাজের কথা আমাদের ধর্ম যে বলছে। সব শরীরে তাঁর বসবাস। যোগ সাধনায় না এলে তাঁকে দেখা, বোঝা সহজ নয়। ঈশ্বর তো শরীরে। মূর্তিরূপ তো তাঁর বাইরের ব্যাপার। প্রতীকমাত্র। রামায়ণের চরিত্রগুলোরও আসলে প্রতীক।

— রাম তাহলে কীসের প্রতীক?

— রামায়ণের রাম যেমন কেন্দ্রীয় চরিত্র। তেমনই অধ্যাত্মবাদে, যোগে তাঁকে তো যোগ শরীর হিসেবে দেখাই যায়।

— কেমন করে?

— এ তো স্বাভাবিক ক্রিয়া। রাম হলেন আমাদের স্থূল শরীর। সেখানে ৭২০০০ নাড়ির অবস্থানের কথা বলছে যোগশাস্ত্র। সাধক শরীর বা রাম এই নাড়িগুলোর ওপরই প্রভুত্ব ফলাচ্ছেন। এই প্রভুত্ব তিনি করছেন নিজের শরীরের

ওপর। তাই তিনি হলেন রাজা। এই প্রভুত্ব, কর্তৃত্বের জন্যই যে তাঁকে বলা হচ্ছে রাজা রাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে এবার শরীরে লক্ষ্মণের অস্তিত্ব কীভাবে আসবে শুনি?

— এ তো এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নাড়ি জাগবে কীভাবে?

বললাম— যোগে। যোগচর্চায়।

বললেন— তাহলে দাঁড়াল কী?

— কী?

— চর্চার জন্য দরকার গভীর মনঃসংযোগ। এই মনঃসংযোগই হল লক্ষ্মণ রে। এই মনঃসংযোগ না হলে কুণ্ডলিনী জাগবে কীভাবে?

— কুণ্ডলিনী তাহলে সীতা বলছেন?

— হ্যাঁ। তুই দেখ তলিয়ে। লক্ষ্মণের একমাত্র লক্ষ্য রামের সঙ্গে সঙ্গে থাকা। রাম বলছি পরমাত্মা। এই পরমাত্মা তো যোগ সাধনার অর্জিত গভীর কল্পাকল্প অনন্ত শূন্যতা। এই শূন্যতা এনে দিতে পারেন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণই শরীরের প্রথম পদ্মচক্র মূলাধারকে জাগাতে পারেন। মূলাধারস্থ শক্তি তখনই সীতা হয়ে ওঠেন। লক্ষ্মণের লক্ষ্য মহাশূন্যতার পথ। যেখানে পরমাত্মারূপ রাম রয়েছেন। তাঁর জন্যই সীতার জাগরণ। সীতাই কুণ্ডলিনীকে জাগাচ্ছেন। শক্তিকে কর্ষণ করেছেন সীতা। রামায়ণে আছে যে, জনক রাজা সীতাকে হলকর্ষণ করতে গিয়ে পেয়েছিলেন। সাধক তাঁর শরীরকে জনক রাজার মতোই কর্ষণ করে থাকেন। এই কর্ষণে সীতা উঠে আসেন। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটে।

জিজ্ঞাসা করলাম এবার, তাহলে রাজা দশরথ?

দয়াল বাবা বললেন, দশরথ সাধকের দশটি ইন্দ্রিয় রে। এই দশ ইন্দ্রিয়ই তো সাধককে পরমাত্মার জ্ঞান দেয়। রামের হদিশ মেলে। তাই তো দশরথের ছেলে রাম।

— আর রাবণ? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— রাবণ হলেন লঙ্কার রাজা। রামায়ণে তো তাই আছে রে।

বললাম— শরীরে লঙ্কা কোথায় পাবেন আপনি?

— কেন রে? ও তো শরীরেই আছে রে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়?

— মূলাধারের লং বীজই হল রে সাধকের লঙ্কা। সেখানকার অধিপতি হলেন রাবণ।

— তাহলে তাঁর দশ মাথা? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— ওগুলোই তো ইন্দ্রিয় রে। রাবণের অর্থ কী জানিস?

— কী?

— রাবণ হলেন সাধকের অহঙ্কার। আত্মম্ভরিতা। যার ত্যাগ না হলে পরমাত্মার অনুভূতি হবে না যে শরীরে। এই জন্যই যে রাবণের দশ মাথা। দশটি ইন্দ্রিয় সীতাকে, কুণ্ডলিনীকে বিপথে চালিত করতে চায়। রাবণ যে সীতাকে অপহরণ করলেন তা কী জানিস আসলে এই দেহসাধনায়?

জিজ্ঞাসা করলাম; কী বাবা?

বললেন— সীতা হলেন সাধন শরীরের কুণ্ডলিনীশক্তি। যাকে রাবণরূপী ইন্দ্রিয় আটকে রাখতে চায়। হরণ করে। তার জন্যই যুদ্ধ বাধে রাম-রাবণের। এই যুদ্ধ যে বাবা, সাধক শরীরেও ঘটে।

— কীভাবে?

— লক্ষ্মণ মনঃসংযোগের সীতাকে জাগান। শরীরে কুলকুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ ঘটতে থাকে। শক্তি চক্র ভেদ করতে থাকে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর— এইভাবে। কিছু শক্তি যখন আয়ত্ব হয় সাধকের তখনই সাধক অহংকারী হয়ে ওঠেন। অনেক সময় ভক্তশিষ্যদের মধ্যে সেই শক্তির জাগরণকলা দেখাতে থাকেন। তখনই ইন্দ্রিয়দমন করার জন্যই লক্ষ্মণ জাগেন। মনঃসংযোগে রাবণকে হারিয়ে দেন লক্ষ্মণ। এখানেই যুদ্ধ বাধে। পরমাত্মার বিকাশে বাধা এলে সাধক শরীর, রাম জেহাদ ঘোষণা করেন। লক্ষ্মণ পাশে দাঁড়ান তাঁর। আর হনুমান তখনই সহায়ক হয়ে ভক্ত সেজে রামের পাশে দাঁড়ান।

— কীভাবে হনুমান পাশে দাঁড়ান?

— হনুমান হলেন সাধক শরীরের প্রাণবায়ু। এর সাহায্য না পেলে কুন্ডলিনী জাগবে কীভাবে? কুন্ডলিনী না জাগলে পরমাত্মার বিকাশ কীভাবে হবে? হনুমান যে লঙ্কা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তাও তো সাধক শরীরে প্রতীক রে?

বললাম— কেমন করে?

বললেন— শরীরের তৃতীয় পদ্মচক্র মণিপুরে থাকে তেজ। এই তেজেই যে কুন্ডলিনী ঊর্ধ্বে উঠে যায় তাড়াতাড়ি। সাধক শরীরে পরমাত্মার জন্ম হয়।

এখন কথা হচ্ছে যে, পুরাণ কাহিনির এই যে শারীরিক আলো— এর ভেতর যে আধ্যাত্ম দর্শন বা যোগ দর্শনের অনুভূতির কথা দয়াল বাবা ব্যক্ত করলেন একে কিন্তু আমরা অনায়াসে মরমিয়া অভিজ্ঞতা বা Mystic Experience বলে চিহ্নিত করতে পারি। রামায়ণকে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ বলে কি দাবি তুলতে

পারি? না কি রামায়ণ এক বিশ্বাস! কী বলব আমরা এই মহাকাব্যকে? রামায়ণকে ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে নেওয়া হয়েছে সে তো সেই কবেই। স্বয়ং বাল্মীকি অবশ্য এ কাজে ভালরকমভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। অধ্যাত্ম দর্শন জগতকে মায়া বলে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ বলা যায় যে, তার কোনও অস্তিত্ব নেই। সাধক বলেছেন মায়াময় এই স্থূল জগতের বাইরে একটি সূক্ষ্ম জগতের কথা। যে সূক্ষ্ম তার সম্পর্কে বিজ্ঞানও হদিশ দিচ্ছে আমাদের। অধ্যাত্ম দর্শন সেই বিজ্ঞানকেও জুড়ে নিয়েছে কিন্তু। বিশ্বরহস্য বা আরও ঠিক অর্থে বললে, বিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে অধ্যাত্মবাদ শরীরী একাত্মতায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাই এখানে নানা প্রামাণিক সংকেতকে ধরা হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবল যুক্তিকতায়। পুরাণ কাহিনি তাই নতুন এই দৃষ্টিকোণে শরীর কেন্দ্রিকতার জায়গা নিচ্ছে সাধকদের অতীন্দ্রিয় দর্শনে। যে দর্শনে রামায়ণ শরীর পাচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে ঐতিহাসিকতায় বীজসূত্র কি অর্জন করছে রামায়ণ? কিছু তো প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়াই যাচ্ছে। অযোধ্যারও অস্তিত্ব আছে। ওড়িশাতে সোনেপুর বলে একটা দ্বীপ আছে। তেলে নদী ও মহানদীর সঙ্গমস্থলে এর অবস্থান। এখানকার উপজাতিরা রামায়ণের কাহিনিকে বিশ্বাস করে সোনা খোঁজে মাটির নিচ থকে। এই খোঁজাখুঁজিতেই ভগ্ন দেওয়ালেরও কিন্তু সন্ধান মিলেছে। হয়তো এটাই সোনার লঙ্কা। পাথর ফেলে সেতুর সংযোগে এই দ্বীপে তো যাওয়া যেতেই পারে। বানর সেনার কথাও আছে রামায়ণে। পুষ্কর হ্রদের কাছে বানর নামে এক উপজাতিরও কিন্তু খোঁজ মিলেছে। রাময়ণে রাক্ষস, বানর, গোলাঙ্গুল প্রভৃতিদের যে আকৃতি-বিকৃতির বিচিত্রতা তা সম্পর্কে এখন এ তো বলা যায়, দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলে তৎকালীন জনগোষ্ঠীগুলোর আকৃতি-প্রকৃতির একটা পার্থক্য অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে ছিলই। রাবণের দশ মাথাকে দশ-দশটি উপজাতির প্রধান হিসেবে তো ভাবাই যেতে পারে। যে ভাবনায় রামায়ণের অস্তিত্ব কাছের মনে হতে পারে। রামায়ণের যে আলোচ্য শরীর তাও প্রামাণিক কিন্তু অনেকাংশেই যোগযৌক্তিকতায়। দয়াল বাবার অনুভূতিকে অতীন্দ্রিয় করে নিলে এভাবে ভাবতে কিন্তু মোটেই অসুবিধে হবার কথা নয় আমাদের।

যোগশাস্ত্র আর তন্ত্রশাস্ত্র উভয় শাস্ত্রই বলছে যে, আমাদের শরীরে রয়েছে ৭২০০০ নাড়ি। যার মধ্য দিয়ে প্রাণস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রাণস্রোতেই রয়েছে অহংকার। দয়াল বাবার রাবণ রাজা। সহজিয়া সাধকগণ বলেন নয়টি ছিদ্র দিয়ে শরীরে প্রাণস্রোত প্রবাহিত হয়। তাই ৭২০০০ নাড়িকে এভাবেও তো ভাবা যেতে পারে যে, ৭ + ২ = ৯। এই নয়কেই সহজিয়া বাউল সম্বোধন করছেন 'নয় দরজা'

বলে। নয় হল তাঁদের আমাদের শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গগুলো। যাকে সাধক চিহ্নিত করে নিচ্ছেন স্থূল ইন্দ্রিয় বলেই। দুটি চক্ষু, দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি কর্ণকুহর, মুখ, গুহ্যদ্বার ও মূত্রনালী। প্রাণস্রোত এই নাড়িগুলোর মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। এই ৭২০০০ নাড়ির মধ্যে যোগশাস্ত্র বলছে যে তিনটি নাড়িরই শারীরিক ক্রিয়াকর্মই প্রধান ও প্রয়োজনীয়। ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না। সাধক ৭২০০০ নাড়ির মধ্যে ১৪টি নাড়িকে শারীরিক কর্মযজ্ঞে প্রয়োজনীয় বলে মানছেন। তার মধ্যে আবার তিনটে প্রধান ও গুরুত্বপুর্ণ বলে অভিহিত করছেন। সব নাড়িগুলোকেই চিহ্নিত করছেন তাঁরা নদীনামে। প্রধান তিন নাড়িকে তাঁরা বলছেন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। এগুলোকে আবার সাধক সুর্যনাড়ি, চন্দ্রনাড়ি, অগ্নিনাড়িও বলছেন। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বা ডান নাক সূর্য নাড়ির সঙ্গে যুক্ত। বাম নাসারন্ধ্র বা বাঁ নাক চন্দ্রনাড়ির সঙ্গে যুক্ত। আর অগ্নিনাড়ি হল মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত ইড়া নাড়িকে সাধক বলছেন গঙ্গা বা সূর্য নাড়ি। বাম নাসারন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত পিঙ্গলা নাড়িকে বলছেন যমুনা বা চন্দ্র নাড়ি। আর যখন দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তখন খিদে পায় সাধকের। অর্থাৎ জঠরাগ্নি জ্বলে ওঠে। যখন বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তখন আবার খিদে কমে আসে। শরীর শীতল হয়ে পড়ে। এক এক নাসারন্ধ্রে বায়ু দেড় ঘণ্টা খানেক ধরে রাখেন সাধক। বাম নাসাতে যখন বায়ু প্রবাহিত হয় তখন সাধক শরীরে বিনয়ের ভাব জাগে। দক্ষিণ নাসাতে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে প্রভুত্বের ইচ্ছে জাগে শরীরে। এখানেই দয়াল বাবার কথানুযায়ী রামচন্দ্রের উদয় হয় সাধক শরীরে। রাজা রাম প্রভুত্ব করতে থাকেন বায়ুর ক্রিয়াতে। কেন তিনি প্রভুত্ব করতে থাকেন? এই কারণেই তাঁর প্রভুত্বতা— দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যে বায়ু প্রবাহকে যদি সাম্যে বা সমতায় আনা যায় তাহলেই প্রাণবায়ু ঢুকে যাবে সুষুম্না নাড়িতে। যাকে অগ্নিনাড়িও বলা হয়। বলা হয় সরস্বতী। আর প্রাণ বায়ু যদি সুষুম্নাতে ঢুকে যায় তাহলে কুণ্ডলিনী শরীরের নিম্ন প্রান্ত মূলাধার পদ্মচক্র থেকে উর্ধ্ব দিকে চলতে থাকে। অর্থাৎ কি না বাবার মতানুযায়ী সীতার জাগরণক্রিয়াতে শক্তি শরীরের একেকটি চক্র ভেদ করে ওপরে উঠতে থাকে। প্রাণ বায়ুকে বাবা হনুমানের শরীর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। হনুমান হলেন রামের পরম ভক্ত। এই প্রাণবায়ু বা হনুমানই কুণ্ডলিনীশক্তি বা সীতাকে জাগাচ্ছেন বা উদ্ধার করতে তৎপর হচ্ছেন রাবণের হাত হতে। কুণ্ডলিনী জাগলেই পরমাত্মার দেখা পাওয়া যাবে। যা হলেন দয়াল বাবার রামরূপের সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীর যে মনঃসংযোগ বাবা তাকে লক্ষ্মণ বলেছেন। অর্থাৎ লক্ষ্মণই স্থূল শরীরকে সূক্ষ্ম করে পরমাত্মার কাছে পাঠিয়ে

দিচ্ছেন। রামের তো সহায়ক লক্ষ্মণই। সীতা উদ্ধারে বা কুন্ডলিনী জাগরণের ক্ষেত্রেও তাই। বাম নাসাতে যখন সাধক শরীরের শ্বাস ক্রিয়াতে 'বিনয়' ভাব জাগার কথা বলা হচ্ছে তাকেই ধরে নিতে হবে দয়া, বাবার লক্ষ্মণ বলেই। সীতা উদ্ধারে হনুমানের ভূমিকা তো অনস্বীকার্য। প্রাণবায়ু তাই সদার্থক ভাবেই সঠিক হনুমান চরিত্রের নির্ণায়ক। তিনি সীতাকে বা কুন্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করে পরমাত্মা স্বরূপ রামের কাছে নিয়ে যেতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন। হনুমানের লঙ্কা জ্বালানোকে মূলাধারের লং বীজ হিসেবে দেখছেন বাবা। এক অর্থে এটিও কিন্তু কোনও বেঠিক দর্শন নয়ই একেবারে। মানবেদেহে বা আমাদের শরীরের গুহ্যদেশ থেকে দু'আঙুল ওপরে ও লিঙ্গমূল থেকে দু'আঙুল নীচে চার আঙুল বিস্তৃত যে যোনিমন্ডল, তার ওপরেই বলা হচ্ছে মূলাধার অবস্থিত। বলা হয় মূলাধার চতুর্দ্দল বিশিষ্ট। এখানে ব, শ, ষ, স— এই চার বর্ণের অবস্থানের কথাও উল্লেখ আছে। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে পৃথ্বীমন্ডল আর তার একপাশে পৃথ্বীবীজ লং আছে বলা হয়। যোগে বসে সাধক মূলাধার চক্রের থেকেই শক্তির একটা উর্ধ্বগতি অনুভব করেন। তবে এতে যে মূলাধার চক্রের মুখ খুলে গেছে এমন মনে করার কিন্তু কোনও কারণই নেই। মূলাধারে শক্তি জাগরিত হলে বলা হয় পঞ্চভূতের পৃথ্বী বা ক্ষিতিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হয়। এই ক্ষিতিতত্ত্ব পরিত্যাগ হলেই সাধক বলা হয় যে, তাঁর পার্থিব সঞ্চারী বৃত্তি থেকে মুক্ত হন। অর্থাৎ শরীরের স্থূলতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন সূক্ষ্ম শরীরের ধারণক্ষমতা আসে। এটাকেও রাম চরিত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে। সম্যক জ্ঞানলাভ হয় লক্ষ্মণ চরিত্রের সহায়তাতেই। বলা হয় যে, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ক্ষিতিই হল ঘনসংবদ্ধ উপাদান, যে ঘনত্ব কোনও জিনিসকে ধরে রাখতে পারে। এই ধরে রাখার বৃত্তি নষ্ট হচ্ছে লক্ষ্মণের সহাতায়। লক্ষ্মণই বলে দিচ্ছেন রামের বিকাশ পথ। তখনই সূক্ষ্মতা জন্ম নিচ্ছে সাধক শরীরে। মূলাধার চক্রের পরে ধাপ স্বাধিষ্ঠান। জলজ ক্ষেত্র হিসেবে এখানে জলীয় উপাদান থাকার কথাই বলা হচ্ছে। বলা হয় যে, এই চক্রটি যৌনবৃত্তি ও সৃষ্টিক্রিয়ারও ক্ষেত্র। কুন্ডলিনীশক্তি যখন স্বাধিষ্ঠান পেরিয়ে যাচ্ছে তখনই সাধকের জলীয় উৎপাদন সম্পর্কে জ্ঞান জাগছে। স্বাধিষ্ঠান চক্র অতিক্রান্ত হলে কুন্ডলিনী মণিপুর চক্রে পৌছে যাচ্ছে। এখানকার ক্ষেত্রটিকে বলা হচ্ছে তেজক্ষেত্র বা অগ্নিক্ষেত্র। এখান থেকেই আসলে দৈহিক রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তন শুরু হয়। সাধক শরীরে মণিপুর চক্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কুন্ডলিনীশক্তি এখানে উঠলেই জঠরাগ্নি ও ভূতাগ্নির মধ্যে পার্থক্য কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারেন সাধক। যেখানে ভূতাগ্নি বা সূক্ষ্মদেহের তাপ বেশ প্রবল, সেখানে জঠরাগ্নি বা স্থূল দেহের পরিপাকের তাপ

দুর্বল। সাধক এই জঠর অগ্নির প্রভাব ক্রমশ দূর করতে থাকেন শরীর থেকে। ফলে যেটা হয় ভূত অগ্নিতে শরীর ছেয়ে যায়। দয়াল বাবা হনুমানের লঙ্কা পোড়ানোকে আসলে ভূত অগ্নিতে তাপে শরীরের মূলাধারের লং বীজকে ছারখার করে দেওয়ার প্রতীকদেহের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন। বলা হয় যে, মণিপুর চক্রের অগ্নিকে যদি সাধক বেশি আয়ত্ত করতে যান তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তিনি ধাতস্থ হতে পারবেন না। তখনই বেরিয়ে পড়বে তাঁর অবহ্ংকারের নানা ভাবাবেগ। একেই দয়াল বাবা আসলে রাবণ চরিত্র দান করেছেন। মণিপুর চক্রের পরেই রয়েছে অনাহত চক্র। বলা হয় যে, অধ্যাত্ম ক্রিয়াকলাপ যথার্থভাবে বলতে গেলে এই চক্র থেকেই শুরু হয়। কুন্ডলিনীশক্তি অনাহত চক্রে গিয়ে উপস্থিত হলেই ব্যোমীয় প্রাণীদের সম্পর্কে জ্ঞান হয় সাধকের— এরকমই বলা হয়। অনাহত হল বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্র। অনাহত চক্রে কুন্ডলিনীশক্তিকে ওঠানো গেলেই ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ প্রত্যক্ষ হতে থাকে সাধকের চোখে। আসলে সাধক তখন নিজস্ব সূক্ষ্মতার অনন্ত শূন্যতাকেই উপলব্ধি করতে থাকেন। ভাবেন যে, তিনি আকাশে ভাসমান অবস্থাতেই বসে রয়েছেন। বসে বসেই বায়বীয় প্রাণীর দর্শন লাভ করছেন। অধ্যাত্মবাদ বলছে ব্যোমীয় প্রাণীর কথা। বলছে যে আমরা যে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকি তার মূল্য লক্ষ্যই হল আসলে এই ব্যোমীয় প্রাণী সমূহকে ভোজন করানো। যাঁদের আমরা দেবতা বলছি। যজ্ঞের যে সুঘ্রাণ যুক্ত ধোঁয়া তাঁরা সেই ঘ্রাণ গ্রহণ করে তাঁদের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। অনেক সাধক এই বলেন যে, যজ্ঞে জঠরঅগ্নি নয় ভূত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা দরকার। যাঁরা ভূতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে পেরেছেন একমাত্র তাঁরাই আসলে যজ্ঞ করার অধিকারী। কথাটা অবশ্য এক অর্থে সঠিক। যজ্ঞ কথার অর্থই হল অধ্যাত্ম জ্ঞান। অনাহতে যা আসে বলা হচ্ছে ভূতাগ্নির তাপে। তাই বলা হয় যে, বৈদিক যজ্ঞকর্ম বলতে যা বোঝায়— তা যাঁর কুন্ডলিনীশক্তি অনাহতচক্রে গিয়ে পৌঁছায়নি তাঁর কখনওই করা উচিৎ নয়। করলে যাগযজ্ঞ সফল হয় না। যজ্ঞ তো বলা হচ্ছে আধ্যাত্ম জ্ঞান। সেই জ্ঞান অনাহতে শক্তি না আসলে যে হবেই না বলছেন সাধক, সেজন্য তখন যজ্ঞানুষ্ঠানের আর কী প্রয়োজন! অনাহতেই সাধক শব্দ শুনতে পান। ধ্বনি তাঁর কানে আসে। এই ধ্বনিকে তাঁরা বলেন, অনাহত নাদ বা ওঁ। এই ধ্বনি তাঁর কানে আসে। এই ধ্বনি ওঠে সূক্ষ্ম বায়ুর প্রভাবে। মণিপুর চক্রকে ভিত্তি হিসেবে নির্ভর করে ফুসফুসের বায়ু ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ই এই আওয়াজ হয়। আসলে এখানে যেটা হয়, কুন্ডলিনীশক্তি উঠে এলে যে শক্তিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা মস্তিষ্কে প্রবলবেগে গিয়ে সাড়া তোলে তার ফলে সাধক কোনও

মানুষের ভাবতরঙ্গে তখন অনায়াসে চলে গিয়ে নিজের ভাবতরঙ্গকে সমান্তরাল রেখাতে এনে সেই মানুষের মানসিক অবস্থাকে সহজেই ধরতে পারেন। এটাকে টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা হিসেবে দেখা যেতে পারে। এটা হয়, যখন অনাহত চক্রের বায়ু সম্পর্কে সাধকের সম্যক জ্ঞান হয় একমাত্র তখনই। নচেৎ সম্ভবপর নয় কখনওই। অনাহত চক্র থেকে কুন্ডলিনীশক্তি এরপর উঠে আসে বিশুদ্ধ চক্রে। বলা হয় এই চক্রকে নির্মল চক্র। কুলকুন্ডলিনীকে ওঠানো গেলেই ব্যোমমার্গের জ্ঞান চলে আসে সাধকের। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম বলে যে পাঁচটি তত্ত্ব বা পঞ্চভূত আছে তার মধ্যে সব থেকে সূক্ষ্মতম হল ব্যোম। এই অঞ্চলে কুন্ডলিনীশক্তিকে আনা গেলে চেতনা ছয় ধরণের যে স্থূল আস্বাদন শক্তি আমাদের— মিষ্টি, টক, লবণাক্ত, ঝাল, তেতো, নোন্তা— এইসবকে অতিক্রম করে যায়। কুন্ডলিনীশক্তি এখানে চলে এলে পর স্থূল কোনও কিছুর আর বোধ থাকে না। তখন থেকে যায় শুধু তিন বোধ বা আবরণ— সত্ত্ব, রজ, তম। বিশুদ্ধ চক্র থেকে যখন কুন্ডলিনী আজ্ঞা চক্রে গিয়ে ওঠে তখন তৃতীয় নয়ন খুলে যায় সাধকের। যাকে শুদ্ধ ভাবাতে বলা হয় দূরদৃষ্টি। সাধক বলেন এখানে সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়, সূক্ষ্ম শ্রুতি হয়। আজ্ঞা পদ্মের দুটো দল আছে। এই দুই দলে দুই বীজ মন্ত্র— হং, ক্ষং। এর একটি হল শক্তি মন্ত্র অপরটি শিব মন্ত্র। আজ্ঞা অর্থ আদেশ অর্থাৎ গুরুর আদেশ। অনেকে একে গুরু চক্রও মানেন। গুরু বলা হয় শিবকে। আজ্ঞা চক্রে কুলকুন্ডলিনী এসে পৌঁছলে সেই শিবজ্ঞান প্রাপ্তি হয়। এই চক্র পার হলেই সহস্রদল; মস্তিষ্কমন্ডলে যে তিনটি স্তর আছে— আনন্দ + চিৎ + সৎ সেখানে পৌঁছনো যায়। অর্থাৎ প্রথমে অপরিচ্ছন্ন জ্যোতি দেখতে পান সাধক। তারপরই দর্পণ তুল্য স্বচ্ছ স্তর ফুটে ওঠে। তারপরেই পরম শূন্যতার দেখা মেলে। সাধক বলে থাকেন একে সচ্চিদানন্দের জাগরণ। যে জাগরণে পরমাত্মার স্বরূপ বোঝা যায়। দয়াল বাবা রাম বলতে একেই আসলে উল্লেখ করেছেন বোধ করি। রামায়ণ প্রতীকী অর্থে এভাবেই আমাদের শরীর নিয়েছে। পরমাত্মা হয়ে উঠেছেন রাম। তিনি প্রভুত্ব করছেন ৭২০০০ নাড়ির ধারক এই মানব শরীরকে। হয়ে উঠছেন রাজা রাম। তাঁর এই হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছেন লক্ষ্মণ। তিনি পরমাত্মার বিকাশে, জাগরণের মনঃসংযোগ হয়ে বসছেন। যে মনঃসংযোগের সাহায্যে সীতা জাগছেন। কুন্ডলিনী শক্তি স্থূল দেহ থেকে সূক্ষ্মে, শূন্যতায় যেতে চাচ্ছে। যাকে সাধক বলছেন মস্তিষ্কের বা সহস্রারের কূটস্থান। সেই স্থানে চলে যাচ্ছেন শক্তি। সীতা। লক্ষ্মণের একমাত্র লক্ষ্য হল সীতার জাগরণ। রামের কাছে তাঁকে পৌঁছে দেওয়া। রামায়ণের গল্পে লক্ষ্মণের সেই চরিত্ররূপই তো বর্ণিত আছে। তার জন্যই কর্ষিত হচ্ছে আমাদের

শরীর। যাকে জনক রাজা হিসেবে দেখা যেতে পারে। যে চরিত্র সীতাকে পেয়েছিলেন এখানে জনক মানব শরীরের কর্ষণকারী হল নিজে ধরছেন। সীতা পাচ্ছেন তিনি। দশরথ আসলে সাধকের দশ নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়— বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। যেগুলো শারীরিক প্রত্যঙ্গ সব। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাকিসা, জিহ্বা, ত্বক। এগুলোর সবই জাগরণ হয় যোগে আবার যুগল দেহ যোগেও এসব প্রত্যঙ্গকে জাগিয়ে সাধক সঙ্গিনীর শরীরে পরিভ্রমণ করেও তাঁর বীর্যকে সঙ্গিনীর যোনিতে না ফেলে একেবারে সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়ে নিতে পারেন। এভাবেও সাধক পরমাত্মার দেখা পান। যা রাজা রামেই সামিল। এসবই বায়ুর ক্রিয়াতে হয় বলেই বায়ু হনুমানের শরীরাবয়ব। আর পথের বাধাবিঘ্ন এগিয়ে যাওয়ার যুদ্ধ রাবণের রূপাবয়ব। এভাবেই রামায়ণকে আধ্যাত্মিক দর্শনের মাঝে এনে এক অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যার শরীর দেওয়া মোটেই কিন্তু অযৌক্তিক নয়। বরং অভিনব। বাবা সেই কাজটিই আসলে সম্পন্ন করেছেন।

৩. বীর্যদ্বার রুদ্ধ হয় কুম্ভকে

মা ছিন্নমস্তার উপাসক দয়াল বাবা। থাকেন তাহেরপুরে। গোটা জেলা জুড়ে বেশ তাঁর নামডাক আছে। বয়স একশো পেরোনো। কিন্তু এখনও কর্মক্ষম। স্মৃতিধারী। নির্ভুল শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। আশ্চর্য! এই বয়সেও তাঁর দাঁত সেইভাবে পড়েনি। মাথার চুলও রয়েছে যথেষ্ট। পাকা হলেও তা একেবারে ভয়াবহ পাকে কিন্তু জর্জরিত নয়। চশমা নেই। খালি চোখে বইপত্র, খবরকাগজ সবই পড়তে পারেন। আশ্রমেই এখন দিনরাত আত্মমগ্ন থাকেন। খুব একটা বেরোন না। তবে ভক্তশিষ্যর আবদারে মাঝেমাঝেই তাঁকে এখানে-ওখানে যেতে হয়। যদিও সে যাতায়াত এখন অনেকখানি কমিয়ে নিয়েছেন। তবে তাঁর পছন্দের জায়গা হল গিয়ে তারাপীঠ। সেখানেও তাঁর আশ্রম আছে। অমাবস্যার বিশেষ যোগে এখনও তিনি তারাপীঠ শ্মশানে সকলের মঙ্গলার্থে যজ্ঞ ও তন্ত্রাদির নানা ক্রিয়া করেন। তান্ত্রিক মহলে দয়াল বেশ সম্মানীয়। প্রবীণ প্রাজ্ঞ সাধক হিসেবে তাঁর সুনাম জেলার বাইরে বেশ অনেকদিনই বেরিয়ে গেছে। তারাপীঠ-বক্রেশ্বর-নলহাটি-অট্টহাস্য সহ প্রাচীন তন্ত্রক্ষেত্রগুলোতে প্রবীণ তান্ত্রিকদের কাছে আমি ওঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হতেই দেখেছি। নবীন তন্ত্রচর্চাকারীদের অনেকেই বাবার শিষ্য। খোদ কামাখ্যাতে বসেও অম্বুবাচীর মেলাতে ভারতের নানা প্রদেশের তান্ত্রিক গুরুদেব প্রবৃদ্ধ

কয়েকজনের মুখে দয়ালের নাম রীতিমতো আমাকে অবাক করেছে। সেখানকার সিদ্ধাই ভৈরবী মা'রা পর্যন্ত দয়ালকে সিদ্ধ সাধকের তকমা দিয় জয়ধ্বনি দিয়েছেন। তা এই দয়ালের আশ্রমে আমার যাতায়াত আজকের নয়। দয়ালের আশ্রম টিপিক্যাল তান্ত্রিকদের ডেরা কখনও নয়। বলা ভালো তন্ত্রসাধক হিসেবে দয়াল বেশ স্বচ্ছল, প্রতিষ্ঠিত। সুরম্য মন্দির, পাকা দালানে দয়ালের বালিশ-তাকিয়ায় বসবাস। তবে এই ভোগবাদী জীবন দয়ালের সাধক জীবনের শেষ দিকের ব্যাপার। একুশ শতকের একেবারে প্রথমে যখন তাঁর আশ্রমে যেতাম সেটা তখন ছিল তান্ত্রিকের প্রথাগত ডেরা না হলেও নিতান্ত এক আস্তানা। সেখান থেকে আমারই চোখের উপর দিয়ে ভক্তশিষ্যদের দানেধ্যানে আস্তানার শ্রী ফুটেছে। হয়ে উঠেছে আশ্রম। আমি প্রথম থেকেই দয়ালের কাছে যেতাম তাঁর সঙ্গ করতে, কথা শুনতে, ভাব নিতে যেমন, তেমনই সেখানে যাওয়ার আর একটা কারণ হল দুষ্প্রাপ্য বইয়ের লোভ। গোছানো সুরক্ষিত পাঠাগার দয়াল বাবার নয়, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু তন্ত্রের গূঢ় রহস্যের বেশ কিছু দুর্লভ বই, যার সিংহভাগই সাধকদের হাতে লেখা— সে-সব নাড়াঘাঁটার সুযোগ ঘটেছে এই দয়াল বাবার আস্তানায় এবং হাল আমলে হওয়া আশ্রমেই আমার। দয়ালের মুখে কিছু বিলুপ্ত সাধনার কথা, ধরন, ভঙ্গিমাও শুনেছি আমি, যা দয়াল কিছু শ্রুতি এবং করণে রপ্তও করেছেন। দেবদেবীর বিস্তার শরীরের জটিল অন্তর্গূঢ় বিস্তারে, তার যোগসমাধা এসব নিয়ে প্রায়-প্রায়ই আমার কথা চলত। মুড এলে ভাবতন্ময় হয়ে গেলে দয়াল নাগাড়ে বলে যেতেন। আমি তাঁর কথা বলবার ভাব ও ভঙ্গিমায় যে-সব মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শুনতাম। শুধু আমি কেন, কথা দিয়ে, পাঠ দিয়ে দয়াল এখনও কোনও ভক্তশিষ্য বা অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখতে পারেন। এক দুপরের কথা বলি। আশ্রমে প্রসাদ পাওয়ার পর দয়াল আমার সাধন আধারের কৌতূহল বুঝতে পেরেই বোধহয় সেদিন মেলে ধরলেন এমন সব বিলুপ্ত সাধনার কথা, যার ক্রিয়াকরণ শুনে অবাক হয়ে লোকধর্মের অনালোকিত, গুহ্য গিভীর নির্জন প্রবণতাকে উদাহরণীয় দেহচর্চার পরিবেশন ছাড়া যেন আর কিছু বলাই যায় না। যার ভেতর থেকে সাধক জীবনের আধো-প্রকাশ্যে রহস্য ও মায়ার অতল গভীর নিদর্শনই আমি তখন দেখতে পেয়েছিলাম।

দয়াল বললেন, 'জীবনের, জগতের সমস মূল্যবান দামি সম্পদই হল গোপন। শরীরটা হল গিয়ে এক গোপন প্রক্রিয়া। তাঁর ব্যথা, প্রেম, ধর্ম, কাম, মোক্ষ এসবই বুঝতে হবে মানুষকে। তবেই মানুষ সাধন পন্থাতে যেতে পারবে। সাধনা গোপন। কেন-না সাধনা ভেদহীন অভেদ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কীরকম?'

বললেন, 'সেই অভেদ অতীন্দ্রিয় অনুভবের জীব-পরম কেবল নয়।'

— তবে?

—অভেদ নারী-পুরুষের। যুগল সাধনা গোপন, গুহ্য কেন জানিস?

— কেন?

— যুগল সাধনা ভেদহীন অভেদের কথাই বলে।

— সেই অভেদ পর্বটি তো বললেন শুধু আত্মানুভূতিরও নয়। তাহলে সেটি কীরকম?

দয়াল আত্মমগ্ন হলেন। স্থির। দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ধারা। মনে হচ্ছে যেন মা ছিন্নমস্তার ত্রিরুধিরই নেমে আসছে এখন দয়ালের চোখ জুড়ে।

বলতে থাকলেন দয়াল : 'মোক্ষ, নির্বাণ এসব দশা সাধকের কাঙ্খিত নয়। যুগল ভজনার সাধক জানবি সব সময়ই জীবনের অনুরাগী। যুগল ভজনা শেখায় জীবনের ভেতর থেকে জীবনেরই বাস্তবিক প্রবৃত্তি নিয়ে জীবনের মধ্যেই দেবদুর্লভ আনন্দকে অনুভব করতে। নারী-পুরুষের দেহমিলন এখানে বিপরীত হয়। নারী হয় পুরুষ। পুরুষ হয় নারী।'

বললাম, 'কীভাবে তা সম্ভব? ভাববেগে সেটা একমাত্র হতে পারে। বাস্তবিক পন্থা কীভাবে ওলোটপালট করে নিতে পারেন সাধক?'

বাবা বললেন, 'তার জন্যই তো সাধককে সাধন সমরে নামতে হয়। পুরুষের মিলনে অবধারিত বীর্যক্ষয় হল প্রবৃত্তি; পুরুষেরই স্বভাব। আর নারীর স্বভাব গ্রহীতার। নারী তাঁর রজদ্বারে তাকে আটকে নেবে। সাধনা একেই স্বাভাবিক এই ভেদাভেদকে নস্যাৎ করে দিয়ে নারীকে পুরুষ করে।'

— মানেটা ঠিক বুঝলাম না বাবা।

— নারীর সাধনাতে রজসমুদ্র থাকে।

বললাম, 'শুনেছি না কি সাধিকারা রজবেগকে আটকে নিতে পারেন?'

— ঠিকই শুনেছিস। কিন্তু যুগ ভজনে নারী তাঁর রজধারা খোলা রাখে। তার রজপাত এখানে সেই পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কেন-না এখানে সে পুরুষ। সাধকের কাজ হল গিয়ে নারী সেজে নারীরূপী সেই পুরুষের ক্ষয়কেই লয় করে দেওয়া। সাধক পুরুষেরা যুগল ভজনের এই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যুগল ভজনা সেই সুধক যুগলকেই মান্য করে কেবল। আর কাউকে কিন্তু নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কারা তাঁরা?'

দয়াল বললেন, 'দেবতারা হলেন পূর্ণ মানব। যেমন দ্যাখ তুই শিব। সন্তানের পিতা হয়েও শিব কিন্তু দেবাদিদেব। যোগী। শিব হলেন আসলে পূর্ণমানব। কৃষ্ণও

তাই। যুগল ভজনার জন্যই তো তাঁর অতশত রাজমহিষী। রাজকীয় কৃষ্ণও পূর্ণ মানব। যোগী। জানবি, এঁদের দু'জনেরই দশ ইন্দ্রিয় ষড় রিপুর জীবনচক্রান্ত ছিল। এই জৈব চক্রান্ত মানুষের থাকে। তারা যখন চক্রান্ত ভেদ করে তখনই তারা পূর্ণমানব। দেবময় পরম সত্তা। যা হল গিয়ে আসলেই ঈশ্বর, বুঝলি। যুগল ভজনা হল গিয়ে নিরোধ পরার সাধনা। ইন্দ্রিয় রিপুকে নিরোধ পরাতে হয়। শরীরের পুরুষকে সেজন্য নিষ্ক্রিয় করে নারী করে নিতে হয় আর শরীরের নারীকে শক্তি মেনে সক্রিয় করতে হয় তার জন্যই এক এক সাধক এক এক সাধন প্রণালী দেখিয়ে গেছেন। আমার গুরু ছিলেন হঠযোগী। তাঁর সাথনপন্থা শুনবি? ক'জন পারবেন এখানকার সেই সাধনক্রিয়া। কেউ পারবেন না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর সেই সাধনা। এখন দেখলে লোকে মনে ভাববে ম্যাজিক। ও আসলে ম্যাজিক কিছুই নয়। দেহচর্চা।'

মায়ের রুধি নিজে মা পান করার মতোই দয়াল যেন তাঁর ভাবাবেগের রুধির এখন একাই পান করে চলেছেন। আমার উপস্থিতিকে তিনি গ্রাহ্যই করছেন না একেবারে। বুঝতে পারছি আমি কথার ভেতর দিয়েও তিনি শ্বাসবায়ুকে শিরোস্থানে তোলার সেই আবশ্যিক সাধনাই করে চলেছেন। বলে চলেছেন দয়াল: 'একদিন গুরু কুম্ভকের গুণাগুণ বলতে গিয়ে বললেন, যা তো দেখি তোর গুরু মা'র ধার থেকে একপাত্তর দুধ নিয়ে আয়। আশ্রমের গাইগরুর ডেকচি ভরা দুধ গুরু মা হাতে ধরিয়ে বললেন, এবার গোঁসাইয়ের মজাখান দেখবা। ভাবলাম গুরু আমার ভরা ডেকচি দুধ একেবারে খাবেন না কি আজ! এমনিতে যে তিনি কিছুই খান না। বছর খানেক ধরে তাঁকে কোনওই শস্যদানা আমি দাঁতে কাটতে দেখিনি। শুধু চার-পাঁচদিন অন্তর একটি করে কাঁঠালি কলা আর মধু এই তো এখন গুরুদেবের আহার। দুধের ডেকচি গুরুদেবের চরণের কাছে গিয়ে রাখলাম। গুরু মা-ও এসে দেখি দাঁড়িয়েছেন আমার থেকেও পুরনো আশ্রমিকরাও সব কৌতূহলী। বুঝলাম গুরুদেবের দুধ খাওয়ার কিছু রহস্যময় ক্রিয়া আছে। তা দেখিয়ে গুরু আমাকে কুম্ভকে নামাবেন। তিনি তো হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।'

বললাম, 'কুম্ভের শিক্ষা তাহলে আপনার সেদিনই প্রথম শুরু হল নাকি?'

আমার প্রশ্ন দয়ালের কানেই এল না তখন। চোখ বন্ধ দয়াল। সূর্য পড়ছে। আশ্রমে তাঁর থাকার ঘরের জানলা গলে সূর্য এখন তাঁর চোখে-মুখে তাঁরই বলা সেই 'সাধন সমর'-এর চাঞ্চল্যই বোধহয় ধরে রাখতে তৎপর। গুরুর স্বরূপে বিভোর দয়াল গুরু তন্ময়তার ভেতরই রয়েছেন। বলে যাচ্ছেন : 'গুরু তাঁর পরনের কৌপিন সরিয়ে দেখি লিঙ্গখানাকে বার করে ধরেছেন। গাজরের মতো

সেই লিঙ্গের রং। লিঙ্গটা কৌপিন সরানো মাত্র দেখলাম সেটা ঠাকুরমার তোলা মাখন দণ্ডের মতো শক্ত মানানসই। আমি তো অবাক। গুরু ডেকচির মধ্যে দুধের কানায় নামিয়ে নিলেন লিঙ্গদণ্ড। আমাদের সকলের নজর ডেকচির দিকে। দেখি আস্তে আস্তে ডেকচির দুধের কানা আরও নেমে আসছে। ভাবছি ওটা কি নল নাকি! কিছু পর দেখলাম তলানি বলেও আর কিছু নেই। সবই গুরু টেনে নিয়েছেন লিঙ্গ দণ্ড দিয়ে। এর পর নিরুত্তাপ গুরুদেব বললেন, বুঝলি দয়াল এ হল গিয়ে কুম্ভকের মহিমা। কুম্ভক কী শুধু বায়ু টানে? তরলও টানে। না হলে বীর্যদ্বার রুদ্ধ হয় ক্যামনে?'

দয়াল এখন দেবী ছিন্নমস্তার রক্ত-রুধির টেনে নেওয়ার মতোই যেন কথার রুধির টেনে নিতেই একাগ্র। মানবদেহের আধারদশা সাধন আলোকে বোধহয় আলোকিত করবেনই তিনি। গোধূলি নামছে। গাছের পাতা নড়ছে। আশ্রমে সন্ধ্যাবেলাকার শাঁখ বাজিয়ে নিচ্ছেন এক ভৈরবী। তাঁরই ভেতর কথার রুধির পান করছেন দয়াল। আমি আছি কী নেই কোনওরকম কোনও হেলদোল নেই। বলে যাচ্ছেন : 'শুক্র-চাঞ্চল্য দূর হলে পর আসে রূপ সাধনা। তখন নিজের রূপ নিজেই দেখা যায়। সে রূপের দ্বিসত্তা এক হয়ে যায়। গুরু আমাকে সেই সাধনাই দিয়েছেন। এত বছর ধরে রূপ সাধনাতেই আমি মগ্ন বুঝলি।'

বুঝলাম দয়াল এবার বাস্তবতায় ফিরছেন। দেহবিচ্ছিন্ন এক আয়না আছে তাঁর। তিনি সেখানে তাঁর রূপ দেখতে পারেন। আমরা সেই রূপের কতখানিই বা জানি, বুঝি! দীপ্ততার তেমন কোনও সার্চলাইট আমাদের নেই। তবু আমরা খুঁজছি।

৪. মহাকাল নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিঃশব্দ

জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মেলা বসে। মন্দির প্রাঙ্গণ ঘিরে একমাস জুড়ে চলে মেলা। তবে সেই মেলার তাপ এখন অনেকখানি কমে গেছে। সংক্রান্তিতে মেলা আনুষ্ঠানিক শুরু হলেও ষষ্ঠী থেকেই এখানে আসতে শুরু করে দেয় বাউল-ফকির-সাধুসন্তদের দল। জ্যৈষ্ঠ ষষ্ঠী যেহেতু জামাইষষ্ঠী হিসেবে খ্যাত তাই আশেপাশের মেয়েরা সব যুগল নিয়েই এ সময় যুগলকিশোর দর্শনে আসে। এক সময় আড়ংঘাটা ছিল চূর্ণী নদীর পাড়ঘেঁষা একেবারেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। পরবর্তীতে এখানে কিন্তু এই যুগলকিশোরেরর মন্দির ঘিরে জনপদ গড়ে ওঠে। সেও এক কাহিনি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে একাই ছিলেন। শ্রীরাধিকার স্থান ছিল না মন্দিরে। উত্তরপ্রদেশের এক মহন্ত বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণমূর্তি এনে প্রথমে বর্ধমানের সমুদ্রগড়ের গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে সাধন ভজন করতে থাকেন। বর্গির হাঙ্গামা শুরু

হলে মহন্ত গঙ্গা পার হয়ে চুর্ণী নদীর পূর্ব পাড়ে এই জায়গায় এসে কৃষ্ণমূর্তির নিত্যপুজো শুরু করেন। এ কথা তখন নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গোচরে এলে তিনি কৃষ্ণকে একা না রেখে তাঁর সঙ্গে রাধারানির একটি ধাতুমূর্তি জুড়ে দেন। একত্রে দুই মূর্তির নামকরণ হয় যুগলকিশোর। পূজোর জন্য দেড়শো বিঘা জমি দেন। গড়ে ওঠে মন্দির। পাঁচকুঠুরির দালান মন্দিরটি উঁচু ভিতের ওপর স্থাপিত। যুগলকিশোর মাঝখানে বড় সিংহাসনের ওপর দণ্ডায়মান। এ হল গিয়ে সেই মধ্যযুগের বৈষ্ণব আন্দোলনের ফসল। মন্দিরের বাইরে দু'পাশে থাম বরাবর দশাবতারের কাজ রয়েছে, যা বাংলার লোকচিত্রকলার সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করায়। চার কোণে রয়েছে চারটি তুলসীমঞ্চ। মন্দির চত্বরে বাঁধানো বকুল গাছকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে তুলসী গাছ। এখানেই মেলার সময় সাধুসন্তরা জড়ো হয়। রাতে বাউল গানের আসর বসে। দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থী মেলায় এসে রাত্রিবাস করে পরদিন ঘরে ফেরে। যুগল দর্শনে মহিলারা অনাথিনী হয় না— এই বিশ্বাসে ছুটে আসে সবাই। যে টানে এই মেলায় এসেছিলেন সর্বজয়া। 'পথের পাঁচালী'-তে সে গল্পও লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারও বেশ আগে ভক্ত হরিদাসও এসেছিলেন যুগলদর্শনে। পরমার্থ লাভের আশায় আজও ছুটে আসে মানুষ। সেই আসা-যাওয়ার টাল খায়নি কিছু। মেলা বহরে কমেছে লোকবসতি ক্রমে ঘন হয়ে আসার ফলে। মন্দিরের দেড়শো বিঘে এখন এক বিঘে থেকেও কমে এসেছে। চূর্ণীর পাড় বলে কিছুই নেই। গিজগিজ করছে বসতি। তারই মাঝে মন্দিরের শান বাঁধানো ঘাট থেকে যেটুকু চুর্ণীর দেখা মেলে সরু সুতোর মতো সেটুকুও কেবল কচুরিপানার সবুজে ভরা। এই ঘাট ঘিরেই এখন সাধুসন্তরা জড়ো হয়। বাউল আসর বসে। চার পাঁচ বছর আগেও যখন মেলায় এসেছি তখন এখানে কিছু সাধুসন্ত ভৈরবী-মাতাজিদের দেখা পেয়েছি। বাউল আসরেরও তখন রমরমা। আড়ংঘাটার নামকরা বাউল সুবল দাস বৈরাগ্য আখড়া করতেন। সেখানে নানা এলাকার বিশেষত নদিয়া-মুর্শিদাবাদের বাউলরা রাতভর গাইতেন। সুবল দেহ রাখার পর সেই আখড়ার তেজ কমে আসে। ২০১০-এ দেহ রাখেন সুবল। সেই আখড়া এখন সুবলের বড় মাপের ভাবতন্ময় ফ্লেক্স নিয়ে চলে। তাঁর শিষ্যভক্তরা মূলত গান-বাজনা করে দেশ-গাঁয়ে অনুষ্ঠানের আশায়। বাইরের বাউলশিল্পীরা আর আসেন না। সাধুসন্তের দাপটও নেই মেলায় তেমন। এবারে যুগলে এসে এইসব দেখে তো আমি রীতিমতো হতাশ। ভিক্ষাজীবী লালময়লা কৌপনের দলের পাশে একা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছি। ভাবছি, বাংলার ভাবসত্তাটির তাহলে মরা সোঁতা এখান থেকে বুজেই গেল। কেন-না এই মেলাতে এসেই একসময় আমার যোগমায়া ভৈরবী, কালাবাবা,

মণি ভৈরব, মালতী মা'দের মতো ভাবতন্ময় সাধক-সাধিকাদের দেখা মিলেছে। আর সে তো বেশি দিনের কথাও নয়। বিশ শতকের সূচনাই হবে। এই বারো-তেরো বছরের ব্যবধানে তাহলে লোকায়ত সাধক-সাধিকাদের আটনে এতখানিই ঘুণ লাগল যে নিছক ভিক্ষাজীবীদের মাঝে আমাকে সাধু খোঁজার কসরত করতে হচ্ছে। কেন-না খোঁজাই আমার কাজ। খুঁজে আমি পেয়েছি কি না সে অন্য প্রশ্ন, কিন্তু খোঁজ আমাকে পেয়েছে। গ্রাম বাংলার হাট-মাঠ-অন্দরে লোকায়ত সাধকের গভীর গোপন গুহ্য ভাব সাধনার অরুণালোকের স্বর্ণময় ইশারা বরাবরই আমাকে টানে। আমি খুঁজতে বেরোই। খোঁজই আমার একমাত্র কাজ। যুগলের মেলার ভর দুপুরে সেই খোঁজের গুমোট অন্ধকারে আমি এখন দাঁড়িয়ে ভাবছি বাংলারই ভাবসত্তার শব্দবর্ণ। এরই ভেতর স্পর্শ পাওয়ার মতো একজন মানুষ এসে দাঁড়ালেন আমার সম্মুখে। খানিক আলগা কথার পর বললেন, 'আপনি নিশ্চয় সাধু খুঁজছেন? এখানে তা আর পাবেন না।'

বললাম, 'সাধুসন্ত এ মেলায় আর আগের মতো আসেন না?'

— ভগার ঘরে মস্ত চুরি কর্তা। ভগার দেওয়া পঞ্চইন্দ্রিয় নস্যাৎ করতে পারলে তো মানুষ সাধু হয়। সে আর ক'জন পারে। যারা পারে তারা আর কর্তা মেলাখেলায় বড় একটা আসে না। নির্জনের খিদে-তেষ্টা কি আর মেলার হাঁ-এ এলে মেটে? মেলা যে তাঁদের গিলি নিতি চায়। তাই তাঁরা আর বড় একটা এধারে আসেন না। তবে তেমন মনুষ্য এখানে একজন আছেন কর্তা।

— এই মেলাতে এসেছেন?

— না না। কোলাম কী। হাঁ-এ আসবার মানুষজন নাকি তিনি। আপনি চাইলে যেতে পারেন। যাবেন নাকি কর্তা?

স্বভাবদোষে এক বাক্যে রাজি। ভদ্রলোক আমাকে বলে পাঠালেন, 'নদী ধরে শ্মশানে চলে যান। দেখবেন শেষ হাতায় মাতাজির আস্তানা। সেখানে তিনি একাই থাকেন। যাকে বলবেন তিনিই দেখিয়ে দেবেন তাঁর হদিশ। কোথাও বের হন না। কিছুই খান না তিনি। সব সময়ই দিব্যোন্মান দশা তাঁর। যান। কথা আদায় করতে পারলে কিন্তু আপনের সাধ মিটবে এ আমি বলতে পারি।'

সেই দেখানো পথ ধরেই আমি এখন মাতাজির আস্তানায়। কাঁচা রাস্তা ভেঙে শ্মশান লাগোয়া মাতাজির ডেরা। তবে এ ডেরা লোকায়ত সাধকদের বিশেষত তান্ত্রিক-ভৈরবী মায়ের বাস-আলগা ডেরার মতো নয়। এ ডেরা রীতিমতো পাকাপোক্ত। দালান বাড়ি। গ্রিল দেওয়া বারান্দার দেওয়ালে মস্ত ফলক। সেখানে গোটা গোটা হরফে আদ্যাস্তোত্র লেখা। বোঝাই যাচ্ছে ভক্তশিষ্যদের বদান্যতায়

মায়ের বাসের শ্রী ফিরেছে। এর থেকে অনুমেয় মাতাজির পসার রয়েছে মধ্যবিত্ত ভক্ত মহলে। না হলে কেবল নিম্নবর্গীয়রা ওঁর শিষ্য হলে দালানকোঠাতে বাস গিয়ে উঠত না। যখন পৌঁছলাম শ্মশান লাগোয়া মায়ের আশ্রমে, সান্ধ্য আরতির জোগাড় চলছিল। দাহকার্য শেষ করে কিছু স্বজনহারা মানুষ চূর্ণীস্নানে রত। তাঁদের একজনকে মাতাজির হদিশ জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'ঘরে যান। দেখুন ধ্যানমগ্ন হয়েই আছেন। ঘর ছেড়ে বেরোন না তিনি। প্রাতঃকৃত্য স্নান-আহারের প্রয়োজন হয় না মাতাজির।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘর ছেড়ে তিনি কি একদমই বেরোনই না?'

— খুব একটা নন। মাঝেমাঝে কলকাতা যান। কামাখ্যা, তারাপীঠ। অমাবস্যায় এখানে থাকলে শ্মশানে যজ্ঞ করেন। তা ছাড়া বারমুখো তাঁকে কেউ দেখেনই না এ অঞ্চলের মানুষেরা। মাঝে মাঝেই মৌনী নেন। মাস তিনেক তিনি বাক্যহারা মাতাজি।

— তাহলে বোধহয় ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে না।

— তা আমি বলতে পারব না, এখন তিনি মৌনী নন। সাধনার ভেক পাল্টে কেবলই ধ্যানমগ্না। প্রশ্ন করলে জিজ্ঞাসুর ভাব বুঝে মাঝে মাঝে উত্তর দেন তো দেখি। আমরা তো যাই। মাঝে কিছুদিন দাঁড়িয়ে সাধনরত ছিলেন।

— মানে?

— মাস তিনেক দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন তিনি। বসতেন না। শুতেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ধ্যানে ডুবে থাকতেন। নড়াচড়া করতেন না। পাথরের মূর্তির মতো স্থির। দেখেছি তো তাঁকে। যান যান। সঙ্গ করুন। কত লোক আসে। প্রচুর সিদ্ধাই ওঁর।

গিয়ে পৌঁছলাম এবার মাতাজির দরবারে। গ্রিল খুলে সটান ভেতরে। দেখলাম তিনি বসে। আমার শব্দবাদ্যেও কোনও হেলদোল নেই। অন্যলোকের বাসিন্দা। বোধহয় শব্দহীন পৃথিবীর নাগরিক তিনি। প্রথাগত ভৈরবীর ভেকও নয় তাঁর। চুলে জটার নামগন্ধ নেই। ফুরফুরে একঢাল চুল যেন এক দখিনা বাতাস লাগার অপেক্ষায়। হাত, গলা ফাঁকা— রুদ্রাক্ষ সহ নানা মালার জোড়, পলা, কেরুয়ার বালার সমাহারের বাইরে বেরোনো ভৈরবী আত্মমগ্না সাধিকাই যেন। আমি গিয়ে বসবার মিনিট পাঁচেক পর চোখ খুললেন তিনি। ভৈরবী মায়ের তেজস্বী ছটার রেশ তাঁর শরীরের কোনওখানে লেগে নেই। অথচ পরনে লাল মোটা ধাতের কাপড়।

কপাল শরতের মেঘের মতোই সাদা। সিঁথিপথ ধুলোপূর্ণ গ্রামীণ রাস্তা বই আর কিছু নয়। ভৈরবীর সাজ থেকে বেরোনো এই মাতাজি হাতের ইশারায় আমাকে বসতে বললেন।

বসে আছি আমি। তিনিও বসে। কোনও কথা নেই। চোখ তাঁর খোলা থাকলেও ধ্যানমগ্না চাহনি লেগে। বুঝতে পারছি পৃথিবীলোকে ফিরতে বোধহয় খানিক সময় নেবেন মাতাজি। তাঁর স্নেহময়ী রূপ, অন্তর্মগ্না ভঙ্গিমাই যে তাঁকে এখানকার মাতাজি করে তুলেছে তা আমার আর বুঝতে বাকি রইল না।

কিছু পর স্বাভাবিক হয়ে এলেন মাতাজি। ঘরে তাঁর পরিপাটি সাজ পরা। ধোয়া-মোছা পরিষ্কার। কোনও আসবাব নেই। নেই কোনও তক্তপোশ। কম্বলের আসনে বসেন তিনি। আর কোনও সাধন উপচারের চিহ্নও নেই ঘরে। বারান্দার গায়ের আদ্যাস্তোত্রই একমাত্র প্রমাণ তিনি কালীসাধিকা। পরনের লালটুকু জানান দিচ্ছে শাক্তমতেই মায়ের সাধনে তিনি বিশ্বাসী।

বললেন, 'আমাদের সখী সাধনের মত।'

বললাম, 'আপনি তন্ত্রমতের নয়?'

বললেন, 'মহাকাল নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, নিঃশব্দ।'

বললাম, 'শক্তি তো চঞ্চলা।'

— সেই চঞ্চলারই সখী আমরা। সাধিকা নই। তাঁকে আমরা ইন্দ্রিয়শাসনে ধরি না। ধরি ভাবে।

— আপনাদের তবে পঞ্চ-ম-কার নেই?

— শাক্তমতের তান্ত্রিক সাধনের পঞ্চ-ম-কার আমাদের নেই। স্থূল মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন আমাদের নয়। আমাদের পঞ্চ-ম-কার সূক্ষ্মের।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কি বৈষ্ণবীর মতে তবে মায়ের উপাসনা করেন?'

বললেন, 'আমাদের উপাসনা নেই। বন্ধুত্ব আছে। মায়ের সখী আমরা। সই। মা আমাদের মূর্তিময়ী নন। তাঁর রূপ নেই, বর্ণ নেই। কালকে হরণ করছেন বলেই তিনি কালী।'

বললাম, 'ঠিক বুঝলাম না আমি আপনাদের মত।'

— গুরু বলতেন আদ্যাশক্তি দর্শনের অযোগ্যা। বর্ণের আকারে তিনি দৃষ্টিযোগ্যা নন। সে-জন্যই তিনি অন্ধকার। কালী। আদ্যাশক্তি।

— এ তো আমাদের আদি মতই মা। অদৃশ্য ধারণা থেকেই তো মায়ের দৃশ্যরূপ এসেছে।

বললেন, 'সে রূপে মা উগ্রা। মা কি কখনও উগ্রা হতে পারেন? আদ্যাশক্তি অন্ধকার বলেই তাঁর কোনও সত্ত্ব, রজ, তম নেই। গুণ এলে তবেই পাশের প্রশ্ন। সেখান থেকেই আসে ইন্দ্রিয়সাধনা। আমাদের পাশ নেই। পাশহীন সাধনা। সত্ত্ব, রজ, তমর বাইরে যে অন্ধকার শক্তি তাকেই আমরা আপন করি। ভাব জমাই। সখী করি। গুরু আমাকে সখী সাধনা শিখিয়ে গেছেন। মা সেখানে আনন্দ।

বললাম, 'সেই তো আপনি প্রকৃতি-পুরুষ যোগে এলেন?'

বললেন, 'আদ্যাশক্তি কালী কেন জানেন?'

— কেন?

— আদ্যার উদ্ভবেই কালের উদ্ভব। কালের জননী বলেই তো মা আমার কালী। গায়ের রং কালো বলে তিনি কালী নন।

— সে তো জানি, অন্ধকারের রং তো কালো বই আর কিছু হতে পারে না।

— আসলে কী জানেন, আদ্যার রূপ দিয়েছি আমরা। কৃষ্ণবর্ণা, নীলবর্ণা, শ্বেতবর্ণা, শ্যামবর্ণা করেছি। বলতে পারেন কেন তাঁকে লাল, সবুজ, হলুদ, বেগুনি করিনি?

মাতাজির এই প্রশ্ন, ভাবনা, কথা বলবার ধরনই বলে দিচ্ছে কোনও সামান্য সাধিকা তিনি নন। গুরুকুল আছে তাঁর। এবং সেটা রীতিমতো শাস্ত্রীয়। তিনি নিজেও কেবল নিরক্ষর লোকায়ত ভাবের সাধিকা নন।

বললাম, 'আপনিই বলুন মা কেন মূর্তিতে লাল, সবুজ, হলুদ, বেগুনি নন? আপনার কথা শুনব বলেই তো এসেছি।'

বললেন, 'আপনি যুক্তি শুনতে চান। ভাবকে তাই দূরে রেখে যুক্তিতে যাওয়াই সংগত।'

— কী করে বুঝলেন, আমি যুক্তিমতে আগ্রহী?

সামান্য হাসলেন মাতাজি। হাসলে তাঁর ফরসা গালে টোল পড়ে।

বললেন, 'বিশ বছর ধরে একা এভাবে পড়ে আছি। খোঁজ পেয়ে মানুষ আসেন। যান। কেউ ভক্ত। কেউ বিপন্ন। কেউ বা জিজ্ঞাসু। এই ভেদ বুঝব না বলছেন?'

— না না তা আমি বলতে চাইনি।

— এটা জানবেন তন্ত্র হল কারণ। ভাব হল স্থাপন। দু'য়ের পার্থক্য অনেক। তান্ত্রিক মা'কে পেতে চান ইন্দ্রিয়শক্তিকে পরাস্ত করে। আমাদের ঘরে ইন্দ্রিয়কে আমরা ভাবে নিয়ে যাই। ইন্দ্রিয়কে বশ করি না আমরা। বন্ধুত্ব করি। মিতালি পাতাই।

বললাম, 'মা কেন লাল-সবুজ-হলুদ নন, আপনার মতটা যদি বলেন?'

বললেন, 'বলব বলব। যুক্তি আপনাকে জাগিয়ে রাখে। যুক্তির খোঁজে আপনি সাধনপথে ঘোরাঘুরি করেন সে তো আমি জানি। যা বলব তা আপনি নিজেই সাজিয়ে নিতে পারেন আপনার জ্ঞানবুদ্ধির ভেদহীনতায়। সেখানে আপনি অভেদ।'

বললাম, 'তবু বলুন না শুনি।'

— নিশ্চয়ই। আদ্যা কাল। কালী। তাঁর বর্ণে যুক্তিমতে কালো রূপান্তরিত হতে পারে নীল তারায়, শ্যামায়। এর বেশি যুক্তিবোধ যাবে না যে। মা তাই লাল-সবুজ-হলুদ নন। ভাবে মা সবই হতে পারেন। সেই ভাব দিয়ে আমরা মা'কে দেখি, বুঝলেন!

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের মতের ভক্তশিষ্যর সংখ্যা কেমন?'

বললেন, 'তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এ পথ একক সাধনের। আমার গুরুর মানসকন্যা আমি। আমার কিছু ভক্তশিষ্য আছে। তাঁদের আমি নিরাকারের মন্ত্র দিই। ব্রহ্মজ্ঞান সহজ ব্যাপার নয়। হৃদয়কে শাস্ত্র করতে পারলে তার ভাবের জ্ঞান সেখানে লেখা যায়। একা সাধক সেটা দেখতে পারেন। অন্য কারও দেখবার তো দরকার নেই। গুহ্য সাধনা গোপন করতে বলে। মা'কে আমি গোপন করে একা মজি ভাবে। বন্ধুত্বে। তা আমার জনে-জনে প্রচারের দরকার কী?'

আমি দেখলাম এবার সখী সাধিকা চোখ বন্ধ করে নিলেন। বুকের ওপর মেলে ধরলেন এর পর জোড়হাত। আমার যাওয়ার ইশারা।

৫. তন্ত্র হল গিয়ে করবার জিনিস, করন

কেবলমাত্র আমার কাজে লাগতে পারে বলেই ঢাকা থেকে সিলেটি নাগরী লিপির দুই পুঁথি বয়ে নিয়ে এসেছিলেন মোস্তফা সেলিম। চোদ্দ শতকে আরবি, কাইথি, দেবনাগরী ও বাংলার অনুসরণে এই লিপির ব্যবহার ছিল সিলেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, করিমগঞ্জ, ভৈরব, শিলচর ও আসামে। প্রায় ছয়শো বছর বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষত সিলেট অঞ্চলে এই লিপির প্রচলন ছিল। সেকালের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, যেমন দলিল-দস্তাবেজ রচনা থেকে শুরু করে সিলেটি নাগরীতে লেখা হয়েছিল নবিচরিত, সুফিবাদ, ধর্মের উপাখ্যান, ফকিরি গান, মরমিয়াবাদ। এসব আমার চর্চা ও গবেষণার বিষয় বলেই সেলিম ভাই তেরো শতকের শেষভাবে রচিত 'নূর পরিচয়' ও উনিশ শতকের শেষার্ধের রচনা 'ভেদ কায়া' বই দু'টি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মোস্তফা সেলিম নাগরি লিপির গবেষক ও ঢাকার সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা 'উৎস'-এর কর্ণধারও বটে। ২০০৮ সালে তাঁর প্রকাশনা বাংলা একাডেমি প্রদত্ত 'সেরা মানের

গ্রন্থ প্রকাশনা সম্মাননা' লাভ করেছে। আমার সঙ্গে সেলিম ভাইয়ের সখ্য প্রধানত দুই কারণে। এক, বাউল-ফকির-তন্ত্র ও দেহসাধনার চর্চা। দুই, বাংলা বইয়ের কারিগরি দিকটি নিয়ে আমার প্রধান গবেষণা। ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় যখন এই গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছিল তখন আমাকে প্রথমাবস্থায় রাশি রাশি পুঁথি নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল। তার ভেতর মরমিয়াবাদের পুঁথিগুলি আমার কাছে আবার বাড়তি আকর্ষণেরই ছিল, যেহেতু বাংলার ভৈরব-ভৈরবী, অঘোরী-অঘোরিণী, বাউল-বাউলানি, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, ফকির-ফকিরানিদের জীবনবৃত্তে আমি পুরোপুরি জড়িত। সেলিম ভাইয়ের এই দুই আগ্রহই বোধহয় তাঁকে আমার কাছে টেনে এনেছে। ফলস্বরূপ আরও এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে। এ বছর আমার একুশে গ্রন্থমেলাতে বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে আমার বই।

প্রাকৃতজনদের আচার-কৃষ্টি-দেহসাধনা নিয়ে আমার কাজ যে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে পরিচিতি পেয়েছে সে খবর আমাকে প্রথম দিয়েছিলেন ভাবান্দোলনের পুরোধাপুরুষ ফরহাদ মজহার। আমাদের আখনাবাড়িতে এসে আমার হাত চেপে ধরে মজহার ভাই বলেছিলেন, 'আপনার পূর্বতন শেকড় কোথায় বলুন তো?'

বলেছিলাম, 'কেন?'

বললেন, 'আমার জানা দরকার। যিনি 'ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গে তন্ত্র জিজ্ঞাসায়' লিখেছেন তাঁর আসল দেশটা কোথায়!'

হেসে বললাম, 'আমাদের পূর্বপুরুষের দেশ ময়মনসিংহের নেত্রকোনা।'

মজহার আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'তাই বলুন। ময়মনসিংহ হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

বললাম, 'কেন?'

'আপনি কি জানেন, ময়মনসিংহ অঞ্চলটাতেই রয়ে গেছে তন্ত্রচর্চার বিধৃত ইতিহাস?'

বললাম, 'না। তবে আমাদের নদিয়া ও তার সীমানা লাগোয়া কুমারহট্ট ও তন্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যে জায়গা আমাদের বর্তমান আবাসজমি।'

বললেন, 'তা ঠিক। তবু কী জানেন, যুগল দেহসাধনার তান্ত্রিক আচার ময়মনসিংহেরই ঐতিহ্যজাত। আর তারই উত্তরপুরুষ আপনি বলেই বোধহয় তন্ত্রের যুগল সাধনাটাই আপনার কাছে আকর্ষণের। ছোটবেলায় শ্মশানে পালিয়ে যাওয়াটা, ভৈরবী দর্শন, তাঁদের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা— সবই আপনার বীজসূত্র। শেকড়ে আভাস না-থাকলে এসব জীবনাচরণ চট করে হওয়া সম্ভবই নয়।'

বললাম, 'সে আমি জানি না। তবে ওই রক্তবীজের কথাটা আমার দাদুর মুখেও কিন্তু প্রায়ই শুনতাম।'

মজহার কিছু বললেন না। কেবলই হাসলেন। কিছু পরই আখড়াবাড়িতে গান শুরু হল।

দীনদয়াল গাইলেন :

এ দেহ মন্দিরে, শ্যামা সুন্দরী রে
স্থাপন কেন তুমি করো না।
এমন পরম সুন্দর, মায়ের পূজার ঘর
খালি ফেলে কভু রেখো না।
সপ্ত তালা বাড়ি দক্ষিণ দুয়ারি সারি সারি কত কোঠা
কী কারু-কার্য, অতি আশ্চর্য, চন্দ্র সূর্যমণির ঘটা
তার উপরের কোঠায় বসাইয়ে মায়
মা-মা বলে কেন ডাকো না
নিচের যত তালা দিয়ে, রাখো তালা দিয়ে, ইথে নাহি
প্রয়োজন।
সমীরণ ধ্যান, ভজন-সন্ধান, মহাজনের কাছে জ্ঞান;
হলে স্থির বুদ্ধি, হলো ভূত শুদ্ধি
কার্যসিদ্ধি আর কি ভাবনা
ভক্তি-কুশাসনে, বসো সুখাসনে, হয়ে অতি সাবধানে
জাতি মান কুল, বিল্বপত্র ফুল, বিশ্বাস তাহে চন্দন;
আশা-কোষা-ছিপ, জ্ঞান-ধূপ-দীপ
নৈবেদ্য দাও বিষয়-বাসনা।
দীনতা-আচারে, কাতর উপাচারে, পুজোশক্তি
অনুসারে
শঙ্খ-ঘণ্টা-রব, আপনি উদ্ভব, হইবে ত্রিকোটিপুরে
নয়ন-সলিল ভালো হতে ভালো
গঙ্গাজল কাজে লাগে না।
ন্যাস প্রাণায়াম, সংযম নিয়ম, ছাড়ো যত আড়ম্বর
নামে আচমন, নামে আবাহন, নামে বিসর্জন করো
কীসের উপবাস করো দ্বিজদাস
সুধা খেলে বাধা হবে না।

দুই

নরসিংদী জেলার পলাশ-পারুলিয়ায় দ্বিজদাসের জন্ম। তাঁর পুরো নাম বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। 'দ্বিজদাস' ভণিতা ব্যবহার করেই পদ লিখতেন তিনি। তাঁর জীবিতকালেই ১৯২৪ সালে 'পারুলিয়া, ঢাকা' থেকে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী প্রথম দ্বিজদাসের ১৭৫টি পদ সংকলিত করেন।

দ্বিজদাস ছিলেন নিঃসন্দেহে বস্তুবাদী সাধক। তাঁর পদ পড়লেই অনুমেয় শক্তিপ্রবাহের অন্তঃস্তলে, আকার-নিরাকারের আড়ালে দেহে চৈতন্যকে উপলব্ধিই ওঁর সাধনার প্রধান বিষয় ছিল। বাংলার তন্ত্র-বাউল-ফকিরি সাধনার মূল জায়গা হল এটাই, রজঃবীজে বস্তুরক্ষায় গুরু-পরম্পরা বাহিত প্রয়োগমূলক এক লোকজ্ঞান।

দেহসাধনার এই মূলধর্ম মোস্তফা সেলিমের আমার জন্য বয়ে আনা সেই পুঁথি দু'টিতেও ছিল। 'নূর পরিচয়'-এ রয়েছে দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, হরফতত্ত্ব, শরিয়ত, মারফত, হাকিকত, তরিকতের এক আশ্চর্য সমন্বয়। আর 'ভেদ কায়া' বোঝাচ্ছে যে দেহসাধনাই যুগল ভজনার প্রধান উপজীব্য। 'কায়া' মানে হল গিয়ে দেহ। 'ভেদ' মানে রহস্য। 'ভেদ কায়া' হল গিয়ে সেই দেহরহস্যেরই আধার। 'নূর' হল আলো, জ্যোতিস্বরূপ বা পরমাত্মা। তার সান্নিধ্য লাভের জন্যই তো দেহকেন্দ্রিক চর্যাসাধন। তান্ত্রিক দেহ-রসায়ন তাই আদতে নিরীশ্বরবাদী এক দর্শন। শরিয়ত বা বেদবিরোধী লৌকিক ধর্মের সঙ্গে এর প্রভূত সাজুয্য রয়েছে। দ্বিজবাদের এই গান বা আরও বিস্তৃত ঢাকা থেকে বেরোনো সেলিম ভাইয়েরই প্রকাশনার সুমনকুমার দাশের সম্পাদিত 'দ্বিজদাসের গান' সংকলন-গ্রন্থে যে তিরিশের অধিক মাতৃসঙ্গীত আছে তার সবগুলির ভেতরই কিন্তু রয়েছে তান্ত্রিক দেহসাধনার কোলাহল।

আমাদের রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত যেসব মাতৃসঙ্গীত রচনা করেছেন, তার ভেতরও কিন্তু তন্ত্রসাধনার প্রধান উপকরণগুলিই বিদ্যমান। তবে এই দুই সাধক অবশ্য দেহসাধনা করেননি। তান্ত্রিক সাধনার প্রধান আধার হল গিয়ে দেহ। জৈব প্রয়োজনের মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনের পঞ্চ 'ম'-ই আদতে দেহসাধকের মানসিক ও আত্মিক উপমাতে সামিল। তাই স্থূল বা প্রতীকী কালী বা মায়ের মূর্তির সঙ্গে কুন্ডলিনী মহাশক্তিই এখানে অভিন্না হয়ে ওঠেন। এই 'ভেদ কায়া'-ই আসলে তন্দ্রবিদ্যাকে জারিত করে। তন্ত্রের এই সঙ্গীত বা মন্ত্র সমন্বয়কারী গীতিকবিতাই। ঋগ্বেদের ঋষি রচয়িতারা কিন্তু ঋক্‌গুলিকে গেয়েছিলেনই। মন্ত্রের শ্রবণ, সঙ্গীতের সমন্বয়ে গীতিকবিতাতেই সামিল। বেদ আদতে কিন্তু কবিতাই। গৌরী ধর্মপাল এর সুন্দর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিখেছেন।

তন্ত্রে বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে 'বর্ণেশ্বরী' নামে চিহ্নিতা করা হয়। তাই এখানে 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণ মাতৃকাবর্ণেই বিভূষিতা। মায়ের এই পঞ্চাশটি বর্ণের জপমালা বা অক্ষমালাই শরীরের ছয়টি চক্রে বিভূষিত। তাহেরপুরের একশো পেরোনো মাতৃসাধক দয়াল বাবা একবার আমায় বলেছিলেন, 'বুঝলি, স্থূল মাতৃসাধনের কী আর দরকার। একসময় পঞ্চ-ম-কার পেরিয়ে সাধকের শরীরই মায়ের বাসা হয়ে ওঠে।'

দয়াল বাবা ঠিকই বলেছিলেন। যে কারণে তন্ত্রের কালিকাও 'পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী' হয়ে শরীরের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্রেই বিধৃত। এখানেই মাতৃকা শক্তিকে দল-বর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন দেহসাধক।

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী তাঁর কাব্যগ্রন্থেরই নাম রেখেছিলেন 'মাতৃকাবর্ণেরা এস'। তিনি লিখছেন, 'মাতৃকাবর্ণেরা এস ভর হও আমার কলমে। /চোখের সম্মুখে যাতে চিত্রের ভাঁতির মতো, সেই মন্ত্রে, জেগে ওঠে সব : / পাহাড় ক্রোশের পর ক্রোশ, সারি-সারি, যতদূর দেখা যায়—/ মাথায় সমান তারা, লাগে প্রত্যেকেই একবয়সী।' সমতানের এই মাতৃকাবর্ণ আদতে শক্তি বা তন্ত্রসাধনার 'কালী পঞ্চাশৎ'। সেজন্যই শাক্তপীঠের সংখ্যা মূলত পঞ্চাশ।

তন্দ্রের আদি গুরু হিসেবে রয়েছে শিবের স্থান। একে যদি সঠিক মান্যতা দিতেই হয় তাহলে শিবের জীবন্ত অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিতেই হয়। আর এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভারতের একটা জাতিগত দ্বন্দ্বময় সময়ে শিবের আবির্ভাব। শিব মানে হল গিয়ে কল্যাণ। তিনি সর্বদাই সবাইকার মঙ্গলচিন্তার জন্যই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডল যদি সভ্যতার আদি নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয় তাহলে মানব সভ্যতার বিকাশের বয়স পনেরো হাজারের বেশি তো কখনওই নয়। ঋগ্‌বেদের সভ্যতা তাই প্রাক্-শিব পর্বের বলেই মনে হয়। তখন নিয়মবদ্ধ সমাজও সেইভাবে তৈরি হয়ে ওঠেনি। মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার বনাশ ঘটছে আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত হচ্ছে। এটাকে যজুর্বেদের সময় হিসেবে চিহ্নিত করে শিবোত্তর বলেই তাই অনায়াসে অভিহিত করা যায়। সেজন্য শিবের সময় পর্ব সাত হাজার বছরের কালসীমাতেই আটকে যাবে।

সভ্যতার আদি কালে মানুষ পাহাড়ে বাস করত। সভ্যতার অল্প বিকাশ হলে মানুষের বাস বনে-জঙ্গলেও শুরু হয়। তথাপি মানুষ পাহাড়ের গুহাতে থাকাই বেশি নিরাপদ বোধ করত। গুহার মুখ পাথরের চাঁই দিয়ে বন্ধ করে রাখত। আগুন

আবিষ্কার হলে পর গুহার চারধারে বা অভিমুখে এবং জঙ্গলে থাকার চারিপার্শ্বে আগুন জ্বেলে আত্মরক্ষা করত। শিবের বাস পাহাড়েই ছিল। পুরাণ ঘটা করে তার নাম রেখেছে কৈলাস। শিব গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁর সময়ের আগে গোষ্ঠীমাতা ছিলেন। সংস্কৃতে গোত্র মানে হল পাহাড়। আসলে যে যেখানে থাকতেন সেই নামেই গোত্র নিরূপণ হত। গোষ্ঠীপতি ঋষি কাশ্যপ, ভরদ্বাজদের নামে চালু গোত্রগুলির সূত্রপাত আদতে এভাবেই। এ ছাড়া গোত্রের বলার মতো আর কোনও ইতিহাস নেই। শিব গোষ্ঠীপতি, তাই তাঁর নামেও শিব গোত্রের প্রচলন। গোত্রপিতার ব্যবস্থায় এক পাহাড়ে বসবাসকারীদের সঙ্গে অন্য পাহাড়ে বসবাসকারীদের বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক। মানুষের পাশবিক বৃত্তির প্রবল এই সময়ে অন্য পাহাড়কে আক্রমণ করে সেই পাহাড়ের মেয়েদের তুলে এনে বিবাহ করাটাই স্বাভাবিক। পরাজিত পাহাড়ের পুরুষেরা হত দাস আর নারীরা বৈবাহিক দাসী। আমাদের বিবাহ প্রথা এখনও যেন সেই চিহ্ন বহন করছে। ছেলে বিবাহ করতে গেলে লোকাচারে মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে তাই বলে, 'তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' এটা অনেকটা সেই পাহাড়ে হামলা চালিয়ে মেয়েকে ধরে আনার প্রথাতেই সামিল। ধরে বেঁধে আনার সঙ্গে দড়ি বা শেকলের একটা বন্ধন থাকে। বিবাহ বন্ধনে সেই চিহ্নই গাঁটছড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শেকল, হাতকড়া নোয়াতে পর্যবসিত হয়েছে। নোয়া বেঁধে দেওয়া বন্দিনী, দাসীর রূপকেই যেন প্রস্ফুটিত করে। মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় মেয়েরা লড়াই করত। আর সেই লড়াইয়ে কপাল পেটে গিয়ে বেরোনো রক্ত বিবাহের সিঁদুরে রূপ নিয়েছে। না হলে শৃঙ্খল ছাড়া গাঁটছড়া, নোয়া, সিঁদুরেরও কোনওরকম কোনও পূর্বাপর ইতিহাস নেই, মনগড়া ইতিহাস ছাড়া।

শিব বলবান ছিলেন। তন্ত্রজনক শিবের তাই স্বভাবজ ইচ্ছা গোটা বিশ্বকেই তান্ত্রিক করে দেওয়ার— 'কুর্বন্ত বিশ্বং তান্ত্রিকম্'। কল্যাণময় শিব— 'অনাদ্যানন্তমখিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্। /বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাতা শিবং শান্তি-মত্যন্তমেতি॥'— মানুষকে তান্ত্রিক করতে চেয়েছিলেন মানে, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতেই আদতে শিখিয়েছিলেন। এই সংগ্রাম শরীর সাধনায় ইন্দ্রিয় জয়েরই সংগ্রাম প্রকারান্তরে।

শিবের সময় মানবগোষ্ঠীর তিন শাখা—অষ্ট্রিক, মঙ্গোল ও নিগ্রো। তিনটে শাখাই ভারতে বর্তমান। অষ্ট্রিক— অনার্য কৃষ্ণকায়। আদিবাসী সমাজের বৃহত্তর অংশই অষ্ট্রিক রক্তজাত। বাঙালির রক্তে অষ্ট্রিক, মঙ্গোল, নিগ্রো—তিন রক্তই রয়েছে। শিবের সময়ও তিন রক্তগোষ্ঠীই বর্তমান। অনার্য কৃষ্ণকায়দের পাশাপাশি

ফরসা রঙের আর্য। আর্যদের রঙের ভিত্তিতেই তিনটে বিভাজন। উত্তরের আর্যদের চুল লাল, চোখের তারা কটা বা লালচে। এরা হল নর্ডিক। নীলচে চুল আর চোখের অধিকারীরা অ্যালপাইন আর্য, এদের গায়ের রং লালচে ফরসা নয় গোলাপি ফরসা। আর দুধের মতো গায়ের রং, চুল ও চোখের কালো তারার অধিকারী আর্যরা হল মেডিটেরিয়ান। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ আর্যদের আগমন মেডিটেরিয়ান গোষ্ঠী থেকে। দক্ষিণ ভারতে এসে মিশেছিল অষ্ট্রিক-মঙ্গোল-নিগ্রোশাখা। পশ্চিমদিক থেকে এসেছিল ফরসা রঙের আর্যরা। উত্তর দিক থেকে, তিব্বত-চিনের দিক থেকে এসেছিল মঙ্গোলিয়ান। এই তিনের মিলন যেমন হয়েছে, লড়াই হয়নি এ তো আর বলা যায় না। শিবের সময়ে তাই পাহাড়ে পাহাড়ে লড়াই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। আর্য-অনার্য-মঙ্গোলীয়—এই লড়াইয়ের নিষ্পত্তি চেয়েছিলেন শিব। সেজন্যই তিনি সাধনতন্ত্র দিয়ে, নৃত্যগীত দিয়ে, আয়ুর্বেদ দিয়ে মানুষকে এক করতে নেমেছিলেন। অর্থাৎ মানুষের সমাজে একটা সিস্টেমিক ফর্ম আনতে চেয়েছিলেন শিব। শিবের আগে বিবাহ প্রথাও ছিল না। মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় মাকে তাই চেনা যেত, বাবাকে চেনা যেত না। শিব বিবাহ প্রথার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, সদর্থক এই মতটি দেওয়াই তো যায় তাঁর বৈবাহিক সম্পর্কগুলো দেখে।

শিবের সময়ে বহুবিবাহ প্রথা ছিলই। ধরে তো নেওয়াই যায় যে, শিব তিনখানা বিবাহ করেছিলেন। বুদ্ধিমান ছিলেন শিব। তাঁর তিন বিবাহ তাই ছিল তিন সম্প্রদায়ে। আর্যকন্যা পার্বতী, অনার্যকন্যা কালী আর মঙ্গোলীয় কন্যা গঙ্গা। তিন সম্প্রদায়ের তিন কন্যাকে বিয়ে করে শিব তিন জনগোষ্ঠীকে একত্র মেলবন্ধনের বার্তা দিতে চাইলেন। প্রচলিত ছড়াটিও যেন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক— 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদেয় এলো বান, /শিবঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যা দান।' শিব তাঁর তিন স্ত্রীর মাধ্যমেই তিনটে পৃথক জনগোষ্ঠীতে তন্ত্রধর্মের প্রচার শুরু করলেন। শিবকে যে সকলেই গোষ্ঠীপতি, নেতা মেনেছিলেন তার মস্ত প্রমাণ, আর্যরা শিবকে দেবতা মানেন, অনার্যরাও মানেন, আবার মঙ্গোলীয়-তিব্বতী সমাজেও তিনি দেবতা। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ-জৈনরাও তাঁকে মানত, তাঁর ওই উদার সমন্বয়বাদেরই কারণে।

শিবের স্ত্রীদের আরেক উপমাতেও লোকায়ত করে নেওয়া যায়। দেবী দুর্গার পার্বতী নাম, সেটাও ওই পর্বতবাসিনী হবার জন্য, পর্বত বা গিরি কন্যা হবার জন্য। শিব নিজে ছিলেন গোষ্ঠীপতি বা পর্বতের অধীশ্বর। সেইজন্য তাঁর আরেক নাম গিরীশ। সেই হিসেবে তাঁর স্ত্রী পার্বতী নামেও পরিচিতা।

দেবী দুর্গাকে মহাদেবী বলা হচ্ছে। আসলে ভারতের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাতৃদেবতা এই মহাশক্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে শাস্ত্র-মান্যতার মহাদেবী হিসেবে পূজিতা হচ্ছেন। আর খেয়াল করার বিষয় এটাই, ভারতের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাতৃকাশক্তি কিন্তু আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি। দেবী দুর্গার যে কাত্যায়নী নাম, তার পেছনের ইতিহাস হল, তিনি এক সময়ে কাত্যজাতির ভেতরই পূজিতা ছিলেন। কুশিক জাতির উপাস্য দেবী ছিলেন বলেই দুর্গার অপর নাম কৌশিকী। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের নাম কন্যাকুমারিকা হয়েছে, তাঁর কুমারী নাম থেকে। দুর্গা অম্বিকা নামেও চিহ্নিতা। অম্বিকা কথার অর্থ ক্ষুদ্র মাতা। দুর্গা কথার অর্থ হল দুর্ভেদ্য। দুর্গরক্ষিণী বলেই আসলে তিনি দুর্গা। তাঁর শাস্ত্রীয় অভিধান কিন্তু অনেক পরের ব্যাপার। কৃষ্ণবর্ণা বলেই কালী হিসেবে দেবীচিহ্নিতা। ভারতের দার্শনিক শক্তিতত্ত্ব তো পুরোপুরি আর্য ব্রাহ্মণবাদেরই খেলা। শিব প্রবর্তিত তন্ত্রধর্ম কখনওই মন্ত্রমূলক তো নয়, পুরোপুরি ক্রিয়ামূলক। তন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্রের সম্বন্ধ অনেক পরের ব্যাপার। চণ্ডী-কাহিনির পেছনে কোনও লৌকিক গল্প ছিল না এটা তো হতে পারে না। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' অবলম্বনে অনেক কাব্য রচনা করা হয়েছিল। পাঞ্জাবী ও হিন্দীতে গুরু গোবিন্দ সিংহের 'চণ্ডজী-চরিত্র' এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবী যত না শাস্ত্রমান্যতায় অধিষ্ঠিতা, তার চেয়ে শতগুণ তিনি লৌকিক। আঠারো-উনিশ শতকের পাঁচালি, আগমনী-বিজয়ার গানগুলিতেও দেবীর লৌকিক রূপ প্রস্ফুটিত। তাই শিব প্রবর্তিত তন্ত্রের সঙ্গে যেহেতু শাস্ত্রিক সংস্কৃতির যোগাযোগ আদতে নেই, অনায়াসেই শিব-সম্পর্কিত তান্ত্রিক আচারে লিখিত প্রয়াসগুলিকে তন্ত্রের কবিতা বলেই চিহ্নিত করা যায়।

তিন

সতী মায়ের আখড়াবাড়িতে বসে ফরহাদ মজহার আমার যুক্তিকে পুরোপুরি সমর্থনই জানিয়েছিলেন। 'ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গে তন্ত্র জিজ্ঞেসায়' বইটিতে একান্ন পীঠের মিথোলজি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম : তিব্বতে কোনও অবতার-মানুষের মৃত্যু ঘটলে সেই দেহের সৎকার নানাভাবে হয়ে থাকে। মৃতদেহের নানা প্রত্যঙ্গের অংশ নিয়ে স্তূপ বা সমাধি পীঠ করার একটা রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে অদ্যাবধি। ভারতেও বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর নখ, চুল ইত্যাদি নিয়ে নানা পীঠ হয়েছে। এই প্রথা ভারত বাহিত আচারিত ধর্মমতে কবে সামিল বলা

শক্ত। শিবের যে কৈলাস প্রিয়স্থান, তাও কিন্তু তিব্বতেই। শিবকে বুদ্ধের থেকেও প্রাচীন মানুষ ধরা যেতেই পারে প্রামাণ্য সন্দর্ভ নিরিখে। শিবাংশ দিয়ে ভারতে ছড়ানো মহাপীঠের একটা ইতিহাস তো আছেই। তাহলে পার্বতী বা সতীর দেহাংশ নিয়ে পীঠস্থানকে শুধু মিথোলজিক্যাল না দেখেও বোধসীমায় আনতে পারি,... তন্ত্র তো মানাও হচ্ছে শিব প্রবর্তিত ধর্ম। এখানেও তিনি জীবন্ত। তাহলে এভাবেও পার্বতী বা সতী সাধিকার অস্তিত্ব পীঠের ব্যাখ্যা আনা যেতে পারে। বিজ্ঞান আবার বিশ্বসৃষ্টির মূলে একান্নটি ধাপের কথা বলছে। Big Bang-এ প্রথমে ছয়টি সূক্ষ্ম তারপর সাতটি সূক্ষ্ম স্তরের সমষ্টি হচ্ছে গিয়ে একেবারে ৪২। তার উপর আরও সাতটি অতি সূক্ষ্ম স্তরও আছে মানা হচ্ছে। তাহলে হচ্ছে ৪৯। তারপরও বলা হচ্ছে যে অতি শূন্যতার একটা পর্যায় আর নিশ্চল বিস্ফোরণের বেগের একটা পর্যায়। এই নিয়ে একান্নই দাঁড়াল। যেগুলো সবই হল গিয়ে তরঙ্গ পর্যায়। এই নিয়ে শক্তিমত্তার প্রকাশ আছে। সুতরাং মিথোলজির একান্নতে একটিতেই মিল শক্তি অর্থে। যাকে সাধক কুণ্ডলিনী হিসেবে দেখছেন। শক্তির সঙ্গে স্থূল প্রকৃতি-মিলনও বাহ্যিক হিসেবে তাই বোধহয় জড়িয়ে রয়েছে তন্ত্রে।

ফুলিয়া, কামাখ্যা, তারাপীঠে যখন তন্ত্রের একরাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি যোগমায়া ভৈরবীর কাছে যেতাম, তখন মা একটা মারাত্মক কথা বলতেন।

বলতেন, 'তন্ত্র কি পড়বার জিনিস? তন্ত্র হল গিয়ে করবার জিনিস। ওটা হল গিয়ে করণ। গুরুর কাছে এ বিদ্যা শিখতে হয়। বই পড়ে তা কি আয়ত্ব করতে পারবি তুই!'

আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বেদ-উপনিষদে আদতে যা লিখে গেছেন সবই হল গিয়ে সাধকের করণ। সেল্‌ফ রিঅ্যালাইজেশন। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'-র ভেতর যে, 'মধুকৈটভ বধ', 'মহিষাসুর বধ', 'শুম্ভ বধ'-এর পর্বগুলি আছে সেগুলিকে তাই 'গ্রন্থিভেদ' হিসেবে দেখছেন ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব। তিন খণ্ডে তিনি 'সাধন-সমর-বা দেবী মাহাত্ম্য' নামে অসাধারণ এক গ্রন্থ লিখেছেন। সেখানে 'চণ্ডী'-র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিন্তু দেহসাধনাতেই সামিল হয়েছে।

গ্রন্থি মানে হল গিয়ে গিঁট। মানব শরীরের জীবত্বের সেই গিঁট খুলে সচ্চিদানন্দ বহ্মাকে উপলব্ধি করার জন্যই আসলে দেবী দুর্গার 'সাধন-সমর'। তাঁর এই ব্যাখ্যার ভেতরও কিন্তু তন্ত্রের করণক্রিয়াটিই উঠে আসছে।

বৈদিক আর্য ব্রাহ্মণরা শিবকে কখনই প্রধান দেবতা মানেননি। তিনি ছিলেন অনার্য-আদিবাসীদের নেতা। আর্যদের কাছে এরা পতিত। শিব শ্মশানে-মশানে থাকে, জামাকাপড় পরে না; একটা বাঘছাল জড়িয়ে লোকালয়ে আসে, যা-তা খায়, নেশা করে, ছোটলোকদের ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে, তাকে কী করে মেনে

নেবেন সভ্য আর্যরা? শিবের যখন বিবাহ হল আর্য প্রজাপতির মেয়ে উমার সঙ্গে, তখন আর্য দেবতারা চটে গেলেন। পরবর্তীতে যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারখানা ঘটল সেটা তো শিবকে একঘরে করে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আর্য দেবতারা শিবের মহাশক্তির কাছে মাথা নত করলেন। শিব তখন জাতে উঠলেন, মহেশ্বর হলেন। আর্য ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সঙ্গে একাসন হল তাঁর। না হলে শিবের আপাতিক ইমেজ তো লোকায়ত মানুষের। তিনি বাংলার জনগণের দেবতা। রাঢ়ের কুর্মী মাহাত, দক্ষিণ দিকের মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনার মাহিষ্য, রাঢ়ের উত্তর-মধ্যাংশের সদ্‌গোপ, বারেন্দ্রভূমির রাজবংশী, পূর্বসমতট ও দক্ষিণ ডবাকের নমঃশূদ্র, উত্তরবঙ্গের চাকমারা সবাই শিব পুজো করে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মপ্রবাহের প্রবল ধারা যখন বাংলাতেও বহমান, তখনও এই জাতবাঙালি বা আদিবাসীরা কোনওভাবেই শৈব ধর্ম ছাড়েনি। তবে বৌদ্ধ ও জৈনাচার শৈব ধর্মের আচারে ও অনুষ্ঠানে এসে প্রাবল্যের সেই অজ্ঞাতসারে মিশে গিয়েছে, এটা আবার মানতে হবে। মহাযানী বৌদ্ধদের ধর্মচক্র ব্যবস্থাই শৈবাচারে তাই তখন হয়ে উঠল চড়ক। বুদ্ধদেব যখন সারনাথে ধর্মপ্রচার করলেন, তখন পাঁচজন শিষ্যকে ধর্মদেশনা দিয়ে বললেন, ধর্মের চাকা যেন কখনওই না থামে। ধর্মের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার সেই রীতি তো আজও ভুটান, তিব্বত, লাদাখ, অরুণাচল, নেপাল, সিকিম, দার্জিলিংয়ের বিহারগুলিতে ঢুকলেই দেখা যায়। লামারা এই ধর্মচক্র ঘুরিয়েই তো বলতে থাকেন, 'ওঁ' মণিপদ্মে হুং, ওঁ মণিপদ্মে হুং— এই চাকা যেন না থামে, চক্র ঘুরতেই থাকে। শিবের নামেও একটা চড়ক গাছ দিয়ে তৈরি করা হয় বাঁশে বাঁধা চক্র, তাতে ভক্ত নিজেকে বিদ্ধ করে ঘুরতে থাকে। চড়কের সঙ্গে আবার জড়িয়ে গেছে বাংলার গাজন। সারা বছর ধরে নানাজনের সঙ্গে নানা অকথা-কুকথা বলেছি, জাগতিক কর্মের কথকতায় আমাদের সংসার ধর্ম মুখর হয়েছে এবার বছর শেষে 'শিব হে, শিব হে' বলে একদিন তাঁকে স্মরণ করে অন্তত মানুষের জমায়েত করি। এই শিবের নামের গর্জনই আসলে অপভ্রংসে বাংলার গাজন হয়ে গেছে। ঝাঁপান ব্যাপারটাও এর সঙ্গে জড়িত। কাঁটা, কুশাগ্র লোহা, লোহার খাঁচার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া। শিবের নামে শরীরকে কষ্ট দিয়ে, নির্যাতন করে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাই হল গিয়ে বাংলার ঝাঁপান। বরেন্দ্রভূমিতে ছিলেন শিবভক্ত বাণরাজা। তিনি প্রবর্তন করেছিলেন শিবের নামে বাণবিদ্ধ হয়ে চড়ক ঘোরার রীতি। তাঁর নামেই বাণেশ্বর, বাণগড় জায়গাগুলি এখনও তো বারেন্দ্রভূমিতে বিরাজ করছে। রাঢ় দেশে, অজয় নদের অববাহিকায় শিবের গুণকীর্তন করেই সমসময়ে এক উৎসব হয়। তার নাম হল গিয়ে বোলান— 'বন্দনা করিব

আমি শিবেরে আমার, /যিনি পূর্ণ যিনি নিত্য যিনি সংরাৎসার।' শিবের শাস্ত্রীয়, দেবনাগরী মন্ত্র রচনার পাশাপাশি এইসব প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন বাংলার তন্ত্রচর্চা বা তন্ত্র কাব্যগাথার প্রসঙ্গক্রমে প্রাসঙ্গিক একটি অধ্যায়। যেখানে অসংখ্য ছড়া-কবিতা-গানের স্রষ্টাটিকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এইসব প্রাকৃতজনের কাব্য বাংলার শিবতন্ত্রের চিরন্তন এক অধ্যায়।

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের কালক্ষয়। জৈন ধর্মেরও তথৈবচ অবস্থা তখন। দার্শনিক, তাত্ত্বিক শক্তি থেকে বেরিয়ে দুই ধর্মই ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতজনের চৌহদ্দিতে একেবারে মিশে যাচ্ছিল। ফলস্বরূপ বজ্রযান বা বৌদ্ধিক যোগাচারের উদ্ভব হল। বজ্রযানের সাধনা হল গুরু মুখাপেক্ষী। আচার্যদেব তাঁর শিষ্যকে দীক্ষাদানে অভিষিক্ত করেন। গুরু এখানে বোধিচর্চার নিয়ামক। গুরু দেশিত সাধন মার্গ— ওপায়িক কর্ম, কায়া, বাক্ ও চিত্ত পরিশুদ্ধির এই দেহগত সাধনাই হল বজ্রযান। অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী, অবিনাশী এবং শূন্য লক্ষণযুক্ত বজ্রস্তরে নিজেকে নিয়ে যাওয়া। AB.

এরপরই এল কালচক্রযানের সাধনা। দেহস্থ নাড়িপ্রবাহ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে গুরুর করণ-নির্দেশিকায় একেবারে আয়ত্বে নিয়ে আসা। তার পরই উঠে এল সত্ত্বের স্ব-ভাব স্বতঃস্ফূর্ত করে ফেলার প্রক্রিয়া— সহজযান। দার্শনিক তত্ত্ব থেকে দেহাচারকেন্দ্রিক এক দর্শনে রূপান্তরিত হযে উঠল বৌদ্ধ ধর্ম। খ্রিস্টিয় আট শতক থেকে বারো শতক এই সাধকদের রচিত কাব্যগাথাও তাই দেহাচরণের এক অনন্য ইতিহাস। বাঙালি জাতি ও তার ভাষা গড়ে ওঠার আশ্চর্য প্রেক্ষাপট রয়েছে এই তিব্বতী 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-র কাহিনিগুলিতেই। এর নায়করা কিন্তু সকলেই বাংলারই প্রাকৃতসমাজের প্রতিনিধি। তন্তিপা তাঁতি, চমরিপা চামার, কেলিপা তেলি, ধোম্বিপা ধোবী, কুমোরিপা কুমোর, মেদিনীপা চাষি, কংপরিপা কামার। শুধুমাত্র বৃত্তিগত বিশেষণেই তাঁরা যে সাধক-কবি হিসেবে এখানে সব সময়ই চিহ্নিত, তাও নয়। মাছের অন্ত্র খেতেন বলে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁকে লুইপা বলে ডাকত। কুকুর নিয়ে চলতেন কপিলাবস্তুর এই সাধু, তাই তাঁর নাম হল কুকুরীপা। বেশ্যার ভৃত্য ছিলেন সালিপুরের সাধক। বাবু এলে তাঁর কাজ ছিল দ্বার সামলানো। সেজন্যই তাঁর নাম দারিকপা। দিংকপা ধান কুটতেন বলে তাঁর নাম হয়ে গেল বৃত্তিগত। মিথ্যে কথা বলতেন খুব, আর লোক ঠকাতেন এক সাধক। গুরু তাঁকে ধর্মাচরণ করতে বললে বললেন, 'আমার মিথ্যে বলার অভ্যাস। এমন কোনও ধর্ম যদি থাকে সেখানে মিথ্যে বললেও ধর্মাদেশ হবে তবেই আমি নিতে পারি'। গুরু তাকে বললেন, 'জেনো সর্ববস্তু আদি থেকেই মিথ্যা। দেখা,

শোনার ইন্দ্রিয়গুলি, অভিজ্ঞতাগুলিও মিথ্যা। সংসার ধর্ম, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, যড়ইন্দ্রিয়—সকলেই তো মিথ্যা। তুমি এই সর্ব মিথ্যারই ধ্যান করো। বাক্য মিথ্যা, শব্দ মিথ্যা, রূপ মিথ্যা।' জাগতিক বস্তুর অস্তিত্বকে গুরুর কথা মতো মিথ্যা জেনে সাধকের তখন সর্ব বিষয়ে আসক্তি চলে গেল। তাঁর বোধি লাভ হল। মিথ্যা বলতেন বলে, মিথ্যার ধ্যানে সিদ্ধ বলেই তাঁর নাম হল থকণপা। আবার ঘন্থরের মানুষ বীণা বাজিয়েই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলে তিনি বীণপা নামেই খ্যাত হয়ে উঠলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বৃত্তি, আচার অনুযায়ী সংসারে থেকে সাধনা করেই এই সব শবর, ব্যাধ, চামার, চোর, কাঠুরে, ভিক্ষুক, মুদি, দর্জিসহ শ্রমজীবী অশিক্ষিত, ছোটলোক বা প্রাকৃতজনেরা গুরুর করণ বা শ্রুত উপদেশ পেয়েই সিদ্ধ হয়েছেন; সাধন উপলব্ধির কাব্যগাথা লিখেছেন নিজেদের কথা বলারই ভাষায়। যার মধ্যে মিশে রয়েছে বৌদ্ধ ব্রজযান-সহজযানের কায়া সাধনারই ভাষা। এই চুরাশিজন সিদ্ধ সাধকদের ভেতর আবার তিনজন মহিলা বা সাধিকার নামও পাওয়া গিয়েছে। এই সব জেলে-জোলা, তিলি, মেথর, মুচি, চণ্ডালেরা ডুপ থোব (তিব্বতী ভাষায়) বা সিদ্ধ। চুরাশি সিদ্ধর কাহিনি এক অর্থে প্রাকৃত সমাজের ধর্ম, সাধনা, সমাজ, সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণেরই কাহিনি। আর সিদ্ধদের গুরুরা, তাঁরাও কেউই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা শাস্ত্রজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য নন। এঁদের দীক্ষা তন্ত্রের সেই ডাকিনী আচারে। এঁরা শিষ্যদের জাতপাতের ধারণা মোছাতে চেয়েছেন; তাই ব্রাহ্মণজাতি বা রাজা পর্যন্ত এঁদের শিষ্য হয়ে শ্মশানে-শ্মশানে যত্র-তত্র পড়ে থেকেছেন; খাদ্যাখাদ্যের বিচার ভুলে বাসি-পচা খেয়েছেন আর গুরুর নির্দেশে ইন্দ্রিয়ের সংযম করেছেন। মদ খেয়েছেন ; নেশাভান করেছেন; শুঁড়িখানায় গেছেন, হীন রমণীর সঙ্গে থেকেছেন; তাঁকেই যুগল সাধনার সঙ্গিনী করেছেন; মঠ, মন্দির, সংঘারামকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্মশানে, পথের ধারে, হীন রমণীর বাড়িতে, শুঁড়িখানায় বসে বৌদ্ধধর্মের নীতি-নিয়মের ধার না ধরে নিষিদ্ধ মদ্য, মাংস, মৈথুনের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়দমন করে সিদ্ধ হয়েছেন। তবে কাজটা তো খুব সহজ ছিল না। এভাবে সাধনা করতে গিয়ে অনেকেই সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত, শ্রেণিচ্যুত, ধর্মচ্যুত হয়েছেন। সিদ্ধদের মধ্যে তো সবাই-ই প্রাকৃতজন নন, কেউ কেউ রাজা, ব্রাহ্মণ, উচ্চশ্রেণির প্রতিনিধি। তাই সংঘাত অনিবার্য। প্যারালাল ধর্মাচরণ সব সময়ই সংঘাত, অস্তিত্বের নিষ্পেষণের ভেতর দিয়েই এগিয়েছে। বাংলার তন্ত্র-বাউল-ফকিরচর্চার ইতিহাস তো সেই কথাই বলে।

সিদ্ধদের কাহিনি যে সময়কার, তখন পাল রাজাদের আমল। রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা, বিক্রমশীল, সোমপুরী, ওদন্তপুরী বিহারে তখন রীতিমতো

তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মচর্চা। তারই ভেতর প্রাকৃতজনের সহজ সাধনা মাথা তুলছে শ্মশানে, বেশ্যা ও শুঁড়িখানায়। সুতরাং সেই ধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হবে না তা কি কখনও হয়। তাই আঠারো-উনিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সংস্কার আন্দোলনের সময়েও প্রাকৃতধর্ম, লোকধর্ম, বাউল-ফকির মতবাদ যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে সমসময়ে এই সিদ্ধরাও বৌদ্ধসমাজের সংস্কার আন্দোলনে নিষ্পেষিত হয়েছেন তাঁদের আচার-সংস্কৃতি-মতবাদ-সাধনা-করণ যেজন্য ধরে রাখার কারণেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে যেসব কথা বলেছেন, ভক্তশিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন, তা তাঁদের মৌখিক গুরু-পরম্পরারই ফসল। মোনডুপ শেরব তাই বলেছেন, ভারতের চম্পারণের মহাগুরু অভয়দত্তশ্রীর কাছে শুনেই এই 'চুরাশি সিদ্ধর কাহিনি' লেখা। কাহিনিকারদের কথিকাগুলি বঞ্চিত, নিরক্ষর সমাজের উপদেশ বলেই স্বভাবত এর ভাষা দেবভাষা সংস্কৃত নয়। আসলে এই সব প্রাকৃতজনেরা যেভাবে জীবন কাটাতেন, যেখানে যাদের মধ্যে থাকতেন, খেতেন, শুতেন, রমণ করতেন, গুরুর উপদেশ মেনে সাধন করতেন সেসব কথাই ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে পরিবেশন করতেন নিজেদের কথ্য ভাষায়। তাঁদের সেই সরল, সহজ অনুধাবনগুলো পরবর্তীতে তথাকথিত উচ্চকোটির সংস্কৃতির মানুষ বা তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের কঠিন লেগেছে বলেই তাঁরা টীকা বৃত্তি প্রভৃতি কত কিছুর অবতারণা করেছেন। মুখের কথার সহজ দোহাকে তাঁরা শাস্ত্রের কচকচি চাপিয়ে সাধারণের হাত থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের কেরামতি দেখিয়েছেন। সহজ সাধনা যে জগৎ-প্রপঞ্চের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির গুরু-আশ্রয়ী একটা মার্গদেশনা; যেখানে সত্যের নিরাবরণ স্বরূপকে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় নিজের অভ্যন্তরস্থ নাড়িচক্রের সাম্যাবস্থায়—সেটা অবশ্য মুনিদত্তের মতো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মাথাতে ঢোকেনি। প্রাকৃতজনের সাধনা, মার্গ তাঁরা প্রাকৃতচর্চার মধ্যে গুরুমুখী বিদ্যা করবেন বলেই তো দেহসাধনার গুহ্য দোহাগুলি লিখেছিলেন, না কি? ঠিক একই পথে একই সামাজিক নিষ্পেষণের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়েই বাংলার বাউল-ফকিররা গুহ্য সাধনা বা দেহতত্ত্বের মধুস্রাবী সঙ্গীত রচনা করতে বাধ্যই হয়েছেন। বাধ্য এই কারণেই বললাম, সাধনায় রজঃ বা দেহের বর্জ্য পদার্থের ব্যবহারকে ভাববাদীরা তো চিরকালই, সর্বদা আক্রমণই করে এসেছেন। চুরাশি সিদ্ধ থেকে বাংলার তান্ত্রিক, ভৈরবী-ভৈরবী, বাউল-বাউলানি, ফকির-ফকিরানি, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা সেই আক্রমণেরই শিকার। আজও আখড়া পোড়ানো বাউল-ফকিরদের, তান্ত্রিকদের ডেরা ভেঙে দেওয়ার মতো ঘটনাগুলি দুই বাংলাতে ঘটেই চলেছে। তাই তান্ত্রিক কাব্যকথার পুঁথি ও রচনাকার সাধকেরা বরাবরই আক্রমণ, নিষ্পেষণের ভেতরে বসবাস করেই তাঁদের কাব্যকথাকে বহমান

রেখেছেন এটা মেনে নিতেই হয়। চুরাশি সিদ্ধদের এই দোহা-কবিতা রচনার পর বাংলা সাহিত্যের পুনরায় যাত্রা শুরু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অবলম্বন করেই। বারো শতক থেকে পনেরো শতক— বাঙালির লেখালেখির এই তিনশো বছর কিন্তু সহজ সাধনার ধারাক্রমেই স্পষ্ট। যার ভেতর পুরো মাত্রায় একটা তান্ত্রিক আচার বলবৎ রয়েছে। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, কালিকা, অন্নদাকে নিয়ে বাংলার কাব্যগাথা কিন্তু তন্ত্রের কবিতার আলোকায়নটিকে চিহ্নিত করেছে।

চার

কিছুদিন ধরেই পড়ছি বন্ধু সুমনের পাঠানো 'লোকগান ও লোকসংস্কৃতি' বইখানি। সুমন যখন চ্যাটে বা ফোনে আমার সঙ্গে আলাপ করে ওর কথা দিয়ে খালি গানের গন্ধ বের হয়। হাওড়াঞ্চলসহ দেশের নানা প্রান্ত ঘুরে ও সংগ্রহ করে লোকগান, লোকনাট্য, ঢপযাত্রা, পাঁচালির পাণ্ডুলিপি। ওর সংগ্রহে ভাটির গায়কদের অজস্র গান। ভাবি, চলে যাব সিলেটে, বন্ধুর কাছে, আমার যাওয়া হয় না। সুমন জানায়, বাংলাদেশে আমার এখানকার বইগুলি পাওয়ার কথা।

বলে, 'শুধু কী ঢাকা, বন্ধু। সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহে পর্যন্ত তোমার বই মেলে। 'ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গে তন্ত্র জিজ্ঞাসায়' বইখানি আমি কিনে কিনে না হলেও দশ জনকে উপহার দিয়েছি। তোমার এই বইটি ছাড়াও 'দেহসাধনায় যৌনতা' ও 'বাউল গানের কথকতা' বই দুটিও বাংলাদেশে খুব চলে।'

মোস্তাফিস কারিগর যখন বলে 'বাংলা বই ও তার প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত' বইটি ঢাকাতে পাওয়া যায়, আমার বুক ভরে যায়। মোস্তাফিস এখন ঢাকার মান্য প্রচ্ছদকার। বাংলাদেশে আমার বইটির কভার ওর-ই করা। ও কলকাতা এসে আমার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যায়।

বলে, 'লালনের আখড়া থেকে দশ মিনিট দূরে আমাদের বাড়ি, দাদা। আপনি লালন গবেষণার জন্য যতদিন ইচ্ছে আমার ওখানে থাকবেন।'

মোস্তাফিসের গা দিয়ে কুষ্টিয়ার সাঁইজির আখড়ার ফকির-সাধুদের ভাবের গন্ধ বের হয়। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে সেই ঘ্রাণ নিই। সে আমার কাছে রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর গল্প শুনতে চায়। বলে, 'আপনি, রমেন্দ্রকুমারে বাড়িতে বড় হয়েছেন, সেজন্য আপনাকে ঈর্ষা করি, দাদা।'

এতখানি রমেন্দ্রকুমার ভক্ত ও। 'কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী : কৌতুক ও গুহ্যতায়' বইখানি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার। স্বভাবতই ও বই ঢাকাতে মেলে না। মোস্তাফিস ধ্যানবিন্দু থেকে কিনে নিয়ে যায় ও বই। বলে, 'তন্ত্রের গুহ্যক্রিয়া

রমেন্দ্রকুমারের কবিতায় মিশে। আপনার বিশ্লেষণ না পড়ে ওঁর কবিতার সঠিক স্বাদ পাওয়া যাবে না।'

সুমন, মোস্তাফিসের ভালবাসা আমাকে জাগিয়ে রাখে। সিলেট-নদিয়ায় এত আলাপ চলে, আমার এখানকার বন্ধুদের সঙ্গেও এত কথা হয় না। সুমনের কাজে, লেখায়, গবেষণায় আমি মুগ্ধ। আমাদের ভৌগোলিক দূরত্বের এই বন্ধুত্বের পাশে আছেন ফকির লালন সাঁই— 'বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা পড়শি বসত করে।/ আমি একদিন না দেখিলাম তারে।' সিলেট আমার মাতামহেরও দেশ বটে।

সুমনকুমার দাশ লিখছেন :

> মধ্যযুগের অসংখ্য কবি মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ কাব্য রচনা করলেও বাংলাদেশের হাওড়াঞ্চলে বাইশকবি প্রণীত পদ্মপুরাণ কাব্য সর্বত্রই পঠিত হয়।...
>
> শৈশবে দেখেছি— বাড়ির উঠোনে কিংবা ঘরের দাওয়ায় বসে মা-জেঠি-কাকি-বৌদি- দাদিরা পদ্মপুরাণ পাঠ করতেন। তাঁদের আবেগঘন কণ্ঠে পদ্মপুরাণ পাঠ আমাকে চরমভাবে আকর্ষণ করত। চুপচাপ তাঁদের সঙ্গে বসে বসে শুনতাম। সেই ছোট বয়সেই মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল বাসর রাতে বেহুলার স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে সাপে কাটা, চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবে যাওয়া লক্ষ্মীন্দরকে 'জিও রে জিও রে কানাই মায়ের লক্ষ্মীন্দর' ধুয়ার সঙ্গে বাঁচানোর কাহিনি। প্যাঁচালির সুরে পঠিত হত পদ্মপুরাণ কাব্য।'

সুমনের মতো ছোটবেলার স্মৃতি আমার নেই। তবে লোকসংস্কৃতির শেকড় খুঁজতে গিয়ে গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে গ্রামের বউ-ঝিদের মনসার গান গাইতে দেখেছি। একে তাঁরা বলেন, ঝাঁপান। তা এই গোটা মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ কাব্য কিন্তু সহজ সাধনা বা তান্ত্রিক উপাচারে সমৃদ্ধ।

বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের ফুল্লশ্রীর বাসিন্দা বিজয় গুপ্ত লিখছেন 'পদ্মপুরাণ'-এ :

দুই হস্ত আগুসারি পদ্মা জপে ধ্যান।
বুকেহাত দিয়ে পদ্মা জপে মহাজ্ঞান॥
ধোপাঝির মহাজ্ঞান চারি যুগে জাগে।
খসিছিল লখাইর অস্থি সঞ্চে সঞ্চে লাগে॥

যার দ্বারা মালিন্য বা ময়লামাটি দূর হয় তাকেই বলে ধোপা। এখানে চিত্তের মালিন্য ও দূর করার কথা বলা হচ্ছে প্রকারান্তরে। বিজয় গুপ্ত চার যুগের উল্লেখ রেখেছেন এখানে। এটিকে চার প্রহর হিসেবেও দেখা যেতেই পারে। ষট্‌চক্রভেদ

বলে একটা কথা আছে তন্ত্রে। নাভিতে থাকে ব্রহ্মগ্রন্থি বা মণিপুর, হৃদয়ে বিষ্ণুগ্রন্থি বা অনাহত, ভ্রূমধ্যে রুদ্রগ্রন্থি বা আজ্ঞা চক্র। এই গ্রন্থিভেদের সাধনবার্তা চণ্ডীতে রয়েছে। সে কথা তো আগেই বলেছি। ত্রিচক্রে অবস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম হল গিয়ে ত্রিপুর। ত্রিপুরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী দুর্গা। এঁরই শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে শঙ্কর ত্রিপুর দগ্ধ করে ত্রিপুরারি নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। সাধকের শরীর এই শিবশক্তির, পুরুষ-প্রকৃতির সাধন ধারার দিকেই নাড়িচক্র নিয়ে ধাবিত। চুরাশি সিদ্ধর সাধকরা ত্রিপুরে নির্মাণকায়িক তিনটি স্থিতির কথা বলে থাকেন। বৌদ্ধ তন্ত্রে ব্রজসত্ত্ব ত্রিপুর জয় করেন। মহাজ্ঞান ছাড়া সিদ্ধাচার্যের এই সামরস্যের উজ্জীবন বোঝা কখনও সম্ভবই নয়। মনসামঙ্গলের কবিরা সেই মূর্ছিতা ত্রিপুরারিকে জাগ্রত করতে মনসার সহায়তা নিয়েছেন। তাই বিজয় গুপ্ত লিখছেন— 'পদ্মা অহংকার করে ধোপারির গুণে।/ উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়ে দেবগণ শোনে।।' মনসামঙ্গলের ধন্বন্তরি সাধক, মহাজ্ঞানী বলেই কবি লিখেছেন এবার, 'মহাজ্ঞান স্মরি বসিলেন ধন্বন্তরি। /কত গাছ ছিল জিয়াইয়া।' এর পরই নাড়িবিন্দুযোগের কথা বিজয় বলছেন, 'খড়্গ ভেদি উঠে গগন উপরে। /কামরূপা চন্দ্র সূর্য সমুদ্র ভিতরে।... দশমীদুয়ারে বাপু খসাও কপাট। আসুক পবনহংস ভ্রমুক সুবাট।।' চন্দ্র সূর্য হল সাধকের ইড়া-পিঙ্গলা নারী। বাউল চন্দ্র বলতে আবার বাঁ নাককে অভিহিত করে। চন্দ্র তাঁদের সাধন মাতাও বটে। সূর্য পিতা ও ডান নাক। মোদ্দা কথা নাড়ির খেলা শ্বাসবায়ু দিয়েই তো সম্পন্ন হয়। তাই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধক বলেন 'হাওয়ার খবর' জানার কথা। 'দশমীদ্বার' এখানে স্ত্রী-জননাঙ্গকেই স্পষ্ট করছে। যুগল দেহ সাধনায় নবদ্বার বলতে দুই কান, দুই নাক, দুই চোখ এবং মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ। দশ, ইন্দ্রিয় এখানে দুই ভাগে বিভক্ত। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়— চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক। পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়— বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। এই দেহগত বিদ্যা জানা না থাকলে তন্ত্রের কবিতা রচনা করা সম্ভব নয়। আসলে এগুলি তো সেই 'চণ্ডী মাহাত্ম্য'-র 'সাধন-সমর'। ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব অনুধাবন করেই তো চণ্ডী ব্যাখ্যার এহেন নামকরণ করছেন। মঙ্গলকাব্যের সমস্ত কবিরাই তান্ত্রিক সাধন মার্গ বা সহজ সাধন সম্পর্কে অবগত। শুধু মঙ্গলকাব্যই বা কেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' কবি এক্ষেত্রেই বা কম কী? গোটা কাব্য জুড়েই তো সেই 'সাধন-সমর' রচিত। চৈতন্য সমকালীন সময়েও যে গোটা নবদ্বীপ জুড়ে তান্ত্রিক আচার বলবৎ তা চৈতন্য-জীবনীকার বৃন্দাবন দাস বলে গেছেন,

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।

নানবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ-মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।।

বৈষ্ণব সাধক কবিদের লেখা যে বেদচারমূলক শাস্ত্র মান্যতার নয়, তা পুরো মাত্রায় বৈষ্ণব সহজ-সাধনার পুঁথি একথা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের দেহসাধনার পদগুলি থেকে অনুমিত।

ঠিক এইভাবে মঙ্গলকাব্য তথা শক্তপদাবলির ভেতর তান্ত্রিক দেহসাধনার নানা উপাচার রয়েছে। এইসব পড়তে বসলে সহজেই অনুমেয় কবিরা সকলেই দেহসাধনার গুহ্যচর্চাকারী। না হলে এমত সাংকেতিক শব্দসম্ভার রচনা কর কখনওই সম্ভবপর নয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মাণিক দত্ত লিখছেন, 'ভূত ভূত বলি তুমি বোল কার তরে।/ পঞ্চভূত দেখ তোমার শরীরে।।' জনপ্রিয় কবি মুকুন্দরাম লিখছেন, 'এ সব কপট বন্ধ সাপে দিলা মুখবন্ধ। /সাপ যেন রহে মহীলতা।' মানিক দত্তের পঞ্চভূত দেখা শরীরে আর মুকুন্দরামের খুল্লনার সেই বিষধর সর্প পরীক্ষার মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী বশীকরণেরই ইঙ্গিত কিন্তু একেবারেই স্পষ্ট। আবার সারদামঙ্গলের দ্বিজ মাধবাচার্য সিদ্ধাবস্তায় সেই তন্ত্রক্রিয়ার সরাসরি ছবিই এঁকেছেন।

তিনি লিখছেন :
নিবেদন করি সাজিতে জল ভরি।
চলিত জ্ঞাতি বরাবরে।।
সত্যার্থ তন্ত্রে স্থির হইল রন্ধ্রে।
একতিল মাত্র নাহি ঝরে।।

সতেরো-আঠারো শতকের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলও সেই চৈতন্য সমকালীন কবিদের তন্ত্র-উজ্জ্বলতারই শিকার। চৈতন্যোত্তর যুগের চণ্ডীমঙ্গলে রয়েছে আবার সরাসরি কায়া সাধনার ইঙ্গিত। ধর্মমঙ্গলগুলোতে চুরাশি সিদ্ধদের অনুসৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এই সব পুরাণ আশ্রিত কাব্যগাথায় যে তন্ত্রের অন্বেষণ করা হয়েছে তা কিন্তু ভারতীয় তন্ত্রবিদ্যার কৌলিন্যগাথার সম্পদ নয় কখনওই। এগুলো সবই বাংলার প্রাকৃতজনের তন্ত্রের জাদুবিশ্বাস ও জাদুনির্ভরতার লোকায়ত বেঁচে থাকারই গল্প। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক যতীন সরকার 'প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন' প্রসঙ্গে একটি মারাত্মক সত্যি কথা বলেছেন। যা পড়ে আমি অভিভূত। সুমনকে ধন্যবাদ এই সব বইপত্র খুঁজেপেতে আমাকে পাঠানোর জন্য। আর মোস্তফা

সেলিম ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সেই সব বোঝা ভরে ঢাকা থেকে আমার জন্য উড়িয়ে আনার জন্য।

যতীন সরকার লিখছেন :

> প্রাচীন ভারতের 'লোকায়ত' মত অনুসারেও 'বার্তা'ই ছিল একমাত্র বিদ্যা। এই 'বার্তা' শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে কৃষিকর্ম। এই কৃষিকর্মই প্রাক্-আধুনিক বাংলার প্রাকৃতজনেরও মূল উপজীবিকা বলে তাদের জীবনভাবনাজাত দর্শনও প্রাচীন লোকায়ত দর্শনেরই সগোত্র। এ দর্শন সমাজের উচ্চকোটিতে অবস্থিত ব্রাহ্মণবাদের দর্শন থেকে আলাদা। কারণ ব্রাহ্মণরা নিজেদের জন্য কৃষিকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মনুসংহিতাতে তো অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এই নিষেধ বিধির কথা উল্লেখিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরা উৎপাদন কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন মূলতই পরশ্রমজীবী। পরশ্রমজীবিদের দর্শন পরশ্রমজীবিদের দর্শন থেকে আলাদা না হয়েই পারে না। পরশ্রমজীবীরা বস্তুর চেয়ে ভাবকেই প্রধান করে তোলেন, তাঁদের দর্শন হয় মূলত ভাববাদ-আশ্রয়ী। আর পরিশ্রমজীবীরা জীবন সংগ্রামের সূত্রেই নিরেট বস্তুজগতের সঙ্গে সংযুক্ত বলে তাঁদের দর্শনে থাকে বস্তুবাদেরই প্রাধান্য।

চুরাশি সিদ্ধর কবিদের থেকে শুরু করে চৈতন্যোত্তর যুগের কাব্যগাথার কবিরা আদতে সকলেই শ্রী সরকার কথিত সেই 'পরিশ্রমজীবী'। তাই তাঁদের লেখার সারবস্তু তন্ত্রের সেই আদিম চক্র-বৃত্তি-মনের নিয়ন্ত্রিত যুগল বস্তুসাধনাতেই সামিল।

শিব-শক্তির যোগের ইশারা

ঘন অন্ধকারের ভেতর সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমার পা দুখানা কেউ যেন মাটির মধ্যে পুঁতে দিয়ে চলে গেছে। এতখানি অসাড় তারা। অথচ শরীরে বেশ স্পন্দন রয়েছে। কেন-না আমি টের পাচ্ছি কাশবনের ওধারে মানুষগুলোর কলরব। শেষ আশ্বিনের ছেঁড়াফাড়া কাশ এখন। তারই এলোমেলো ঝোপের আবডাল দু'হাতে সরিয়ে নিয়ে আমি অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি ওঁদের। চক্রাকার হয়ে বসে রয়েছেন ওঁরা। মাঝখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে। অদূরে গঙ্গার আঘাটার জোয়ার লাগার শব্দ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে ফুরফুরে নরম এক হাওয়া। যা আলোর শিখাকে মাঝেমধ্যেই বেঁকিয়েচুরিয়ে তুলছে খানিক। প্রখর অন্ধকারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার ভেতরও দেখা যায় অনেক। আমি সেই ধাতস্থ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার একেবারেই চোখ বরাবর দুই মানুষের পৃষ্ঠদেশ। তাঁরা পাশাপাশি বসে আছেন নারী ও পুরুষ। চক্রটা বোধহয় সেই আদলেই সাজানো। অন্ধকারের কারণেই পুরোটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠছে না। তবু আমি প্রাণপণ দেখতে চাইছি চক্রাকারে সারিবদ্ধ মানুষদের। আমার বাম চোখে যে মানুষটার অবয়ব এসে ধরা পড়ছে তাঁকে কিছু আগেই আমি দেখেছি আঘাটার নৌকোয় বসে থাকা অবস্থায়। লাল কাপড়, মাথায় জটা, ডান হাতের কবজিতে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো, দুই বাহুতেও মালা, দু'হাত ভর্তি পলায়, কপালে চওড়া সিঁদুরের টিপ, কাঁধে লাল কাপড়ের বোঁচকা, বাঁ হাতে সিঁদুরে রাঙানো ত্রিশূল, ডান হাতে চকচকে পেতলের কমণ্ডলু নিয়ে তিনি যেন মনে হল এই অন্ধকার ফুঁড়েই আমার সামনে দাঁড়ালেন। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ হতেই আমাকে তিনি বললেন, 'বাবা কমণ্ডলুটা একটু ভরে দাও দেখি। ওদিকে তো জবজবে কাদা'। এই বলে কমণ্ডলুটা তিনি গোলুইয়ের ভেতর ছুঁড়ে দিলেন। চারপাশের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল সেই শব্দে। একটা-দুটো শেয়ালও ডেকে উঠল সে সময়। আমি জল ভরতে থাকলাম নৌকোর ওপর বসে বসেই। ভকভক শব্দ

হতে থাকল আর জানি না কেন তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল অন্ধমুনির ছেলের কলসি ভরার কথা। ভাবতে লাগলাম আমি, এখুনি কি হরিণের জল খাওয়ার শব্দ মনে করলে দশরথের তির এসে বিঁধবে গায়ে। ভাবতে ভাবতেই ভৈরবীর ডাক, 'বাবা হল? দাঁড়িয়ে আছি যে আমি। জল ভরতে গিয়ে কোন অতলে পড়লে তুমি!' কণ্ঠস্বরে সাধারণ ভৈরবীদের মতো রুক্ষতা একেবারেই নেই। যথেষ্ট স্নেহময়ী সে ডাক। অনেকটা আমারই মায়ের মতো। কমণ্ডলুটা ভরে ভৈরবীর হাতে এগিয়ে দিতেই তিনি কাশবন ভেদ করে নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন। তার অনেক পরে আমি সেই আবডাল ভেঙে এখন সম্মোহিত দশায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ করেই কেউ এসে পেছন থেকে জাপটে ধরল আমায়। আমি সেই রুদ্রমূর্তি টের পেলাম আমার বাহুতে তার হাতের পেষণে। তার পরই সে আমার মুখটা চেপে ধরল। একেবারে দমবন্ধ আমার দশা। তার ভেতর দিয়েই আমি টের পাচ্ছি লোকটা উলঙ্গ। কেন-না তার শক্তিশালী পুরুষাঙ্গের ঝাপট তখন এসে জিন্সের প্যান্ট ভেদ করেও আমার নিতম্বে লাগছে। কিছুটা ছটফট করার পর লোকটা এক হাতেই আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে অপর হাতে মুখ চাপা অবস্থাতেই সরাসরি এনে বসিয়ে দিল চক্রের একেবারে মধ্যে। আমার সম্মুখে তখন প্রদীপটির শিখা খাঁপছে। শরীর জোড়া আমার ঘাম। কপালে তার বিজবিজ। সেখানে আমি একটু ধাতস্থ হওয়ার পর বুঝলাম যে চক্রমধ্যে জোড়ায় জোড়ায় সব ভৈরব-ভৈরবী বসে আছেন। জপ চলছে। সকলে নিমগ্ন তার ভেতর। আমার উপস্থিতিতে কারও কোন হেলদোল নেই। প্রায় আধঘণ্টা আমি এভাবেই বসে। প্রথমে আমার বুকটা ধুকধুক করছিল কিছুটা। একটা উদ্বেগ হচ্ছিল। তার পর আস্তে আস্তে সেই উদ্বেগ যে কখন কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। আর সেই ধুকপুকানিটাও তখন দেখি নেই। আমি যেন এখন চক্রাকারে আসনস্থ এইসব ভৈরব-ভৈরবীদের সামনে একেবারে সম্মোহিত। চোখ তুলে দেখি চারজোড়া ভৈরব-ভৈরবী বসে। জপমন্ত্রে কেবল তখন তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। আর যে আমাকে এখানে তুলে এনেছে সে চারধারে কেন, কাছেপিঠেও কোথাও নেই। এতক্ষণ পর আমি দেখলাম জপাবিষ্ট নারী-পুরুষ সকলেই পোশাকশূন্য। আরও অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর আমার সেই চেনা ভৈরবী মা চোখ খুললেন। ভৈরব তাঁর মন্ত্রাচ্ছন্ন। আমি দু'জনকে দেখলাম একবার। কোনও দেহকেই পোশাকহীন হলেও আমার বিসদৃশ মনে হল না একটুও। স্বাভাবিক মন্ত্রাচ্ছন্ন দেবদেবীর মতো মনে হতে থাকল তাঁদের।

ভৈরবী মা নৈঃশব্দ্য ভাঙলেন। বললেন, 'আমি জানতাম তুমি আসবে। ভয় পেয়ো না, এরা কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। তোমার শিবত্ব বিকাশে এরা সহায়ক হবে। তোমার চোখ বলছে তোমার ঐকান্তিক লক্ষ্য জানা, বোঝা। তা বাবা, জানতে বুঝতে হলে তো তোমায় বিন্দুধারণ করতে হবে। বসতে হবে বিন্দুসাধনায়।'

আমার কথার আড় ভাঙছে না দেখে মা বোধহয় হাঁক পাড়লেন কোনও এক নাম ধরে। কিন্তু আমার ভেতর তখন তোলপাড়, মাদকতা, সমাহিত দৌরাত্ম্যের মতো অবস্থা। তাই এত কাছে বসেও সে নাম আমি শুনতে পেলাম না।

কিছু পর দেখলাম সেই লোকটা হাতে করে এক রেকাবি নিয়ে এসে আমার সামনে রাখল। তার শরীরে এখন যেন সেই দেবত্বের ছোঁয়া আমি দেখতে পেলাম। রেকাবির পাশে বড়ো এক গ্লাস।

মা বললেন, 'নে বাবা খেয়ে নে এসব। ভয় নেই। ফল-মিষ্টি, মাছ-মাংস আছে ওতে। আর গ্লাসে রয়েছে কারণ। আগে তো তুই মদ খেয়েছিস বাপ আমার। আজ খা, দেখবি আর কোনওদিন কখনও মদ খেতে ইচ্ছে জাগবে না একেবারে তোর।'

ইতস্তত করছি আমি।

এবার চক্র ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন মা। সোজা এসে আমার সামনে বসলেন। তাঁর মমতাময়ী হাতের পরশ আমার মাথায় এসে লাগল। সন্দেশ ভেঙে একেবারে খাইযে দিলেন মা আমাকে। গ্লাস তুলে ধরে বললেন, 'মনে কর পার্বতী গণেশকে দুধ খাওয়াচ্ছে কিংবা তোর নিজের মা তোর মুখে তুলে দিচ্ছে দুধ। খা খা। কোনও মা কি ছেলেকে হাতে ধরে মদ খাওয়াতে পারে? এ মদ নয় রে। এ হল গিয়ে মদ ছাড়ানোর কারণ। যা খেলে আর কোনওদিন তোর মদ ছুঁতে ইচ্ছে জাগবে না। আমি তোর মদে মত্ততার ছোঁয়া দিতে চাই। সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকবি তুই নিজের নেশায়। তখন মদ কেন কোনও স্থূল নেশার আর তোর প্রয়োজন হবে না কখনও কোনওদিন।'

কারণ মুখে দেওয়ার পর আর কোনও অনুভূতিই ছিল না আমার। যখন তা হল দেখি ভোর হয়েছে। পাখি ডাকছে। আমি তখন মায়ের কোলে শুয়ে। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। গঙ্গা থেকে ভেজা ভেজা হাওয়া উঠে আসছে সামনে। তার ভেতরে আবারও আমার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ভৈরবী মায়ের স্নেহস্পর্শের ছোঁয়ায়।

ভৈরবী মা-র বাস যে গ্রামে এতক্ষণ তার নাম জানতে পারিনি। এবার জিগ্যেস করে জানলাম গাঁয়ের নাম কানসোনা। বললেন, 'এখান থেকেই বনগাঁ লাইনের বাস ধরলে পর তোকে পৌঁছে দেবে কানসোনা মোড়। সেখান থেকে একেবারে সিঁধে রাস্তা। ক্রোশ দুই হাঁটলেই হবে। গ্রামের একেবারে শেষ সীমায়। বললেই হবে ভৈরবীর আশ্রম যাব। যে কেউ তোকে দেখিয়ে দেবে।'

মনে মনে ভাবলাম : 'নগর বাহিরে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ।' তখন সবে যৌবনের হাওয়া লেগেছে শরীরে। তবে সেদিকে আমার হেলদোল নেই কোনও। ছুটে মরছি আমি শ্মশানে-শ্মশানে ভৈরবী-কৌতূহলে। প্রায় প্রায়ই বাড়ি থেকে সরে পড়তাম আর গিয়ে উঠতাম শ্মশানে নয়তো গ্রামের প্রান্তিক হাতায়। তারা তো কেউ শহরে থাকে না, থাকে গ্রামে। তাও একেবারে শেষ সীমানায়। আধা মফস্‌সলে তাদের বাসের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সাধারণত এরা নির্জন কোনও প্রান্ত খুঁজে নিয়ে বসবাস করে। এদের কাছে যেতে চাইলে গাঁয়ের মানুষের অনেক বেগ নিয়েই যেতে হয়।

প্রশ্ন শুনতে হয়, 'কী দরকার মায়ের কাছে? কোনও তাবিজ নেবেন কি, জলপড়া?' আমার বয়সজনিত কারণে আবার এই প্রশ্নও শুনতে হয়েছে প্রবৃদ্ধ গ্রামমোড়লের মুখে, 'মাইয়াডারে বশে আনতি চ্যাও নাহি দাদুভাই? যাও যাও মায়ের দোরে যাও। মা এ্যামুনি এক বশীকরণ অরস্ত দিয়ি দেবেন তোমায়, দেখবা ভাই ও ছুঁড়ি তখন কেবল তোমার প্যাছনে ঘুরঘুর করিতেছ্যে। এমনই মায়ের মন্তরের গুণ গো!' তবে যেতে বাধা দেয় না কেউই। দু'একজন অবশ্য সাবধান করে, 'ওরা সব কালাজাদু জানে। তুক করে। ক্ষ্যাতি করতে পারে। তাই সাবধান।'

তা এইসব বেগ সামলিয়ে ভৈরবীদের কাছে যাওয়া। সে যাওয়া অনেক সময় তো রণক্লান্ত হয়ে ওঠে। কেন-না পথ তো আর একটু-আধটু নয়। এসব জায়গায় বাসে বা ট্রেকারে চেপে না হয় কিছুটা যাওয়া হল। তার পর ধুধু পথে তো আর ভ্যানরিকশার বালাই নেই। গ্রামের মানুষ তো হাঁটতেই অভ্যস্ত। তাই পয়দলেই পৌঁছতে হয় ভৈরবীদের ডেরায়। আর সেখানে গেলে পর বাউল বা বৈষ্ণব বাড়ি বা আখড়ার মতো যে সাদর সম্ভাষণ মিলবে না একেবারে প্রথম প্রথম, এটা ভেবে নিয়ে বিকারহীন হয়েই যেতে হবে এদের কাছে। সহ্য করতে হবে কটু ও অশ্লীল ভাষণ। যেতে যেতে মুখরা ভৈরবীরাই তারপর এমন মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নেবে একসময় তখন এটা মনে হবে, ঘরের মায়ের সঙ্গে এইসব প্রান্তিক সাধিকাদের তফাতই বা কোথায়! যেটুকু যা বেশভূষার, মন্ত্র ও যন্ত্রবিদ্যার আচরণকলায়। একদল মানুষ সব সময়ই নানা জৈবিক তাড়নায় এদের কাছে যাতায়াত করে।

অবাধ যৌনজীবনের সুযোগ নিতে তারা ভৈরবীসঙ্গ পেতে আগ্রহী। এ তো আমার যেতে যেতে নিজের চোখে দেখা। এইসব মানুষদের চাহিদার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে এরা আসলে ভয়াবহ মুখরা হয়ে ওঠে। মুখই তাদের এইসব জাগতিক উৎপাত থেকে বাঁচার একমাত্র অস্ত্র বলে মনে হয়েছে। তবে ছেনাল ভৈরবীদের পাল্লায় আমি আবার পড়িনি তা তো নয়।

রোদের রং এখন ধরেছে। গতরাতে বিন্দুসাধনার রঙের দ্যুতি এখন এখানে নেই। আমি দেখছি গঙ্গায় স্নান সারছেন এক এক করে ভৈরব-ভৈরবী। দেখলাম গতরাতে আমাকে পাঁজাকোলে করে ভৈরবী-ডেরায় পৌঁছে দেওয়া সেই লোকটাও স্নান সেরে দৈনন্দিনতার মধ্যেই ঢুকে যাচ্ছে। কাঠকুটো জ্বেলে সে চা করছে। কিছু পর চা এল অ্যানামেলের এক তোবড়ানো ঘটি করে। মা টোপ খাওয়া একটা স্টিলের গ্লাস বের করলেন তাঁর সেই লাল বোঁচকা থেকে। লোকটাকে বললেন, 'নে ঘটি থেকে কিছুটা ঢেলে ছোকরাটাকে দে।' লোকটা একবার আড়েচোখে আমার দিকে তাকাল। তার পরনেও এখন লালের বাহার। গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতি মিলিয়ে গোটা চারেক মালা। হাতে গোটা দুই পলা। চুল রুক্ষ। তবে জট নেই কোনও। সে গ্লাসটিতে কিছুটা চা ঢেলে আমাকে বিরক্তি সহকারে ধরিয়ে দিল। ঘটিটা এবার মা-কে দিয়ে বলল, 'মা মনে হচ্ছে বড়োঘরের ঘর-পালানো মাল। হতে-গলায় সব সোনা পরা।'

আমি ভাবছি লোকটা এর মধ্যে দেখে নিল আঙুলে আমার সোনার আংটিটা আর গলায় মোটা মতো চেনটা। আংটিটা না হয় সে দেখতে পারে, কিন্তু গলার চেন দেখল কীভাবে। আমি তো আর খালি-গা হইনি। না কি রাতে ওঁরা আমাকেও পোশাকশূন্য করে রেখেছিল!

লোকটির কথাতে মা বেশ বিরক্ত হলেন। বললেন, 'ঘনশ্যাম তোর বিষয়ের লোভ এখনও গেল না। ছিঃ ছিঃ ছেলেটা কী ভাবল বল তো! তুই না সাধু হবি বলে এ পথে এসেছিলি! হল তো বছর দুয়েক। আর কবে পাশমুক্ত হবি তুই!' এই বলে মা এবার শ্লোক উচ্চারণ করলেন। বললেন, 'পাসবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ, পাশমুক্তঃ, সদা শিবঃ। পাশ মুক্ত না হলে কিছুই হবে না। পাশ না গেলে সাধন বৃথা, স্বরূপ বৃথা। কী হবে তোর লাল পরে?'

মা এবার চায়ের ঘটিটা কিছুটা জল খাওয়ার মতো করে গলায় ঢাললেন। আর এই ফাঁকে দেখলাম লোকটা গুটি গুটি সরে পড়ছে। রাতে যাকে চক্রমধ্যে দেখে আমার দেবতা মনে হয়েছিল, সকালে বুঝলাম সে আসলে লোভাতুর মানুষ বই আর কিছুই নয়। কাম আর মদের নেশাতেই এ পথে ভিড়েছে।

আবার কিছুটা চা গলায় ঢাললেন মা। আমিও গ্লাসে চুমুক দিলাম এই বার। দিয়ে বুঝলাম চায়ের চায়েত্ব অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেজন্যই মা অনায়াসে গলায় ঢেলে নিতে পারছেন।

এবার পুরোটা গলায় ঢেলে নিয়ে ঘটিটা পাশে সরিয়ে রাখলেন মা। আমায় বললেন, 'বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না বুঝি? মনে হয় কে যেন তোকে তাড়িয়ে বেড়ায়? স্থির হতে দেয় না রে?'

চুপ আমি।

বললেন, 'এই তাড়নাকেই বুঝতে হবে তোর।'

বললাম, 'কীভাবে বুঝব আমি?'

— এই তো জিজ্ঞাসুর মতো কথা। এই জিজ্ঞাসার নিরসন হবে সাধনে। জগৎটাকে কী মনে হয় তোর?

— যতদূর ভাবি আমি, এ তো ব্যালেন্স বই আর কিছু নয় মা।

— বুঝলি জগৎ হল গিয়ে প্রকৃতির কর্তৃত্ব। প্রকৃতি হলেন মা। আমাদের আরাধ্য কালী। কালী কী জানিস?

— কী?

— কালী হল গিয়ে তোর ভাবনার সেই ব্যালেন্স রে। আশ্চর্য সমতা হল কালী। ও কি আর মূর্তি রে। তোর মনে প্রশ্ন আসে না শিব কেন ওর পায়ের নীচে ম্যাদা মেরে পড়ে আছে?

— শিব তো এখানে অকর্তা সেজেছেন। শক্তিকে জাগিয়ে তুলে বলতে চাইছেন জগৎ শক্তিময়।

— একেবারে ঠিক বললি তুই। তোর অনুভূতি আছে, অনুধাবন আছে। ওই যে তুই বললি না জগৎ শক্তিময়, সেই জগৎকে শরীরের রূপ দিতে হবে। আমাদের শরীর অর্ধনারীশ্বর। হিজড়া। ওদের দেখে আমরা মশকরা করি, কিন্তু এটা বুঝি না ওরা হল সাক্ষাৎ জগৎ। বয়স্করা দেখবি এখনও বলেন, ওদের আশীর্বাদ নিতে হয়। শিশুকালে ওদের ওই যে নাচিয়ে দেওয়া; শিশু কোলে তুলে ওরা নাচায় এটা কী মনে হয় তোর?

— সে তো সংস্কার!

— কে বলল তোকে সংস্কার! ওরা জগৎ নাচায় রে! তোর শরীরের দুই সত্তাকে নাচিয়ে দেয়। যাদের সেই নাচ লাগে ঠিকঠাক শরীরে তারা জগৎ খোঁজে। সৃষ্টিধারে ঘুরে মরে। তুই যেমন মরছিস।

বললাম 'আমি তো মা কৌতূহল নিয়ে, জানবার আগ্রহ নিয়ে, আকর্ষণ নিয়ে এখানে এসেছি।'

কিছুটা সমাহিত হয়ে গেলেন মা। চুপ। সাড় নেই শরীরে। মায়ের ভৈরব এখন এসে বসেছেন পাশে। তাঁর মুখে কেমন যেন এক সম্বন্ধবোধের আলো। তিনি যেন এদিকের ঘটনা-পরম্পরাটা ধরতে পেরেছেন।

মায়ের সেই সমাহিত দশার মধ্যেই তিনি আমায় বললেন, 'তোর অস্তিত্বে নাড়া লেগেছে বাপ। না হলে এদিকে টান কেন রে তোর? তোর বয়সি সৃষ্টির সমগ্রতা শুনতে এসেছে এ যে স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।'

— এর কারণ আমি ঠিক জানি না বাবা। তবে শ্মশান, অন্ধকার, নির্জনতা এই সব আমার ভালো লাগে। সন্ধেবেলা এদিকে এলে মনে হয় সন্ধ্যার ভেতর কীরকম এক গভীর বেদনাবোধ আছে।

চোখ খুললেন মা। ভৈরবের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর চাহনিকে আমার মনে হল আনন্দবোধের আলো। আমার দিকে এবার সরাসরি তাঁর চোখ। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে অন্ত নেই এই বৈভবের।

স্বাভাবিকতার থেকেও গলা নামিয়ে এনে বললেন, 'তোর মধ্যে মহামিলন হচ্ছে।'

বললাম, 'ঠিক বুঝলাম না আমি।'

— বিশ্বরচনা কে করেক জানিস? আমরা নিজেরা বিশ্বরচনা করি। তোর মধ্যেকার যে পুরু, সে হল গিয়ে চৈতন্যশক্তি। তা জেগে গেছে বলেই তুই খুঁজছিস। কিন্তু আধার পাচ্ছিস না। এটা বুঝতে হবে তোকে এখন, এই চৈতন্যশক্তি একা কিছুই করতে পারে না। তার দোসর লাগে। শক্তি।

— আপনি কি প্রকৃতি-পুরুষ যোগের কথা বলছেন?

— দাঁড়া। তাড়াতাড়ি সমাধানে যাস না। প্রকৃতি-পুরুষ পরম্পরাসাপেক্ষ। কিন্তু কর্তৃত্ব করে প্রকৃতি। জগৎ তাই হল গিয়ে প্রকৃতি। কালীমূর্তি হল সেই প্রকৃতির পূর্ণ রূপ, বুঝলি।

বললাম, 'শিবের নিষ্ক্রিয়তাকে আপনি চৈতন্যশক্তি ক্রিয়াধার বলছেন?'

ভৈরব বললেন, 'মা ওকে এইসব বলে আরও কেন ছুটিয়ে মারবে? তুমি সমাধান দাও। ঘরের ছেলে ঘরে যাক। যা বাবা, ওঠ ওঠ। আর থাকিসনি এখানে।

ভৈরবীর অভিব্যক্তিতে এবার বিরক্তি ধরা পড়ল যেন। তিনি ভৈরবকে হাতের ইশারায় থামবার নির্দেশ দিলেন। নিজেও দেখছি আর কথা বলছেন না। ইতিমধ্যে

পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ খবর পেয়ে গেছেন শ্মশানে তান্ত্রিকদের সমাগম ঘটেছে। দু'চারজন এসে বসেছেন বোধহয় কিছু টোটকার আশায়।

মা বললেন, 'ঘনশ্যাম করণরিয়ার যা যা প্রসাদ আছে গতরাতের সব এঁদের হাতে দিয়ে দিও। যান বাবা-মায়ের ওজিকে, প্রসাদ নেন, ওধারে কয়েকজন আছেন, তাঁরা আপনাদের সংসার-সমস্যার দাওয়াই দেবেন।'

ভৈরব-ভৈরবীকে প্রণাম সেরে তাঁরা ওদিকে চলে গেলেন। সিকি-আধুলি কিছু পড়ে রইল ওদের সামনে।

আর দিকে এবার চোখ তুললেন ভৈরবী।

বললেন, 'তোর শরীরে পুরুষযোগ চলছে বাবা। ওকে শক্তিমত্ততায় জাগ্রত করতে হবে। কেউ পারবে না বাবা। অম্বিকা ভৈরবী ও ত্রিকালেশ্বর ভৈরবেরও সে ক্ষমতা নেই। নিজের পুরুষে তোর নিজের শক্তি দিতে হবে। সবাই আমরা অর্ধনারীশ্বর। তুই বাবা নিজের পুরুষকে শিবের মতন শুইয়ে দিয়ে নিজের ভেতরকার শক্তিকে কালীর মতো দাঁড় করিয়ে দে। চেষ্টা কর, ঘুরে মর। পথ পেয়ে যাবি তুই। দিশেহারা হলে কানাসোনা আসিস। অমাবস্যার আগে-পরে বাদ দিয়ে যাবি তবে দেখা পাবি আমাদের। আজ আমাদের সময় হল। উঠতে হবে।'

বললাম, 'কালকে রাতের...'

বলতে দিলেন না আমাকে ত্রিকালেশ্বর ভৈরব।

বললেন, 'রাতের ক্রিয়া নিয়ে জিজ্ঞাসা জমা হয়ে আছে? জানতে চাস?'

আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম।

অম্বিকা ভৈরবী বললেন, 'প্রকৃতি-পুরুষ যোগ চলছিল কাল। নিজের ভেতর তা প্রথমে না এলে তা যে দেখা যায় না বোঝা যায় না। যে জন্য কাল তোকে দেখতে দেওয়া হয়নি। কারণ দিয়ে মেরে রেখেছিলাম আমি। আগে শরীর তৈরি কর। শ্বাসে-দমে বীর্যের গতিবিধিকে স্থির কর। না হলে বিন্দুসাধনা ধরবি কী করে শুনি?'

উঠে পড়লেন মা এবার। বোঁচকা কাঁধে নিয়ে হাঁক দিলেন, 'ঘনশ্যাম...'

ত্রিকালেশ্বর ভৈরব আমাকে বললেন, 'হস্তমৈথুন করিস?'

চুপ আমি।

— নিশ্চয়ই করিস। কামের হিল্লোল এখন তোর শরীরে। কামকে স্থিতি দেওয়ার নাম বিন্দুসাধনা। নারী-পুরুষের রজ-বীর্যকে নিজের মধ্যে ধরে প্রণবের সঙ্গে অভেদ হওয়া হল গিয়ে সাধনা। ঘোর-ফের, সন্ধান কর। বুঝে যাবি একদিন।

শাস্ত্র পড়। ওতে সব পাবি। তার পর আয়। ধরতে সুবিধে হবে। তখন তোকে আর মদে মেরে রাখা হবে না। পাঁচ ম-কেই আত্মস্থ করতে পারবি তুই তখন।

— পঞ্চ ম-কার?

— হ্যাঁ বাপ। তন্ত্রের মূলতত্ত্ব তো তাই। জেনে-বুঝে আয়, সাধনদরজা হাট করে তখন খুলে দেবে তোর মা। চিন্তা কী বাপ? তুই অম্বিকা মায়ের স্নেহ পেয়েছিস। মা তোকে আজ নতুন জীবন দিয় গেল। তার নিবিড়ে ঢুকে যা। তখন দেখবি প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের হুহু হুহু আনন্দ। সেই আনন্দকে জড়িয়ে ধর তুই। সংসার-সমাজ-অভ্যাসের বাইরে এই জীবনাচরণ তোর প্রিয় হোক। আমি তোকে বা আশীর্বাদ করি।

বাবা তাঁর প্রকৃতি-আক্রান্ত হাত আমার মাথায় বোধহয় সেইদিনই রেখেছিলেন আর মা পুরুষের জ্ঞেয় অজ্ঞেয় সৃষ্টি বিনাশ জন্ম ইত্যাদি উপচার আমাকে অর্পণ নিশ্চয়ই করেছিলেন না হলে সেই জীবনাচরণে প্রতি ঝোঁক ও রহস্য কোনওটাই কেন গেল না এই পথে দশ-দশটি বছর পার করে ফেলেও। কোনও অমেয় শক্তিই কি এই দুইজন সাধক-সাধিকা আমাকে সেদিন দিয়েছিলেন, না কি এসব সবই আমার নিজস্ব বিদ্যুৎ, ভাবি দেখা হলে ওঁদের জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এত পথ হেঁটে কোনওদিনই আমি আর ওঁদের সন্ধান পাইনি। কানসোনা ছেড়ে গিয়ে ওঁরা যে কোথায় গিয়ে উঠলেন সে খবর গ্রামবাসীরা আমাকে দিতে পারেননি।

শুরু হয়ে গেল আমার এক নতুন জীবন। আনন্দ, নৈঃসঙ্গ, শান্তি, ব্যথা, খুশি, ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, জ্যোৎস্না, অন্ধকারের ভেতর পথ চলা। নদীপাড়ের বর্ষা-বাতাসের দাপট বাঁচিয়ে নদী-মা যেমন করে তার পাড়ের দীপ জ্বেলে রাখে তেমন করেই আমি পথের দীপককে এক ঝলক রোদ, একখণ্ড অন্ধকার, এক ঢেউ নদীমন, এক টুকরো আনন্দময় দুঃখ দিয়ে লোকায়ত সাধনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে দেখতে গিয়ে দেখি স্মৃতিগুলো সব আশ্রয় নিয়েছে নানা ঘটনার আকরে। তারই বিশেষ কিছু গল্পে যাঁদের চোখ বুজে দেখতে পাই, রক্তমাংসময়তার কারণেই তাঁরা কেউ প্রণম্য, শ্রদ্ধেয়, নমস্কারযোগ্য, পূজনীয়, কেউ-বা ধুরন্ধর অসৎ, মাতাল, লম্পট, সমকামী। সকলেই আসলে মানুষের এক একটি রূপ। আমার নতুন জীবনের আয়ু-সীমার এক একটি অধ্যায়।

সেবার গিয়েছি ঝড়খালিতে। মাতলা তীরবর্তী শান্ত সবুজ গ্রাম। সন্ধ্যা সমাসন্ন। তার ভেতর দিয়ে হাঁটছি আমরা। আমি আর তারণভোলা। তিনিই আমাকে নিয়ে আসছেন তাঁর গুরুপাটে। ছোটো কুঁড়েবাড়িতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলছে তুলসীতলায়। শাঁখের ফুঁও শোনা যাচ্ছে। এমনই ঐশ্বরিক পরিবেশের ভিতর দিয়ে আমরা

চলেছি। আল ভাঙছি। তখনও এ গ্রামে আয়লার ধ্বংসলীলা জাগেনি। যেতে যেতেই আমার মনে পড়ছে, 'একলা পথের চলা আমার একেলার চলা। আর কম পথ তো নয়। জয়নগর নেমে প্রথমে ট্রেকারে এলাম নিমপীঠ। সেখান থেকে বাসে জামতলা। তার পর মোটরভ্যানে পাক্কা এক ঘন্টায় কৈখালি। কৈখালি থেকে মাতলা পেরোলাম। এসে পৌছলাম ঝড়খালি। নদীঘাট থেকে ঝাড়া মাইলটাক হাঁটা। যখন পৌছলাম গুরুপাট দেখি ভৈরবী মা দুয়ারে চাটাই বিছোচ্ছেন। দাওয়াতে টিমটিম করে জ্বলছে প্রদীপ। এ গাঁয়ে বিদ্যুৎ নেই। খুঁটি পোঁতা হয়েছে সবে। যেতে যেতে তারণভোলা বললেন, 'বুঝলেন, কারেন্ট না থাকলেও আপনের অসুবিধে হবে না কিছু। মাতলার ধারঘেঁষা আমাদের গুরুপাট। রাতে নদীর হাওয়ায় দেখবেন একেবারে শীত ধরে গেছে। কাঁথা-টাথা গায়ে লাগবে তখন।' হাঁটতে হাঁটতে ঘামছি আমি । ভরা ভাদ্রে বর্ষার ছোঁয়াচ লেগে গ্রাম টলমল করছে। পথে মাঝে মাঝেই খানাখন্দ। থক থক করছে সেখানে কাদা। ভালোভাবে শুকিয়ে উঠতে পারেনি। নদীর বুকে অন্ধকার নামে তাড়াতাড়ি। তাই সন্ধ্যেবেলাটাকেই মনে হচ্ছে ঘুটঘুটে রাত। তার ওপর আবার সামনে অমাবস্যা গিয়েছে। তার রেশ এখনও লেগে। প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি। এই অন্ধকারে তারণভোলাই আমার পথপ্রদর্শক। তাঁর পিছু পিছু চলেছি ঠিকই তবু খানাখন্দ মাঝে মাঝে আমাকেই অতিথির মতো আপ্যায়ন করছে। কাদা মাকামাখি করে গুরুপাটে এসে দাঁড়ালাম আমরা। বাঁশের কঞ্চির গেটটি খোলা মাত্রই ভৈরবী ধরতে পারলেন আমাদের আগমন। প্রদীপখানি নিয়ে দাওয়া থেকে নেমে এলেন উঠোনে।

বললেন, 'কে গা?'

— মা আমি তারণ।

— আয় ছেলে আয়। আমি ভাবছি সেই থেকে শান্তিপুর উজিয়ে আসতে না জানি তোর কত সময় লাগবে। তার ওপর আবার সঙ্গে অতিথি। মান্যি মানুষ।

ভৈরবী মা-র গলা চিরচেনা গ্রামিকার মতো। আচরণও তাই। বেশ পৃথুল শরীর। অল্পালোয় তাঁর ছায়া উঠোনে নাচানাচি করছে কিছুটা গাছগাছালির বাতাস পেয়ে।

আমরা এসে দাঁড়ালাম দাওয়ার ধারে। আমার দিকে এগিয়ে এলেন মা। হাতে তাঁর জলের ঘটি।

বললেন, 'নাও বাবা, পা দুটো ধুয়ে নাও। আমি জল দি তোমার পায়ে।'

বললাম, 'না না আপনি রাখুন। আমি নিজেই ধুয়ে নিচ্ছি। অসুবিধে হবে না।'

— শোনো কতা। তারণ আর তুমি আলাদা না কি বাবা। ছেলেরা এল সব কালান্ত হয়ে। মা তাদের জিরোনোর ব্যবস্থা করবে না।

হাত-পা ধোওয়ার পর আমরা এখন চাটাইয়ের ওপর বসে। মা দাওয়ার এক কোণে উনুন ধরিয়েছেন কাঠকুটো জ্বেলে। লোহার ছোটো এক কড়াইয়ে জল চাপিয়েছেন। বুঝলাম চা হচ্ছে।

চা করতে করতেই মা বলতে থাকলেন, 'তারণ রে তোর চিঠি বেশ সময় নিয়েই এসে পৌঁছেছিল বলে সব ব্যবস্থাই করতে পেরেছেন তিনি।'

— বাবা কি বেরিয়েছেন না কি?

— হ্যাঁ রে গেছে ইস্কুলপাড়া। শিষ্যবাড়ি। একটা হ্যাজাক জোগাড় করতে। এই যমের আলোতে তত্ত্বকথা, ধর্মকথা কিছু হয় নাকি? তার ওপর তুই লেখেছিস ছেলে আমার সাধনার কথা শুনতে চায়। সেসব কতি গেলে তো পুঁথিপত্তরের সাক্ষ্য লাগে তো। গোপন ক্রিয়ার আড়াল ভাঙা অত সহজ।

ভাঙা হাতলের কাপে চা এসেছে সবে। সঙ্গে একবাটি মুড়ি। মুখ দিতে দিতেই দেখলাম ভৈরব আসছেন যেন দশদিক আলোকিত করে। হ্যাজাকের আলো এই দাওয়ায় এসে পর্যন্ত পড়ছে।

এসেই ভৈরব হাঁক পাড়লেন।

— তারণ রে সব ব্যবস্থা নিয়েই এলাম রে। দ্যাখ চাল-ডাল, আলু-মূলো সব বাঁধাছাদা করে দিয়েছে ওরা। নে রান্নার জায়গায় আলগোছ করে রাখ।

বোঁচকা সব একে একে নামাতে লাগলেন তারণভোলা।

দাওয়ায় উঠে এলেন ভৈরব। সঙ্গে জনা তিনেক অনুচর। সহাস্য, একটা টকটকে লাল কাপড় পরে আছেন, গা খালি, সাদা দাড়ি, গলায় ডজন খানিক মালা— সব রুদ্রাক্ষ নয়, নানা কিছুর, কপালজোড়া জবজবে সিঁদুর, বললেন, 'আপনার আসার খবর পেয়েছি পথে। চা খান। তেমন কিছু জুটবে না এখানে। এই খানিকটা মুড়ি, লাল চা, রাতে চাল-ডালে সেদ্ধ।'

বললাম, 'ব্যস্ত হবেন না। আমি এখানে তো আসলে জানতে-বুঝতেই এসেছি। অনেকেই আমাকে বলেছেন বিন্দুসাধনায় চরম সুখের কথা। সবিস্তারে কেউই বলেননি সেভাবে। ভাসা ভাসা।'

— আর ভাসা ভাসা শুনেই আপনি ভাবলেন সব হল গিয়ে বহুদিন ধরে চলে আসা ব্যভিচার। তারণ তো আমাকে চিঠিতে জানিয়েছে আপনার মত।

— অনেকটা তো তাই-ই। স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর করেন আপনারা আবার ঘরণীকে মা বলেন। যুক্তি সাজান আরোপিত ভাবের। বলেন আপনারা, কামিনীর দুই রূপ দুই ভাব। এক ভাবে সৃষ্টি মানে তো সেই সম্ভোগই আর

অপর ভাবে সেই সম্ভোগকেই আত্মস্বাদ করে নেওয়ার পর সেই শরীরকেই মাতৃজ্ঞানে প্রতিপন্ন করা।

—সংসারও তো তাই করে। নারীর স্তন যখন স্বামী ছোঁয় তখন তার কামিনীর অনুভূতি আর দুধের সন্তান ছুঁলে জননীর অনুভূতি।

— আপনারা তো আর সংসারী নন। তাহলে সংসার টানা কেন? মায়ের স্তন যদি বয়ঃসন্ধির ছেলে ছোঁয় তখনও কি মা বা ছেলের স্বভাবেরই অনুভূতি আসবে বলে মনে হয় আপনার?

— তা নয়, আপনাদের সমাজে মা-ছেলের সম্ভোগের চিত্র তো অজানা নয়। মা ধর্ষিতা হয়েছেন আবার ছেলের কাছে এ নজিরও তো আছে।

বললাম, 'আবার মা-ছেলে স্বইচ্ছায় যৌনজীবন যাপন করছেন এই নজিরও যে ব্যতিক্রম হলেও সত্য। স্বামীর মৃত্যুর পর যুবতী স্ত্রীর সম্ভোগাচারে যুবক ছেলের আগমন ঘটছে— এ তথ্যও তো এখন বাইরে আসছে।'

— ওসব আপনাদের সমাজে হয়।

— আর আপনাদের সমাজে? মায়ের বুক ডলে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছেন একই বয়সি ছেলে সেখানে কি সমাজের এইসব ব্যতিক্রমী ঘটনার ছায়া পড়ছে না?

— এইখানেই আপনার বোঝার ভুল হচ্ছে খুব। স্থূল এই দৃশ্য আপনাকে বুঝতে হলে সূক্ষ্মস্তরে যেতে হবে। সমাজের স্থূলতা স্থূলতাই। কামানন্দ কামানন্দই। কিন্তু এখানে কামানন্দ আসলে পরমানন্দ। এই পরমানন্দ বুঝতে হলে আমাদের সাধনার পাঁচটি ম-কে আগে আপনাকে অনুধাবন করতে হবে।

— মদ, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনের স্থূলতা থেকে যে সূক্ষ্মতায় চলে যাওয়ার কথা আপনারা বলেন তা কি আদতে হয়?

— হয়। অবশ্যই হয়। তবে এটা বলতে পারেন সেই হয়-কে লয় করে দেন সবাই। লয়-কে হয় করতে পারেন কেবল গুটিকতক সাধক। আর লয় হয় হয় যোগ্য আধারের গুণে। ভৈরবীর গুণে। সাধকপুরুষ স্বভাব-প্রকৃতি না হতে পারলে সাধিকা ভাব-প্রকৃতি কীভাবে হবেন শুনি? দুই আত্মাকে অভিন্ন হতে হবে যে বিন্দু ধরতে গেলে। প্রকৃতি-পুরুষ যোগ কি বিছানায় শুয়ে উপভোগের নাকি?

— তাহলে বলছেন সেখানে উপভোগ নেই? আনন্দ নেই?

— আছে তো। সে আনন্দ আপনার মতের যৌনানন্দ নয়। সে আনন্দ মহানন্দ। যে তাতে মেতেছে সেই-ই কেবল এর মহিমা ধরতে পারবে। অন্য কেউই নয়।

বললাম, 'তা বেশ। সেই মহিমার কার্যকারণ যতটা বলা যায় সেটুকুই না হয় বলুন আমায়।'

— বলব বলেই তো এই আয়োজন সেরেছি। যতটা সম্ভব বোঝাবও। পারলে আপনাকে ভাসা ভাসা যুগল-আসনও দেখাব আমরা। শব্দকে তো শাস্ত্র বলছে ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম দিয়ে তত্ত্বকথা শোনাব, যদি পারা যায় হাতে কলমে দেখাব, তাহলেই তো সেই তত্ত্ব দিয়ে আপনি বই লিখতে পারবেন। না হলে তো সব সাধনকার্যটাই আপনার বোঝা ব্যভিচারে দিকে চলে যাবে। আমি থাকতে তা হতে দেই কী করে। সুশীল খ্যাপার শিষ্য আমি। জ্যান্ত শিব তিনি। বলতেন আমায়, আমার সুনাম তোর হাতে। তন্ত্র রক্ষা করতে হবে। শাস্ত্রটার ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। সাধনটা শেষ করে দিতে চাইছে কিছু ভেকের দল। আর তাদের পাল্লায় পড়ছেন আপনাদের মতো কৌতূহলী মানুষ। দোষ আপনাদের ন। ওদের ওখানে যা দেখছেন তাই-ই উঠে আসছে বইয়ের পাতায়। আর সে-সব পড়েই পাঠক ভাবছেন তান্ত্রিক মানেই ব্যাভিচারীর দল সব।

রান্না চড়ছে। দাওয়ায় বসেই দেখতে পাচ্ছি উঠোনের এককোণে উনুনের ওপর চাপানো রয়েছে মস্ত লোহার কড়াই। একত্রে ডাল-চাল ফুটছে। তারণভোলা হাতে হাতে মায়ের সঙ্গে কাজ সারছেন। পাতা হয়েছে শিলনোড়া। বাটা-বাটির কাজে গ্রামেরই বোধহয় এক মহিলা এসে মা-কে সাহায্য করছেন। আরও দু'জন বাবার সঙ্গে এসে জোটা অনুচর ডুমো ডুমো করে কুমড়ো-আলু কেটে ধোওয়াপাকলিতে ব্যস্ত। বুঝতে পারছি জুতসই এক ভোজনের ব্যবস্থা চলছে। ম ম করে গন্ধ উঠছে খিচুড়ির। এক অনুচর আমার থেকে কিছু আলগা হয়ে বসে নারকোলের চিউলি খুললেন। বোধহয় সব উপকরণ গিয়ে শেষে খিচুড়ির মধ্যে পড়বে। ভৈরবী মা মস্ত খুন্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ধোঁয়া উঠছে ভক ভক করে। আমি এখান থেকে বসেই সরাসরি দেখতে পাচ্ছি ভৈরবীর মুখ খিচুড়ি ফোটার ধোঁয়া ও হ্যাজাকের আলোয় শ্রীমতীর মহিমাকে ধরে রাখতে পারছে না কিছুতেই। সে মুখের ভাষা গহন। সংসারী রমণীর মাধ্যাকর্ষণ সত্যিই সেখানে যেন কোনওভাবেই লেগে নেই। তাঁর কপালের সিঁদুরে, হাতভর্তি পলায়, গলার রুদ্রাক্ষে, আটপৌরে করে পরা পাড়হীন লাল শাড়িতে আমি দেখছি সংসার কোনওভাবে লেগে নেই। সেই মুখ সংসারের অন্ন, বস্ত্র, আয়ুর বাইরে দাঁড়ানো যেন। বোধহয় সে মুখে রয়েছে প্রাণের রচনাই সমর্পণের উদ্দেশ্যে।

ছেঁড়াফাটা কিছু বইপত্র নিয়ে এসে আবারও সেই দাওয়ায় এসে বসলেন ভৈরব। বললেন, 'শাস্ত্র-প্রমাণ কিছু দেখাই আপনাকে।'

বললাম, 'আপনারা কোন স্তরের তান্ত্রিক সেটাই তো জানা হয়নি আমার।'

বিস্মিত হলেন বাবা। বললেন, 'কেন, তারণ কিছু বলেনি আপনাকে?'

—না সে-সব আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আসলে শ্মশানের এক ক্রিয়ানুষ্ঠানে ওঁর সঙ্গে আলাপ। ওঁর মুখে আপনার নাম শুনেই আসতে ইচ্ছে হল আমার।

—সে কী। শুধু নাম শুনে সটান চলে আসার লোক তো আপনি নন। জেনে বুঝেই এসেছেন নিশ্চয়ই। তারণ সহজ সরল আলাভোলা। ওর কথাতে আপনি এতদূরে ছুটে আসবেন বলে মনে তো হয় না।

আমি বেশ বুঝতে পারছি স্বরূপানন্দ গিরি সাধনার মহাসংগীত কিছুটা হলেও তাঁর বসনে বেঁধে নিতে পেরেছেন। না হলে আমার মনের আলো-বাতাসের হদিশ তিনি সেভাবে পেতেন না। এবং তাঁর ভৈরবীও নিতান্তই অভাগা ভৈরবী মূর্তি কখনও নন। আর তিনি নিজেও অভাগ্যের হাহাকারে চাপা পড়া ভেকধারী নন। কেন-না তার গুরুপাটের দর আছে। বসিরহাটে বাবার যথেষ্ট নামডাক। তার্কিক পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন আর তাঁরই সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য স্বরূপানন্দ গিরি। যতদূর শুনেছি বহুবার চক্রমধ্যে বসেছেন তিনি সুশীল খ্যাপার সঙ্গে। সেখানে পৃথুলা এই নারীই না কি বীর্যধারণে সহায়ক হতে পেরেছেন। সুশীল খ্যাপা অনেক শ্রম দিয়ে একে না কি তৈরি করেছিলেন যাতে প্রিয় শিষ্যসাধকের বীর্যস্খলন আর না ঘটে বিন্দুসাধনায়। কেন-না বার দুই তিনি না কি ডাহা ফেল। ভৈরবী দম-শ্বাসে তাঁকে ঠিকমতো সহায়তা করতে পারেননি বলেই তিনি তখন দু-দু'বার কোনওভাবে উতরাতে পারেননি। প্রথমে তা সুশীল খ্যাপা খুব বকাঝকা করলেন শিষ্যকে তার পর নিজেই বুঝতে পারলেন সমতা নেই দুই শরীরের শ্বাসে, তাই স্বরূপানন্দের বীর্য কিছুতেই না কি উঠছে না মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে। সঙ্গিনীর যোনিতেই সব একাকার হয়ে যাচ্ছে বারবার।

সবই আমার শোনা কথা। যোগমায়া ভৈরবী আমাকে জানিয়েছিলেন এসব কথা। সেও এক দিন, যেদিন আমার কথা শুনে মা বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে এখনও দিনটা ছিল কৌশিকী অমাবস্যা। ফুলিয়া শ্মশানে সেদিন মা হোম করবেন। ভক্তশিষ্য সব উপস্থিত। তারই মধ্যে কথা এগোচ্ছে নানা দিকে। একসময় কথা গিয়ে পড়ল সেই কৌশিকী অমানিশার মাহাত্ম্যে। 'কৌশিকী দেবী ভাদ্রমাসের অমানিশাতে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তাই এই অমানিশা কৌশিকী অমাবস্যা বলে খ্যাত'। কথাগুলো বলে খানিক থামলেন ভৈরবী। তার পর আমার দিকেই চোখ রেখে বললেন, 'সাধনাও এক জগৎ রে। আর তার সৃষ্টি হয় নারীর হাত দিয়ে। তার জন্যই তন্ত্রে নারী মা। এই মা আসলে কী জানিস?'

প্রায় প্রায়ই মায়ের কাছে আমি যাই। আগে যেতাম দুবরাজপুরে। এখন মা ফুলিয়া এলে খবর করেন। আমি ছুটে যাই। যথেষ্ট তেজোময়ী ভৈরবী। ভেতরে এবং বাইরে। একেবারেই গ্রামিকা বা মাতৃসুলভ আচরণ তাঁর নয়। আমি অন্তত দেখিনি। কথা যেন অনেকখানি সিংহীর গর্জন। মধু নেই তাতে, রুক্ষ। তবে জিজ্ঞাসু মানুষ এলে নিজের মতো সমাধান দিতে চেষ্টা করেন। এই যেমন আমাকে দেন।

বললাম, 'আপনি কি পঞ্চ ম-কার-এর দিকে ইঙ্গিত করছেন। তার পর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বলে আজও সেই স্থূলতা সুক্ষ্মতার পাঠ দেবেন। একই কথা বলবেন যদি তাহলে আমাকে এতদূর ছুটিয়ে মারলেন কেন?'

মায়ের কথার পারদ এবার কিছুটা চড়ল।

বললেন, 'ধর্মপথ আর বিছানা গুলোস না তুই। এ তো তোদের ভোগের তৃপ্তিসাধন নয়। এ তো আসলে লয়যোগ।'

— পঞ্চ ম-কার লয়যোগ? এটা অবশ্য নতুনমতো শোনাল।

— যত রকম যোগের প্রণালী রয়েছে তার মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ যোগই হল গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

— কুণ্ডলিনী উত্থাপনেই তো প্রকৃতি-পুরুষ যোগ সম্পন্ন হয়ে যায় মা। সে তো আপনারা মানছেন না?

— কে বলল তোকে এটা? মদো-মাতালের কাছে গেলে তো তোর এই ধারণাই হবে। তন্ত্রে প্রকৃতি-মিলনের ব্যবস্থা আছে মাত্র। সেই ব্যবস্থা প্রবৃত্তি পথকে আটকানোর জন্য কেবল দিব্যাচার, দক্ষিণাচার, পশ্চাচারে তো পূজা, জপ, শ্বাসের কাজই কেবল করা হয়। এখানে প্রকৃতি-মিলন কোথায়? সময়াচার আবার মানসপূজাতেই শামিল। এইসব জায়গায় পঞ্চ ম-কার ব্যবহার তো নেই।

— আমি তো সেটাই বলতে চাইছি, সব মতে বিন্দুসাধনার যুগল-আচার নেই।

— বিন্দুসাধনা তো আছে? না কি তুই বলবি তার বালাই নেই। আসলে গণ্ডগোলটা কী জানিস, আমরা করি সাধন তোরা জানাস মত। অথচ প্রয়োগকলা যে আরোপিত ভারের উপর সবটাই নির্ভরশীল এটা তোদের কোনওভাবে মাথাতে আসে না।

— আরোপিত করতে গিয়ে গণ্ডগোলটা আপনাদেরও তো।

'আমাদের!' যথেষ্ট রেগে উঠলেন মা। মুখজোড়া তার স্বাভাবিক বিরক্তিভাব। এটা অবশ্য আরোপিত নয় কোনওভাবেই।

বললাম, 'চক্রানুষ্ঠান করে যে বিন্দুসাধনা এ তো বামাচার, বীরাচারীদেরই।'

— কেন। চীনাচার ও কুলাচারীরাও তো প্রকৃতি-সাধন করে।

— প্রকৃতি-সাধনে সহায়তা করাই তো নারীর কাজ। সাধককে বিন্দুধারণে সহায়তা করা।

বেশ রেগে উঠলেন মা। বললেন, 'কোন তান্ত্রিক বলছে তোকে এইসব উলটোপালটা কথা? নারী সাধনায় কেবল সহায়ককারী পুরুষের কোন কালামুখো বললে তোকে বল? নারী হল ধারক। পুরুষকে ধারণ করে নারী।

— আপনি বলতে চাইছেন যোগে পুরুষের বীর্যবস্তুর রক্ষার পথ ও পন্থাকে নারী ধরে রাখেন।

— এটা তোর আর এক মুস্কিল জানিস। ধারণ মানে কেবল তুই বস্তুরক্ষা বুঝিস। তন্ত্র কেবল বিন্দুধারণের পথনির্দেশ দেয় না কখনও।

বললাম, 'কিন্তু আমি যতদুর জানি সাধনার মূল লক্ষ্য বিন্দুধারণই। শাস্ত্র তো তারই নির্দেশ দিচ্ছে : তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষ্যো বিন্দুর্হি যোগিনা।

— সাধনার উদ্দেশ্য তো তাই-তো। ঊর্ধ্বরেতা দান।

— সে তো মা পুরুষের কাজ।

— কে বলল তোকে বিন্দুরক্ষা পুরুষের কাজ? কোন অনামুখো?

— শাস্ত্রই তো বলছে মা এ কথা। স্ত্রীসঙ্গ করলে বিন্দু নাশ হয়। শুক্র নষ্ট হয়। শুনক নষ্ট হলে সাধকের আত্মক্ষয় হয়। সেজন্য যোগাভ্যাসকালে স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ তো শাস্ত্রেরই কথা। শাস্ত্র তো স্পষ্টই নির্দেশ দিচ্ছে : যদি সঙ্গং করোতেব্য বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।/ আত্মক্ষয়ো বিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে। সুতরাং এটা তো স্পষ্ট স্ত্রী বা সাধিকার বিন্দুরক্ষা নেই। তাই ঊর্ধ্বরেতার তাঁর তো কোনও প্রশ্নই থাকছে না।

মা-র মুখ লালবর্ণ হয়ে উঠেছে এবার। বুঝতে পারছি আমার কথা তাঁর একেবারেই মনমতো এগোচ্ছে না। ভক্তিশিষ্যরা সব চুপ। আমাকে তারা হয়তো ভাবছে, এ কোন উজবুক মা-র উপর মাতব্বরি করছে! কিন্তু আমি তো ছাড়বার পাত্র নই। জানি মা এবার শ্লোক বলে পার পেতে চাইবেন। দেহসাধনায় নারীকে অনেক উচ্চাঙ্গের সিংহাসন দেওয়া হয়েছে ঠিকই। তন্ত্রে নারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও স্তুতি তো রয়েছেই। রমণীকে জননীত্বে পরিণত করার কৌশল তো তন্ত্রশাস্ত্রই দেখিয়েছে। তবে এই কৌশল নেওয়ার পেছনে অবশ্যই তন্ত্রকারের শাস্ত্রবিধিসম্মত সৎ উদ্দেশ্যই ছিল। সেটা হল বেদ-পুরাণ ইত্যাদি আমাদের যা কিছু সব উপদেশমত রয়েছে সেগুলো সবই কিন্তু আসলে দেখিয়েছে যে রমণীর আসঙ্গলিপ্সা ত্যাগ করা

জীবের দুঃসাধ্য। মানব-দানব-দেবতা কেউই রমণীর আবিষ্ট শক্তি থেকে কোনওভাবেই বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই কৌশলে রমণীর পরিচর্যা করে, তার শরণাগত হয়ে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মায়াস্বরূপিনী সেই মায়াকে পরিত্যাগ করতে হবে। যে কারণে কামিনী ভাবকে জননী ভাবে পরিণতি দান সাধকের। তন্ত্র স্ত্রীজাতিকে পুজো করার কথাই শিখিয়েছে : 'স্ত্রীসমীপে কৃতা পূজা জপশ্চ পরমেশ্বরী। /কামরূপাচ্ছতগুণং সমুদীরিতমব্যয়ম্।। ' জগৎকে স্ত্রীময় জ্ঞান করতে তন্ত্রই শিখিয়েছে। বলা হয়েছে : 'যস্য অঙ্গে মহেশানি সর্বতীর্থানি সন্তি বৈ।' অর্থাৎ নারীর অঙ্গেই সর্বতীর্থের বসতি। নারী-শরীর পবিত্র তীর্থস্বরূপ। যে সাধক নারীরূপা শক্তিকে মানুষ মনে করে তার কখনও মন্ত্রসিদ্ধি হবে না বরং বিপরীত ফল ফলবে : 'শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু যঃ করোতি বরাননে। /ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ।' সুতরাং ভক্তিযুক্তমনে নারীর পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন যে সাধক তাঁর সিদ্ধি কেউই খণ্ডন করতে পারবেন না : 'শক্ত্যাং পাদোদকং যস্তু পিবেদ্ভক্তিপরায়ণঃ। উচ্ছিষ্টং বাপি ভুঞ্জীত তস্য সিদ্ধিরখণ্ডিতা।'

'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'- এ বলা হয়েছে, দেবীজবী তুমি জ্ঞানরূপিণী, এই জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে— যা থেকে লোকের সমস্ত রকম জ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে সে সবই তুমিই তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা, তুমিই জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্তিতে বিদ্যমান, তুমিই একাকিনী সমস্ত জগৎ পূর্ণ করে তার মধ্যে বর্তমান হয়ে আছ। তুমি অতুলনীয়া, বাক্যাতীতা— স্তব করে তোমার অনন্ত গুণের উল্লেখ করতে কে কবে পেরেছে বা পারবে? 'কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।'

তাহলে এটা স্পষ্ট তন্ত্র নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে কখনও শেখায়নি। কিন্তু নারীর সেই সিংহাসন আজ টলছে তান্ত্রিকবেশী পুরুষের লোভ ও লিপ্সায়। নারী এখানে ব্যবহৃতা। পরিত্যক্তা। আবার নারীর ব্যভিচারিণী রূপও আমি কম দেখিনি। আসলে যুগল-শরীরকে ঘিরে যে সাধনবৃত্ত সেখানে সাধনার ফণায় গোপন বাঁকা যৌনাচারের অসার্থক দাঁত বসতে বাধ্য। আর সেই বিষকে বহন করেই চলতে হবে যুগল-সাধনার বাসভূমিকে। তাই বসবাসের কাহিনিতে জানলা দিয়ে ভ্রষ্টাচারের মেঘ উঁকি দিতে বাধ্য। তবে তন্ত্র যতই নারীকে রত্নখচিত সিংহাসনে বসাক না কেন, ভৈরবী-সাধনে বা প্রকৃতি-মিলনে নারীর সিদ্ধি সেইভাবে কোথায়? পুরুষ সেখানে উর্ধ্বরেতা-তে সক্ষম হন ঠিকই কিন্তু নারীর ঋতুস্রাব কি থামিয়ে দেওয়া যায়? পুরুষ-প্রকৃতি মিলনে বা ভৈরবী-সাধনে নারীর ঋতুরক্ষা করেন না এই যা। সেটা সাধনার কৃৎকৌশল। সেই কৌশলে নারী সহায়ককারীমাত্র। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান তো আর উর্ধ্বরেতার মাধ্যমে সেইভাবে কখনও হয় না। মিলনের সময় রজকে

স্থিরতা প্রদানই সঙ্গিনীর কাজ। বলা হয় পুরুষের শরীরে বীর্যবস্তু মূলাধারে সুপ্ত থাকে। তাকেই যুগল-সাধনে ঊর্ধ্বরেতা করে দিতে পারেন তিনি। নারীর শরীরে সহস্রারে রজবস্তু থাকার কথা বলা হয়। তাকে স্থিতি দিতে পারেন নারী-সাধিকা। এর বেশি কার্যক্রম তো তাঁর শারীরিক গঠনক্রিয়া কোনওভাবেই করতে পারে না। তাই ঊর্ধ্বরেতার পরম নারী কীভাবে পেতে পারেন! নারী সেখানে সহায়ককারী মাত্রই। যোগমায়া মা তা অবশ্য সরাসরি স্বীকার না করলেও তাঁর কথকতার ভেতর বিষয়টি আরও-ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যা ভেবেছিলাম তাই। আমার প্রশ্নবাণে মা শেষমেশ শ্লোকেরই আশ্রয় নিলেন। 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র'-এর তারাখণ্ড থেকে প্রথমে তিনি প্রকৃতির ব্যাখ্যা দিলেন। তার পর প্রকৃতিকে যে নানা তন্ত্র দশমহাবিদ্যার নানা প্রতীক বলে উল্লেখ করেছে সেসব উচ্চারণ করে তিনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন শেষে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনায় প্রকৃতি-মিলন না হলে উপাসনা পূর্ণ হয় না কোনওভাবেই : 'আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দনং তথা। /দর্শনং স্পর্শনং যোনের্বিকাশো লিঙ্গঘর্ষণম্। /প্রবেশঃ স্থাপনং শক্তের্নবপুষ্পানি পূজনে।'

বললাম, 'প্রকৃতি-মিলনে পুরুষই তো অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন।'

— বলল কে তোকে?

— কে আর বলবে? আপনিই তো সাক্ষ্য রাখলেন শাস্ত্রের। মহাচীনাচারক্রম বলে আমাকে তো তা-ই বোঝাতে চাইলেন।

মা রাগ নিয়ন্ত্রণ করে নিলেন খানিক।

বললেন, 'শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়েছিস ঠিকই। কিন্তু ক্রিয়া বুঝতে ক্রিয়ায় থাকতে হয়। না হলে ওসব কি আর বই পড়ে হয়? তন্ত্র হল গুরুমুখী বিদ্যা। শোন তোকে এক সাধকের গল্প বলি। তার সাধনাকার্যে ভৈরবী হয়েছিলেন যিনি তাঁর গুরুপাটে আমারও যাতায়াত। সুশীল খ্যাপার নাম শুনেছিস তুই?'

বললাম, 'শুনেছি। তবে দেখবার সুযোগ হয়নি।'

— সেদিনের ছোঁড়া তুই সুশীল খ্যাপাকে দেখবি কী করে! তবে দেখা হলে বুঝতি কী তেজ, কী দীপ্তি তাঁর। আমার শাস্ত্রজ্ঞানে হাত পড়ছে তাঁর।

— শুনেছি তিনি নাকি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।

— শুধু কী তাই! পুঁথিপত্তর সংগ্রহ করেছেন নিজে। লিখেছেন সাধনের বই। তিনি কি আর ভেক নেওয়া মদো-মাতাল নাকি! তা এই সুশীল খ্যাপার শিষ্য হলেন তাপস। এখন স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজ। শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী। সাধন তাঁর

নখদর্পণে। জনসমক্ষে আসেন না বিশেষ। সুন্দরবনের এক কোণে পড়ে রয়েছেন। নিজময়তায় বুঁদ। পারলে একবার যাস। তা সেই সাধকের প্রথম প্রকৃতি-মিলনে কী হল জানিস?'

বললাম, 'স্বীয় বীর্য একত্র করে লিঙ্গ পরিচালনাতে ব্যর্থ হলেন।'

— না রে না। সুশীল খ্যাপার শিষ্যের সে ভুল হয়। গুরুপদেশ অনুযায়ী তিনি চলে শরীর তৈরি রেখেছেন। তাঁর লিঙ্গ পরিচালনে ভুল হয় না কি? তিনি তখন যোনিমুদ্রা রত।

'আর সঙ্গিনী?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— সঙ্গিনীর যোনির রজ-আকর্ষণ সঙ্গী তৈরি করবে ঠিকই। যদি যোনিমুদ্রাতে ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া বস্তু নিম্নে আসতে থাকে, পড়ে যাওয়ার দশাপ্রাপ্ত হয় তখন ইড়া নাড়িতে বাঁদিকে চালনা করে লিঙ্গ পরিচালন বন্ধ করতে হয়। তাপসের দ্বিতীয় মিলনে তাই হল।

— প্রথম মিলন তাহলে ঠিকঠাক।

— নারে বাবা। প্রথম মিলনে রজ-আকর্ষণকে লিঙ্গ পরিচালনাতে নিয়ে যাওয়া মাত্রই পাত। আমি তো ছিলাম চক্রমধ্যে।

বললাম, 'এখানে সঙ্গিনীর দোষ কোথায়?'

— কী বলছিস তুই! সঙ্গিনীর সহস্রারের বস্তু যোনিতে খেলছে যখন, তখন স্থিরতা থাকবে না তাঁর? সেই স্থিরতা ছিল না বলেই প্রথম মিলনে পাত হল তাপসের।

— দ্বিতীয় মিলনে যা বললেন তিনি তো নিজেই বিপর্যস্ত।

— তাই কি? উতরোলেন আপন বায়ুকে আটকে দিয়ে ঠিকই। বিন্দুকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে তুলতে থাকলেন। খ্যাপা বলছেন তখন, বজ্রোলী-সিদ্ধি হবে তোর তপন। সবার তখন একই আশা। আর হঠাৎ করেই পাত। গুরু তো বকাঝকা।

— তাহলে এবারেও সিদ্ধস্তরে তিনি যেতে পারলেন না?

— যাবেন কী করে? সঙ্গিনী বিন্দুরক্ষাতে নিজের শ্বাসক্রিয়া ঠিকঠাক রাখতে পারলেন না বলেই তো অঘটনটা ঘটল আবারও।

— মেয়েরা সব আসন কি করেন?

— সব করবেন কেন? রেচক, পূরক, কুম্ভক করলেই যথেষ্ট।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'অন্য কোনও মুদ্রাভঙ্গি...'

বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিলেন না ভৈরবী।

বললেন, 'দরকারটা কী? প্রাণায়ামেই রজের স্থিরতা ঠিক থাকে।'

— কীভাবে?

— কীভাবে আবার! এটাই তো সাধনের মূল সারবত্তা। বাইরের বায়ুকে মিলনযোগে টেনে এনে ভেতরে ধরে পূরক আসন করলেন নারী তখনই তো তাঁর কুম্ভক হয়ে গেল দীর্ঘক্ষণ শরীরের ভেতরে বায়ু আটকে রাখাতে আর যখন তিনি আবার বায়ু ছাড়ছেন রেচকে তখন ওঠাপড়ায় রজবীজ উত্তাল। সামাল দিতে হবে তো তাঁকেই। না হলে সেই বীজের আকর্ষণে বীর্যবস্তু সব যোনিতে লেপ্টালেপ্টি হয়ে যাবে। তাপসের দু'বার তাই হল। তৃতীয় বারে খ্যাপা আশ্রমে রেখে গড়লেন মানসীকে। তিনি পারলেন তাপসকে পরমস্বরূপ বোঝাতে। গুরু নাম দিলেন তাপসের স্বরূপানন্দ গিরি।

— গিরি কেন?

— কেন নয় রে? নারী হলেন পর্বত। তাঁকে পেরিয়ে গিয়েই তো স্বরূপের আনন্দ পেতে পারেন সাধক। তাই তাপসের গুরুদেব গিরি টাইটেলটি বসিয়ে দিয়েছেন নামকরমের পরেই। নারীর কাজ রজ ধরা। তাই তাঁরা হলেন রজকিনী।

— রজঃপ্রবাহ যদি বন্ধ হয়ে পড়ে তখন ভৈরবী নারীর আর সাধনে সার্থকতা কোথায়? ভৈরবের সঙ্গ তিনি কি আর দিতে পারেন? তখন তো নতুন ভৈরবী প্রয়োজন।

আবারও রেগে উঠলেন ভৈরবী।

বললেন, 'কে বলেছে তোকে স্রাব না হলে সাধন করতে পারবেন না নারী?'

বললাম, 'রজঃপ্রবাহেই তো বীর্যধারণ করেন বলে শুনেছি সাধক।'

— ঠিকই শুনেছিস।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে? রজ বন্ধ হলে মিলন-যোগে বিন্দুধারণ কীভাবে হবে?'

— স্রাব বাইরে বন্ধ হল তো কী এল গেল। ভেতরে স্রোত তো রয়েছে না কি? সেই স্রোত দিয়ে সাধককে সাহায্য করবেন নারী।

ভৈরবী মা নারীর আসন এত জোরের সঙ্গে এখানে পাততে পারছেন তার কারণ তিনি আশ্রম-টাশ্রম করে ভক্তশিষ্য গড়ে একটা জায়গাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পেরেছেন। সঠিক সাধকের সঙ্গিনী হয়েছেন তিনি। তাই তিনি সাধনে পরিত্যক্ত রমণীর দুঃখব্যথা ধরতে পারবেন না কিছুতেই। কেন-না চৌহদ্দির বাইরে তিনি পা রাখেননি সেভাবে। যাঁরা রেখেছেন তাঁদের কাছেই সেসব কাহিনি

আমার শোনা। সেইসব প্রসঙ্গক্রমে বলব নিশ্চয়ই। এখন সেইদিকে যাই। যেদিকে স্বরূপানন্দ গিরি বইপত্তর ধরে যুক্তি সাজাতে তৈরি হচ্ছেন।

রাত বাড়ছে। তারই ভেতর বেড়ে চলেছে যুক্তি-প্রযুক্তির নানা সব গ্রথিত সম্পর্কসূত্র। ভৈরব বললেন, 'প্রকৃতির প্রকাশ আমরা তিনভাবে পাই। তিনভাবে প্রকৃতি সাড়া দেন সাধকের দেহের ভেতর। সাধককেই সাধনায় আসার কালে ঠিক করে নিতে হয় কোনভাবে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হবেন।'

বললাম, 'কী কী সেই ভাব?'

— প্রকৃতি হলেন নিত্যা। তিনি তিনভাবে অবিভক্ত রয়েছেন। মানবদেহে সূক্ষ্ম রূপে আছেন তিনি। নানা সব বর্ণের মধ্যেও জ্যোতিরূপে তিনি বিরাজমান। আর প্রকৃতির স্থূলরূপ হলেন নারী। আমরা যেহেতু ম-কার তত্ত্বে বিশ্বাসী, তাই নারীর স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধনার সূক্ষ্মতার ভেতর চলে যাই।

— অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন প্রবৃত্তির থেকে নিবৃত্তির পথ আপনাদের।

ভৈরবের মুখ এবারে চক চক করে উঠল। বোধহয় এতক্ষণ পর আমার কথাটা তাঁর যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

বললেন, 'এতক্ষণে আপনি পথের সারবস্তুটা ধরতে পারলেন। যাক, আমার এখন বলতে সুবিধে হবে। জয় মা। জয় গুরু। জগতে তো দুটোই পথ আছে।'

বললাম, 'প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি।'

— এই তো লাইনে চলে এসেছেন আপনি। প্রবৃত্তি হল ভোগ। নিবৃত্তি হল যোগ। তন্ত্রের পথ হল ভোগ থেকে যোগে যাওয়া। পঞ্চ ম-কার স্থূলতা থেকেই সূক্ষ্মতায় যেতে বলে।

— পঞ্চ ম-কারে নিবৃত্তির পথ তো রয়েছ।

— হ্যাঁ আছে তো।

— যতদূর জানি সেটাকে সূক্ষ্ম পঞ্চ ম-কার সাধনা বলা হয়ে থাকে।

— আপনি তো জানবেনই। এ জগতে আপনার ঘোরাফেরা অনেক দিনের। তার ওপর আপনি শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ। সূক্ষ্ম যে পঞ্চ ম-কার সাধনার কথা বললেন, সেই সাধনা শুরু হয় মূলাধার থেকে। মূলাধার চক্রেই সূক্ষ্মরূপে কুণ্ডলিনী আকারে প্রকৃতি থাকেন। তাকে সহস্রার চক্রে নিয়ে যান সাধক। সেখানে থাকেন শিব। এই সহস্রারে গিয়েই শিব-শক্তির মিলন হয়।

— লিঙ্গমূলের সুপ্ত বীর্যবস্তু সাধক কুণ্ডলিনীযোগে সহস্রারে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই তো?

— হ্যাঁ, একেবারে ঠিক বলেছেন আপনি।

— তাহলে এটাও তো সেই বীর্যবস্তু রক্ষা বিন্দুসাধনায়।

— অবশ্যই। নিবৃত্তির পথ দিয়ে সূক্ষ্মাকারে বিন্দুসাধনা। তবে এটা বুঝবেন আপনি, এখানে কেবল শিব আর শক্তি রয়েছে।

— হ্যাঁ, কুণ্ডলিনীকেই তো শক্তি বলছেন আপনারা।

— ঠিক। তবে ভেবে দেখুন শক্তির এখানে কিন্তু নাম দিচ্ছেন না সাধক।

— আপনারাও তো নাম দেন না। যতদূর জানি।

— আমরা বলি কী জানেন, নিখিল বিশ্ব হল গিয়ে কাল।

— আর এই কাল থেকে কালী। তাই তো বলবেন এবার আপনি?

— কুণ্ডলিনীর শক্তিকে আমরা বলি আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী। তার কারণ কী জানেন?

বললাম, 'কারণ তো একটাই। বলা হয়ে থাকে সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না; স্থল-জল কিছুই ছিল না। ছিল না এই দিন রাতের প্রভেদ। ছিল কেবল অন্ধকার।'

ভৈরব বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলোচনায় সুখ আছে। যে অনাদি, অনন্ত, তামসের কথা বলছেন আপনি এই তামসকেই তন্ত্র মানছে আদ্যাশক্তি কালীরূপে।'

— মানুষের শরীরের কালী শিবের মিলন এ তো কাল্পনিক।

— হ্যাঁ। তাই তো। আপনার সুবিধে থাকলে কালীকে কুণ্ডলিনীশক্তি বলে মানুন।

— শিবকে তাহলে চৈতন্যশক্তি বলছি।

— তাই বলুন। প্রকৃতি বিকাশের যে তিন ভাবের কথা আমি বলছিলাম আপনাকে, দেখুন নিজে নিজেই আপনি প্রথম ভাবে এসে দাঁড়ালেন।

— দ্বিতীয় ভাবে জ্যোতি আর বর্ণের মাধ্যমে নামকরণ? এই তো?

— তাই তো। প্রতিটি চক্রকেই তো সাধক বর্ণাকারে যুক্ত করেন। মূলাধারকে বলেন সুবর্ণচক্র।

— দেবদেবীর পুজোও তো চলে চক্রস্থ দশায়?

— সাকার মতে চলেই তো। মূলাধারে ইন্দ্রদেব, স্বাধিষ্ঠানে বরুণদেব, মণিপুরে অগ্নিদেব। সবই তো আপনি জানেন।

— সহস্রারে জ্যোতিদর্শন।

— সহস্রার তো নিরাকার মহাশূন্য। সেখানেই তেজোময় পরম।

— এই পরমই তো মূলাধারস্থ বীর্যের ঊর্ধ্বরেতাতে সম্পন্ন হচ্ছে।

— হ্যাঁ। অবশ্যই। বীর্যরক্ষাই তো বিন্দু সাধনার মূল উদ্দেশ্য।

— আর সেই সাধনাতেই আপনার নারী-মিলনে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম জগতে আসছেন।

— এবার একটু ভুল হল আপনার। জগৎ কোথায় পেলেন আপনি? পরমাত্মা তো জগৎ নয়।

— তাহলে আপনি বলতে চাইছেন কৃত্রিম ভাবে জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন ঘটছে নারী আর পুরুষের স্থূল সম্ভোগে।

— এতক্ষণ পর আমাদের মিলনকে আপনার স্থূল সম্ভোগ মনে হল?

বললাম, 'সম্ভোগ ছাড়া কী? সাধারণ মিলনে আমাদের দম-শ্বাসের ব্যাপার নেই। কারণ বীর্যক্ষরণই আসল উদ্দেশ্য। কামনার আস্বাদন। আপনারাও তাই করছেন, তবে যোগ-প্রাণায়ামে বীর্যবস্তু আটকে থাকছে। এই যা পার্থক্য।'

ভৈরব এবার বললেন, 'পরমের উপলব্ধি ব্যভিচার নয় কোনওদিনই।'

— তাহলে সাধারণ সম্ভোগ ব্যভিচার বলছেন আপনি?

— তাই-তো। আগে মিলনের তিথিযোগ ছিল। দিনক্ষণ ছিল। এখন মানুষের মিলন আর সারমেয়দের মিলনে পার্থক্য নেই কিছু। তাও সারমেয়দেরও নির্দিষ্ট মাস আছে। মানুষের তো এখন রাস্তাঘাটে, পার্কে, ঝোপঝাড়ে হয়ে যাচ্ছে।

— মানুষ তো আর বলছে না সাধন করছি। তারা প্রবৃত্তি মেটাচ্ছে।

— আমরা প্রবৃত্তিকে নাশ করছি। যে কারণে স্থূল মদ-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা-মৈথুন দিয়ে সূক্ষ্মতায় যেতে চাইছি। পথটা পবিত্র বুঝলেন। মতে পথে ভুল নেই। ভুল যা সাধনার যথেচ্ছাচারে। মানুষের তা রয়েছে জীবনে আর সাধকেরও তা রয়েছে সাধনে। আসল কথা হল অমিয়র ব্রহ্মসত্তার। কীভাবে দেখবেন সেটা তো একেবারেই আপনার ব্যাপার। নক্ষত্রের ন্যায় চির-অম্লান আলোকবিন্দুর দ্যুতিটুকু নিয়ে আমি আছি। চিরদিনই থাকব। মহান শাশ্বত জ্যোতির্ময় রূপ আমি দেখেছি। এখন আপনি এসে যদি বলেন, যে-পথে দেখেছেন পথটা ভুল মেনে নেব না আমি। যদি বলেন পথে এসে কিছু মানুষ অভিভাবকত্বহীন হয়ে পথটাই পাননি, মেনে নেব। পাওয়া না-পাওয়া সবটাই তো ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং।

আমি দেখছি এখন ভৈরবের শরীর জুড়ে মানুষের চরম দারিদ্র্য ও মন্বন্তরের কুসুমগুলো সব একে একে ঝরে যাচ্ছে। তবে কি তিনি মহামানবের অভিভাবকত্ব নিয়ে বসে আছেন এখন আমারই সম্মুখে? ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটা ঠিক, তাঁর ভেতরে কোনও এক অতীন্দ্রিয় আলো রয়েছেই।

আমরা এখন বসেছি পঙ্‌ক্তিভোজনে। ভৈরবী মা কলাপাতার ওপর ডাবু হাতা দিয়ে গরম গরম খিচুড়ি পরিবেশন করছেন আমাদের। আশেপাশের প্রতিবেশীরাও আজ পাত পেড়েছেন আশ্রমে। যাবতী তরি-তরকারি পড়ে খিচুড়ি বেশ সুস্বাদু হয়ে উঠেছে। তারিয়ে-তারিয়ে সকলেই খাচ্ছেন। গিরি মহারাজ শশব্যস্ত হয়ে দেখছেন আমার পাতে ঠিকঠাক খিচুড়ি পড়ছে কি না।

বললেন, 'আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না।'

বললাম, 'আমার খাওয়া এ-রকম।'

ভৈরবী মা বললেন, 'ছেলের আমার ঘ্যাঁট খাওয়ার বোধ হয় অভ্যেস নেই।'

বললাম, ' মা না সবেতেই আমি মানিয়ে নিতে পারি। কোনওই অসুবিধে নেই আমার।'

ভৈরব বললেন, 'রাতের প্রসাদে মাছ-মাংসের ব্যবস্থা রয়েছে।'

— সাধন-আধার দেখাতে গেলে তার তো ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।

— ভৈরবীচক্র দেখেছেন আগে?

— সেই অর্থে নয়। আশ্রম-মিলন দু'একবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

— আমরা কুলাচারী মার্গের সাধক। শ্মশানে চক্রানুষ্ঠানে অনেকবারই আমি গুরুচক্রে সামিল হয়েছি।

— সে আমি শুনেছি।

— আপনাকে তো আগেই বলেছি কিছু না-শুনে না-জেনে এই হু হু তেপান্তরে আপনি ছুটে আসার লোক নন।

— আসলে বিন্দুসাধনা স্মৃতিগম্য বিষয় তা নয়। যেটুকু যা আমার বোঝা তার বেশির ভাগটাই সাধকের স্মৃতিগম্য বিশ্বলোক।

— বিশ্বলোক যখন তুললেন আপনি এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলি।

— অবশ্যই। আপনার কথা শুনব বলেই তো এতদূর এসেছি। যোগমায়া ভৈরবী আমাকে আপনার কথা বলেছেন।

ভোজনপর্ব তখন আমাদের সমাধা হয়ে গিয়েছে। ভৈরব-ভৈরবী অবশ্য খেলেন না। খেয়ে নিলে নাকি যুগল-আসন দেখানো সম্ভবপর নয়। আরও দু'জন ভৈরব-ভৈরবী এসে পৌঁছেছেন কিছু আগে। তাঁরাও চক্রানুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এখন তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

উঠোনে দুটি মৃগচর্মের আসন বিছিয়ে রাখা হয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি ভৈরব চোরাকারবারীদের কাছ থেকেই এসব হস্তগত করেছেন। বোধহয় বাবার শিষ্যসামন্তরা দুর্মূল্য এই আসনগুলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন চক্রানুষ্ঠানের জন্যই। হর-পার্বতীর

মতোই তিন যুগল ভৈরব-ভৈরবী প্রথমে 'ক্লীং ফট্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আসন শুদ্ধ করে নিয়ে তার ওপর উপবেশন করলেন। আমার ডান দিক দিয়ে পর পর বসেছেন স্বরূপানন্দ গিরি-অর্চনা মা, খ্যাপা কালীনন্দ-তারা ভৈরবী আর ভৈরব কালেশ্বর এবং তাঁর সাধনসঙ্গিনী মহাবিদ্যা ভৈরবী। যে জলচৌকির ওপর বসে এতক্ষণ ধরে অর্চনা মা রান্না সারছিলেন তার ওপরই আমার বসার জায়গা হয়েছে। তারণভোলা চক্রাচারের সমস্ত উপকরণই এগিয়ে দিচ্ছেন ভৈরব-ভৈরবীদের। সিঁদুর, রক্তচন্দন, ঘট, দই, আতপ চাল, পান, ফল, আমের পল্লব, ফুল, বেলপাতা সবই দেখছি একে-একে একটি আস্ত কলাপাতার ওপর তারণভোলা রাখছেন। অর্চনা মা দেখলাম সিঁদুর ও রক্তচন্দন দিয়ে একটি চতুষ্কোণমণ্ডল আঁকলেন। যা দেখতে অনেকটা সেই যজ্ঞকুণ্ডে আঁকা ছবির মতোই হল; ত্রিভুজ, উল্টানো ত্রিভুজ এঁকে এঁকে যা তৈরি করলেন তিনি, তা অনেকটা এবার যন্ত্ররেখার মতোই হয়ে দাঁড়ালো।

স্বরূপানন্দ গিরি বললেন, 'ক্রিয়াযোগে প্রতীক বক্তব্য রাখাই রীতি। আপনি নিশ্চয়ই ধরতে পারছেন এইসব আঁকাআঁকির ব্যঞ্জিত রূপ।'

বললাম, 'যে ত্রিভুজের মুখটা নীচের দিকে তা হল যোনির প্রতীক অর্থাৎ কিনা আপনাদের ভাষায় বললে প্রকৃতির প্রতীক আর যে ত্রিভুজের মুখটি ঊর্ধ্বদিকে তা হল লিঙ্গ অর্থাৎ কিনা পুরুষের প্রতীক। আরও অসংখ্য ছোট-বড় ত্রিভুজের এই যে একে অপরকে ছেদ তা হল চক্রানুষ্ঠানের প্রতীক। চক্রস্থ শিব-শক্তির একীভূত দৃশ্য।'

ভৈরবী মা বললেন, 'ও ছেলে তুমি যে আমাদের মার্গেরই লোক। এত জানো সাধনে আসো, চক্রে বসো আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো বিন্দুধারণ। তবে আগে যোগে শরীর তৈরি করতে হবে। মহারাজ তার পথ বাতলে দেবেন। আর মিলনে যাতে তোমার পাত না হয় তার জন্য সিদ্ধাই নারী আমি এনে দেবো তোমায়। তখন আর অর্থ খুঁজতে হবে না। পরমের অর্থ তখন তুমি ছেলে নিজেই পরম। আমি তোমার সাধননাম রাখব পরমানন্দ। আসা-যাওয়া করো, দীক্ষা হোক আগে। তার পর সব হবে একে-একে। এখন জানো বোঝো উপলব্ধি করো কেবল। আর এতেই তোমার শরীরের সাপ খুলবে। সাপ খুললে তার প্রবলতর হিসহিসানি স্থির হতে দেবে না। তোমায় যেমন দিচ্ছে না গো ছেলে।'

এই বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ভৈরবী মা এমন এক হাসি দিলেন তার রেশ, ধ্বনি যেন রাতের অনির্বচনীয় স্থিতাবস্থাকেই ভেঙে নিতে থাকল।

মায়ের শরীরে এখন সুমধুর ছন্দের গ্রাম্যিকাসুলভ অবয়ব আমি আর দেখতে পেলাম না কোনওভাবে। সেই শরীর যেন আমার চোখের সামনেই অবলীলায় মানব সভ্যতার বাইরে দাঁড়ানো এক চিররহস্যের প্রকাশ প্রবলতা হয়েই ঝুলে রইল। তাঁর হাসি যখন থামল তখন আবার অত্যন্ত বিনয়ের সুর ঝরতে থাকল কথার মধ্যে। এ যেন এক আশ্চর্য রূপবদল। মানবধারার অবিচ্ছিন্নতা নিয়ে চলে গিয়েও পুনরায় ফিরে আসা। আবারও তাঁর সেই স্নেহলালিত কণ্ঠের আবেশ যেন ঝরে পড়ল আমার ওপরে।

বললেন, 'খোলা সাপের শরীর নিয়ে আর কতদিন ঘুরবি তুই? শক্তি খুলে তোর শরীরে হাঁ আর তুই চৈতন্যের স্থায়ী আবরণ দিতে পারছিস না?'

বললাম, 'শক্তি কীভাবে খুলবে মা? আমি তো কোনওদিন যোগাভ্যাস করিনি।'

— জ্ঞানেরও তো একটা শক্তি আছে রে, সেই শক্তির জোরেও কুণ্ডলিনী জাগে। তোর সেই শক্তিতেই সাপরূপী কুণ্ডলিনী জেগেছে। একেবারে ফণা তুলে সে মণিপুর পর্যন্ত উঠে সারা।

— কীভাবে বুঝলেন আপনি শক্তি আমার মণিপুর অবধি পৌঁছেছে?

— চোখ বলে দিচ্ছে তোর আধার রয়েছে।

— কী সেই আধার যা আমি বুঝতে পারছি না?

— পারছিস না, না কি আমাকে ধরা দিতে চাইছিস না? তুই তো সব জেনেবুঝে এসেছিস বাপ এই স্থানে। আমরা ভেলকিধারী তান্ত্রিক নই, তাবিজ-কবজ দেই না, সাধনা নিয়ে পড়ে থাকি, এ চত্বরে মানুষের যদি কিছু ফল হয় তা আমাদের মনস্কামনার জোরে। তুই তো এও জানিস বিশ্বাসের জোর কতখানি। তোর প্রত্যয়, বিশ্বাসের শক্তি তো কম নয়। কম ঝড়ঝাপটা তো তার ওপর দিয়ে যায়নি। সব সামলেছে তোর ওই কুণ্ডলিনী।

— এ সব তো মা আপনার ধারণা?

— সবই ধারণা বাপ? পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হবে বলে ফল বেরোনোর আগের দিন ঘুমের ওষুধ চুরি করে খেয়ে মরতে গেছিলি সেও আমার ধারণা?

ভৈরবী মা-র এই কথাতে আমার একটুও চমক কিন্তু লাগল না। আমি এবার কিছুটা নিশ্চিত হতে পারলাম যে অষ্টসিদ্ধির কিছু প্রাপ্তি তাঁর করায়ত্ত রয়েছে। কীভাবে এই সিদ্ধি আসে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলব অবশ্যই। তার আগে সেই চক্রস্থ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করি।

ধূপ-দীপ জ্বালানো হয়ে গেছে। তারা ভৈরবীর হাতে এখন ঘট। তাতে আমের পল্লব সাজানো। ঘটের গায়ে সিঁদুররঞ্জিত স্বস্তিক আঁকা। কিছু আগে আঁকতে

দেখেছি তা মহাবিদ্যা ভৈরবীকে। কালেশ্বর ভৈরব ঘটে ফল, বেলপাতা, আতপ চাল, দই, কলা সব সাজিয়ে দিয়ে ঘট ধরিয়ে দিলেন এবা স্বরূপানন্দ মহারাজের হাতে। তিনি বিন্দুর জপ করতে করতে রক্তশোভিত সেই চতুষ্কোণের ভেতর ত্রিভুজের নাদবিন্দুর ওপর তাকে স্থাপন করে দিলেন। স্বরূপানন্দের উচ্চারণের সঙ্গে তাল রেখে কালেশ্বর ভৈরব, খ্যাপা কালীনন্দও মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকলেন। সেই সঙ্গে সমবেত তিন ভৈরবীর জোকার ধ্বনিতে পরিবেশে যেন পূজাময়তার ছোঁয়া লাগতে থাকল। তারণভোলার হাতে তখন ধূপ-দীপ। তিনি তা দিয়ে তখনও আরতি করে চলেছেন ঘটরূপী শিব-শক্তির রূপস্থ দশাকে।

ঘট স্থাপনার পর একে-একে ভৈরব-ভৈরবীরা ফুল-বেলপাতা নিয়ে কালীমন্ত্রের জপ করতে থাকলেন। এরই ফাঁকে বাংলা মদের বোতল কয়েকটি মাটির হাঁড়িতে ঢেলে রাখলেন তারণভোলা। কালীনন্দ তাতেও ফুল-বেলপাতা প্রদান করে মন্ত্র পড়তে থাকলেন : 'নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্/ চারুহাসামৃতোল্লাসোল্ল-সদ্বদনপঙ্কজামই॥ / নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতায়। / বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েদ্বারাভকরাম্বুজম্॥'

স্বরূপানন্দ মহারাজ আমায় বললেন, 'এই মন্ত্রে ভৈরবীকে জাগানো হল।'

আমি দেখলাম এবার তারা ভৈরবী মন্ত্র পড়ছেন। অর্থাৎ ভৈরবকে জাগানোর মন্ত্র : 'রর্পূরিপুরধ্বলং কমলায়তাক্ষং / দিব্যস্বরাভরণভূষিতদেকান্তিম্ / বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং / দক্ষেণ শুদ্ধগুটিকাং দধতং স্মরামি॥'

এর পর সকলের হাতেই উঠে এল মদের পাত্র। সমস্বরে সকলেই বলতে থাকলেন মন্ত্র। বুঝলাম মদ্য শোধন হয়ে যাচ্ছে এই মন্ত্রে। সকলেই বলছেন : ওঁ আনন্দভৈরব্যৈ আনন্দভৈরবায় নমঃ।' এর পর বলছেন : 'আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা।' একশো আট বার এই মন্ত্র বলবার পর ভৈরবরা নিজ ভৈরবীদের মদপাত্র ঠোঁটের ডগায় তুলে ধরলেন। ভৈরবীরা নিজ ভৈরবদের হাত হতে মদ পান করতে থাকলেন এমনভাবে যেন দেখে আমার মনে হল অমৃত পান করছেন সব এঁরা। একই রূপে ভৈরবরাও পান করলেন মদ। এই মন্ত্রে এবার মাংস ও মৎস্যও শোধিত হওয়ার পর নিজেদের মধ্যে ভোজনাদি চলতে থাকল। ভৈরবদের শরীরের বাম ভাগে ভৈরবীরা সব বসে পান-ভোজনাদি করতে থাকলেন। তবে কেউই এখানে একেবারে পোশাকশূন্য নন। ভৈরবদের শরীরে নিম্নাঙ্গে লাল কৌপিনের ছটা আর ভৈরবীদের শরীরের বক্ষযুগল ব্লাউজে আবৃত। নিম্নাঙ্গে সায়া রয়েছে লজ্জাভূষণের বস্ত্র হিসেবে। এবার দেখলাম সকলেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছেন যাঁর যাঁর শিব ও শক্তির দিকে। দেখে মনে হচ্ছে সম্মোহিত যেন সকলেই। তবে

প্রায় আকণ্ঠ মদ্যপানের মত্ততা কারও শরীরেই কিন্তু নেই। সমাহিত অবস্থার মধ্যেই দেখলাম আমি, ভৈরবী মায়েদের বক্ষবন্ধনী ছিন্ন হচ্ছে আর ভৈরবদের কৌপিনও খুলে রাখছেন মায়েরা। এবার সকলেই পোশাকশূন্য। সহযোগী তারণভোলা হ্যাজাকের আলো এই সময় প্রায় নিভিয়ে ফেলার মতোই কমিয়ে এনেছেন। অল্পালোয় এটা বুঝতে পারছি আমি, ভৈরবীরা কেউই এখন আর স্বীয় ভৈরবদের কোলে বসে নেই। সকলেই ভূমিস্থ। যে যাঁর যুগলের সামনা-সামনি। আমি জলচৌকিতে বসে এখন ভৈরবদের সুঠাম পিঠ কেবল দেখতে পাচ্ছি। নিতম্বদ্বয়ে জটাল আগল। যেন সব প্রস্তরখচিত অপূর্ব ভাস্কর্য বলে মনে হচ্ছে তাঁদের। শরীরে কারওরই স্পন্দন নেই। তবে মধ্যে মধ্যে পাঠমন্ত্রে মনে হচ্ছে কণ্ঠদেশ কেবলই জেগে আছে। না হলে শরীর এমনই নিষ্প্রাণ! বুঝলাম ভৈরবরা সব এখন স্তন ও যোনিপূজা করছেন। ভৈরবীদের মুখাবয়ব একেবারেই স্পষ্ট নয়। হঠাৎই দেখলাম পূজামন্ত্র থেমে গেল। এখন যুগলমূর্তিগুলোর এমন দশা যা অনেকটা সেই তারা মায়ের দারুমূর্তির মতো। সেই শিল্পান্বিত দশাতেই ভৈরবরা এখন সব ভৈরবীদের স্তন পান করছেন। কিন্তু যেটা আশ্চর্যের, নারী ও পুরুষ শরীরগুলোর এতে কোনও উন্মাদনা নেই! মনে হচ্ছে সত্যিই তাঁরা জাগতিক কামের বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। অস্পষ্ট অবয়বের দিকে আমার তাকিয়ে মনে হচ্ছে ছোট্ট শিশুর মতো করেই ভৈরবরা সব মাতৃদুগ্ধ পান করছেন। ভৈরবীদের প্রবল অস্পষ্টতায় আমার ধারণা তাঁদের মুখ এখন স্তনদানরত মায়ের মতোই। কোথাও যেন কোনও অশ্লীলতার ছবি নেই। পোশাকহীন রতিক্রিয়ার মানব-মানবী এতখানিই নৈসর্গিক হয়ে পড়েছেন আজ। মানুষের পার্থিবতা তাঁদের মধ্যে আর নেই। মনে হচ্ছে যেন তাঁরা এই পৃথিবীর কেউ নন।

মদ্য-মাংস-মৎস্যর পর মুদ্রার যোগভঙ্গি শুরু হয়ে গেছে। ভৈরবীরাও স্বীয় ভৈরবদের লিঙ্গপূজার মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। স্থূল এই ম-কার তত্ত্বেই সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনী উত্থাপনের মানস-ক্রিয়া শুরু হয়েছে যে তা একেবারে স্পষ্ট। পূরক-যোগ দ্বারা স্বীয় মূলধারপদ্মের বায়ুর সঙ্গে মনকে স্থাপন অনেকক্ষণই সম্পন্ন হয়েছে। গুহ্যদ্বার ও উপস্থের সংযোগস্থলকে আকুঞ্চিত করে নিয়ে ভৈরবরা সব যোনিমুদ্রাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন এটা ধরতে পারছি আমি। কুণ্ডলিনীশক্তিকর্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূত হয়ে রয়েছেন তাঁরা। ভৈরবীরাও তাঁর ব্যতিক্রম নন। শ্বাসক্রিয়া এবার একেবারে বন্ধ। নিশ্ছিদ্র নীরবতায় কারও শ্বাসেরই ওঠা-পড়া টের পাচ্ছি না আমি। বোধহয় কুম্ভক-যোগপ্রভাবে বায়ুর ক্রিয়া ঠিক রাখতে সকলেই ব্যস্ত। বুঝতে পারছি ভৈরবদের কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্না নাড়ির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মমার্গে গমন করছে। আবার মূলাধারপদ্মস্থ

ব্রহ্মযোনিমণ্ডলে বিপরীত ক্রিয়ায় ভৈরবীদের প্রত্যাগমনও শুরু হয়েছে। কুণ্ডলিনীশক্তির এইরূপ গমনাগমনে প্রাণায়ামে মাত্রাযোগ চলছে সকলেরই। পঞ্চচক্র ভেদ হতে থাকছে। ঠিক এ সময়ই বুঝতে পারছি আমি ভৈরবীদের শরীর পরিক্রমা করছেন ভৈরবরা। হাতের প্রক্রিয়া বলে দিচ্ছে যে ভৈরবরা সকলেই শ্বাসক্রিয়ার সমতার ভেতরই ভৈরবীদের স্তনমর্দন করছেন এখন। কিন্তু ভৈরবীমূর্তিগুলো সবই ধ্যানবিশিষ্ট হয়ে আছে। নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের মতো স্থির। কামোন্মাদনার শীৎকার এখানে শোনা যাচ্ছে না। তারই ভেতর আলিঙ্গন, স্পর্শন হচ্ছে দুই তরফ থেকেই। বোঝা যাচ্ছে ভৈরবীগণের নীচু হয়ে ভৈরব-শরীরের নিম্নাঙ্গ-তন্ময়তার লিঙ্গঘর্ষণ চলছে। দুই শরীরে শ্বাসক্রিয়া যথেষ্ট অব্যাহত। ভৈরবদের পিঠের পেশিসমূহ এবার ওঠা-পড়া যে করছে এটা আমি বুঝতে পারছি। আমি তো তাঁদের অদূরেই রয়েছি। তারণভোলার অবস্থানও এখন এখানেই। চক্রস্থ অবস্থানে থাকতে গেলে সঙ্গিনী ছাড়া নাকি কোনওভাবেই থাকা যায় না, তাই তারণেরও সেখানে স্থানসংকুলান হয়নি। আমার তো সেখানে প্রশ্নই ওঠে না। এতখানি কাছাকাছি, যে আসতে পেরেছি তার কারণ মূলত দুটো। এক, আমি বিশেষ কারও অনুমোদনে এসেছি, যিনি এঁদের সাধনমতের সম্মানীয়জন। দুই, আমার লেখালেখি ও জিজ্ঞাসু মনোভাব। না হলে এতখানি কাছ থেকে ভৈরবীচক্র দেখাও এত সহজ হত না। আর হবেই বা কেন? গুহ্য সাধনার তো কিছু বিধিনিষেধ আছেই। সাধনা তো সত্য। সেখানে সন্ধানী পরম বলে নিশ্চয়ই কিছু আছে। না হলে চূড়ান্ত এই কামক্রিয়ায় প্রকৃতি-পুরুষের কোনও হেলদোল নেই। এতখানি নিয়ন্ত্রিত তাঁরা, যেন মনে হচ্ছে ধ্যানে-যোগে মিশে আছেন। শরীরকে জাগাচ্ছেন পরস্পর দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষ অথচ সেখানে জাগরণ নেই; শিথিলতার আস্তরণ লেগে। এটা কী করে সম্ভব! এক সময় আমি তো বুঝতে পারছি ভৈরবীর যোনিবিকাশ চলছে। কেন-না তখন শ্বাসের ওঠা-পড়া অসমতায় চলছে। তারও প্রবল শব্দ হচ্ছে। আসলে নীরবতার মধ্যে সেই বায়ুক্রিয়ার শব্দকে প্রচণ্ড মনে হচ্ছিল। সমতায় শ্বাস যখন দুই শরীরে এল তখন ভৈরবদের কোলের ওপর ভৈরবীদের বসার প্রক্রিয়াটাই তো বলে দিচ্ছে যোনিমধ্যে লিঙ্গস্থাপন হয়ে গেছে। মূর্তিযুগল সব নিশ্চল। নিঃস্পন্দ। মনে হচ্ছে অল্পালোর ভেতর এঁদের দেখে ভারতীয় ভাস্কর্যের মৈথুন দৃশ্যকেই আমি এখানে দেখতে এসেছি। এমনই সব বিভ্রান্তির চতুরতা এখন আমার সামনে। মানুষের কামক্রিয়ার চূড়ান্ত মুখরতাকে মনে হচ্ছে অন্তর্জীবনের মায়াজাল। যেন কেউ জাদুকরী ছোঁয়া দিয়ে কামার্ত নারী-পুরুষদের কামকে আপন হৃদয়ের পদচারণা

দিয়ে সত্তার অনন্ত বিচরণপথের ঝিরি ঝিরি আলোর কণিকা প্রদান করেছেন। না হলে সকলের মুখেই এত এত নিশ্চল আচ্ছন্নতা কেন? আমি যেন সেই নিশ্চল মূর্তিগুলোর অবিচল আস্থাবান বিশ্বাসীসত্তাগুলোকে এইমাত্র ধরতে পেরেছি। আমার মনে হচ্ছে প্রকৃত বিন্দুসাধনায় কামের আত্মস্বাদ বোধহয় সত্যিই নেই। না হলে শরীরগুলোর মধ্যে সেইভাবে উদ্‌যাপন নেই কেন? প্রত্যেকটি খোলা শরীরই যেন অভিভাবকত্ব নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে পারছি গুরুর ইতিবাচক পন্থাতেই শরীরগুলো সব রচিত। ভুল যদি কিছু থেকে থাকে তা হল অভিভাবকত্বহীনভাবে শরীর চালনার। সে দোষ সাধনপথের কখনওই নয়। পথটা স্বচ্ছ হয়তো কখনওই নয়। দুই শরীরের মিলনকে অতীন্দ্রিয় ঐশ্বর্যে অভিসারী করে তোলা কামের ধারালো আঁশবটি দিয়ে অথচ সেখানে কামকে হাড়মাংস মন থেকে সম্পূর্ণ বের করে এনে অন্তরোপস্থিতি দিয়ে মহাজাগতিক করে নেওয়া আবার কামক্রিয়ায় প্রথাসিদ্ধতাকেই কৌশলে যোগে চিরনিস্তব্ধ করে দেওয়া তা কখনও সহজ কাজ নয়। দীর্ঘদিনের সাধনে সঠিক গুরুর অভিভাবকত্বে এটা যে কেবলমাত্র সম্ভব তা আমি আজ নিজের চোখেই দেখলাম।

চোখকে সার্থক করার পর স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজ সহ বাকি দুই ভৈরবরা আমাকে শাস্ত্রমান্য পথ দিয়েই বিন্দুসাধনার প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন। ভৈরবীরাও এ-কাজে থেমে থাকেননি। এঁদের সকলকেই আমার মনে হয়েছে প্রকৃত ভাবমার্গের মানুষ।

ফিরে আসবার সময় গিরি মহারাজ আমার হাতখানা চেপে ধরে বললেন, 'পরম আপনাকে দিলাম। আপনি এখন মনমতি দিয়ে কীভাবে তাকে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্ববশে আনবেন তা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার। জানি না আপনার লেখা কতখানি কামকে জয় করে শুদ্ধপ্রেম-সাধনার স্তরে পৌঁছবে। তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি আপনার অনুভূতিকে সুপথে চালিত করুন।'

আমি ফিরে আসছি। অর্চনা মা আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছেন। তাঁর চোখদুটি এখন সর্বব্যাপী কান্নার ধ্যান হয়ে আটকে যাচ্ছে আমার চোখে। সে-কান্না আত্মা ও দৈনন্দিনতার মধ্যে হু হু করে বইতে থাকে বোধহয়। আর অবশ্যই প্রাণকে আচ্ছন্ন করে। না হলে আমি কেন মাতৃভূমিকার সেই আধারকে এখনও কোনওভাবেই ভুলতে পারছি না। সেই পথের বাঁক পেরিয়ে এসেছি তাও তো প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল। আর সেটা তো খুব একটা ছোট সময়পর্ব একেবারেই নয়। তবু সেই চোখের আলো এখনও আমি নিজের একাত্মতার মধ্যে দেখতে পাই। শুনতে পাই

তাঁর সেই উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠের রেশ, যা তিনি সেদিন অবলীলায় রান্না করতে-করতেই গেয়ে শুনিয়েছিলেন :

আর ভুলালে ভুলবো না গো।
আমি অভয়পদ সার করেছি,
ভয়ে হেলবো দুল্‌বো না গো।।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে
বিষের কূপে উল্‌বো না গো।।
সুখ-দুঃখ ভেবে সমান।
মনের আগুন তুলবো না গো।।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে
মনের কথা খুলবো না গো।।
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে
প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো।।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ভুলবো না গো।।

গানের সঙ্গে সেই মাতলার ঢেউয়ের সঙ্গত এখনও যেন ছলকে-ছলকে পড়ে নিভৃত মনের দরজায়।

তন্ত্রে বিন্দুসাধনা বা আরও সঠিক অর্থে বললে বিন্দুসাধনা না বলে প্রকৃতিসাধনা কিংবা প্রকৃতি-মিলন বলা ভাল মূল আচার কখনই কিন্তু নয়। উপাস্য শক্তি পুজোর একটা অংশবিশেষ মাত্র। প্রকৃতি-সাধন তান্ত্রিকদের কখনওই মূল সাধনাঙ্গ নয়। তাঁদের সাধনার মূল কাঠামো হল চক্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া শক্তিকে। একেবারে প্রথম চক্রে যখন শক্তির বা প্রকৃতির জাগরণের আয়োজন শুরু হয় তখনই কিন্তু তান্ত্রিক মন্ত্র জপ শুরু করেন। ক্রিয়াগুলো এখানে সব অঙ্গ-রূপের অনুষ্ঠান। নারীকে তাঁরা শক্তির সাক্ষাৎ অংশস্বরূপ ভাবেন এবং নিজেকে শিব-ভাবে এনে কুণ্ডলিনীর দ্বারা উত্থিত শক্তিকে নারী বা প্রকৃতি মেনে তার সঙ্গে মিলে যেতে থাকেন। এটাই তাঁদের শিব আর শক্তির পূর্ণাঙ্গ মিলনযোগ। ভৈরবীচক্র হল গিয়ে সেই মিলনযোগেরই বাহ্যিক আচরণ মাত্র। তন্ত্রশাস্ত্র যেহেতু নারীকে অতি উচ্চ আসন দিয়েছে; বলছে যে নারী হলেন সাক্ষাৎ মহামায়ার অংশ, সেহেতু কুমারী, যুবতী পুজো তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র', 'কামধেনু তন্ত্র', 'নিরুত্তর তন্ত্র', 'গন্ধর্ব তন্ত্র', 'কামখ্যা তন্ত্র', 'মহাচীনাচার ক্রম', 'নির্বাণ তন্ত্র' সহ

ইত্যাদি যত প্রকার তন্ত্র আছে সব জায়গাতেই একই কথা প্রায় বলা হয়েছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রকৃতি হলেন শক্তিরূপা। নারী হলেন দশমহাবিদ্যার রূপ। নারী ছাড়া তন্ত্র বৃথা। সবখানেই নারীর নানা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর স্তুতি। বাংলায় তন্ত্রসাধনার জন্য কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটি তান্ত্রিকমহলে বিশেষ সমাদৃত। সেখানে এই প্রকৃতি সাধনার রূপটি নিয়ে আলোচনাকালে বলা হয়েছে বিভিন্ন অংশভাগে বিভিন্ন কথা। কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল সবখানেই প্রকৃতির জয়জয়কার। সাধক নিগমানন্দ সরস্বতীও 'তান্ত্রিকগুরু' শিরোনামে যে গ্রন্থটি লিখেছিলেন আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে, সেখানেও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বার্তাগুলো নিগমানন্দ নিজে সাধক হলেও, তন্ত্রসাধনা করলেও সেখানে তো তিনি আর সাধন-উপলব্ধি কিছু লিখে যাননি, যা লিখেছেন তা হল তন্ত্রশাস্ত্রগুলো মন্থন করে সারসমষ্টি। একে তন্ত্রের হ্যান্ড বুক হিসেবে কেবল দেখা যেতে পারে। তবে এটা ঠিক নিগমানন্দের সাধক জীবন নিয়ে কোনও সংশয়ই নেই। যতেষ্ট উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন তিনি। তাঁর জীবিতাবস্থাতেই তিনি নিজ হাতে সাধনাসংঘ আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ গড়ে যেতে পেরেছিলেন। যার নানা শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। তন্ত্রে নারীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় চিন্তা করার কথা; বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা ও মহাদুষ্টা নারীকেও দেবীরূপে নমস্কার করার কথা। তাঁদের প্রহার, নিন্দা, অপ্রিয় কর্মে ব্যবহার না করার কথা। স্ত্রীলোক দেবতা, স্ত্রীলোক জীবন, স্ত্রীলোককেই অলংকার জ্ঞান করার কথা। স্ত্রী-সঙ্গী হয়ে থাকার কথা। স্ত্রী-হস্তে ফুল তুলে, আনা জল দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে দেবতাকে নিবেদন করার কথা। তেমনই আবার বলা হয়েছে যে, শক্তিই শিব, শিবই শক্তি। যে এই শক্তিরূপ বুঝতে পারে না সে নারকী। বলা হয়েছে, রাত এক প্রহর গত হলে সাধক শরীরে ধূপগন্ধ মেখে সর্বাঙ্গে চন্দনচর্চিত করে— রক্তচন্দন, রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরে পান মুখে দিয়ে কুলগৃহে গিয়ে কুলনায়িকার অর্চনা করবে। ভৈরবীচক্রে বসা কোনও সাধককে আমি বিধিমতো কাজ করতে দেখিনি। ধূপগন্ধ, চন্দন— এ-সবের আয়োজন সেখানে দেখেছি ঠিকই, সেগুলো কিন্তু সবই ঘট স্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। পান খেতে আমি কোনও ভৈরব-ভৈরবীদের দেখিনি চক্রমধ্যে বসে। তাঁরা সব মদ-মাংস-মাছই খেয়েছেন। তবে কেউই স্বীয় হাতে খাননি কিন্তু। বিপরীত যুগলের হাত থেকেই এ-সব গ্রহণ করেছেন। বলা ভাল একে অপরকে খাইয়ে দিয়েছেন। কুলগৃহে গিয়ে সাধককে সাধনা করবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কিছু তন্ত্রে। তার কারণ বোধহয় তন্ত্রসাধিকার সামাজিক অবস্থান। কেন-না কিছু জায়গাতে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে,

কুলনায়িকা হবে নটী, বেশ্যা, রজকী। ব্রাহ্মণী কেবল ব্রাহ্মণের শক্তি হবে। আর এখানেই কিন্তু তন্ত্র তার উদারতা কিছুটা হলেও হারিয়ে বসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি তন্ত্র। বলা ভাল অবশ্যই এখানে তন্ত্রকারের সংস্কার কাজ করছে। ফেলে আসা পরম্পরাকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি। তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণ অনেকই আমি দেখেছি। তবে তাঁরা কেউই কিন্তু ভৈরবীসাধনে রত নন। তাঁরা নাদবিন্দুযোগ ও ব্রহ্মচর্য সাধনে তৎপর। শরীরস্থ বীর্য বা শুক্রধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রেখে ব্রহ্মচর্য পালনেই তাঁরা নিয়মনিষ্ঠ। মনে হয় 'পতঞ্জলদর্শন'-কেই তাঁরা সার করেছেন : 'বীর্যধারণং বহ্মাচর্য্যম্।' সুতরাং তাঁদের সাধনা থেকে মৈথুন কেটে বাদ গেছে। তবে সাধক কেবলমাত্র যোগপ্রণালীতে কুণ্ডলিনী উত্থাপনের মাধ্যমে যে প্রকৃতি-পুরুষযোগে সামিল হন সেখানে তাঁরা অবশ্য শিবের সঙ্গে মৈথুন করার কথা বলে থাকেন। কিন্তু সেই মৈথুন তো আর যুগল-সাধনার অঙ্গীভূত পর্যায় কখনওই নয়। সেই সাধনকে দুই শরীরের বিন্দুসাধনা না বলে বরং একেবারে সেই নাদবিন্দুযোগেই নিয়ে চলে যাওয়া ভাল।

সাধক বলছেন যে, সৃষ্টির আগে প্রকৃতি-পুরুষের তো কোনও মূর্তি বা অবয়ব ছিল না। যা ছিল তা প্রকৃতি-পুরুষমূর্তিহীন কেবল এক জ্যোতিমাত্র দশা। সৃষ্টির সূচনাকালে সেই সর্বব্যাপী জ্যোতিঃআত্মা অভেদভাবে নাদবিন্দুরূপে প্রকাশিত হন। এই নাদ ও বিন্দুকে সগুণ শিব-শক্তি হিসেবেই দেখছে শাস্ত্র : 'বিন্দু শিবাত্মকো শক্তিনার্দঃ'। বলা হচ্ছে, এই নাদবিন্দুযোগেই সৃষ্টিবিন্যাস হয়েছে : 'বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্ / সর্বভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া।' অর্থাৎ কি না, বিন্দুরূপ শিব ও রজরূপা শক্তি— এ দুইয়ের মিলন হলেই জড়রূপা ঈশ্বরের স্বশক্তি দ্বারা জীবের উৎপত্তি হয়। স্বাভাবিক কারণেই তাই রজকে মাতৃশক্তি ও বিন্দুকে পিতৃশক্তি বলা হচ্ছে। বিন্দু যে পুরুষরূপী, বীর্য তা তো আমাদের বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বিন্দুসাধনাকে তাই যদি পুরুষের সাধনা হিসেবে ব্যপ্ত করি আমি তাহলে নারীবাদীরা যদি চোখ রাঙান সেখানে আমার কিছু করার নেই। কেন-না বিন্দুসাধনা পুরুষেরই সাধনা। সেখানে নারীর স্থান সেই অর্থে নেই। মর্যাদা আছে। সম্মান আছে। তথাপি নারী তো আর ঊর্ধ্বরেতা দানে কখনও কোনওভাবে সক্ষম নন। কী সূক্ষ্ম কী স্থূলে— নারী যে রূপেই সাধনে রত হন না কেন তিনি বিন্দুধারণ তো করতে পারবেন না। সাধকের বিন্দুসাধনাকে তিনি সহায়তা প্রদান করতে পারেন মাত্র যুগল-সাধনার ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি তাঁর রজকে কখনওই মস্তিষ্কের সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়ে নিতে পারেন না। কী করে পারবেন! নারীর শারীরিক অ্যানাটমিই তা যে হতে দেবে না। সাধনমতে মূলাধারে সুপ্ত

অবস্থাতে বীর্য থাকে। সেই শক্তিরূপী বীর্যকে সাধক স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ পেরিয়ে এনে আজ্ঞা চক্রে বায়ুর লয়স্থানে এনে হাজির করেন। তার পর সহস্রারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটান। সহস্রারকে কেউ বলেন চক্র, কেউ বলেন আবার এটা কোনওভাবেই চক্রস্থান নয়। যটচক্র ভেদের পরই তো সাধক শক্তিরূপী কুণ্ডলিনী আজ্ঞা চক্রের উপরিভাগে সহস্রারে এনে ফেলেন। এখানেই তো মহানাদরূপে হু হু শূন্যতা। এই স্থানই শিবের। অনেকে বলেন একে পরম ব্যোমের স্থান। এই স্থানে গিয়ে যখন শক্তির মিলন হল তখন তো শিব শক্তিকে মৈথুনই করলেন না কি? তাই সহস্রারে এসে সাধকের শরীরের শক্তি শিবের সঙ্গে রমণ করে বলা হয়। আসলে যেটা এখানে হয় বায়ুর ক্রিয়ায় মূলধারস্থ সাধকের সেই সুপ্ত বীর্য যা আমরা সম্ভোগের সময় নারীর যোনিতে ফেলে দিই কিংবা হস্তমৈথুনেও বের করে আনি— সেই বীর্য এখানে শরীরের মধ্যকার তাপ ও বায়ুর চাপে একেবারে ঊর্ধ্বমুখে উঠে সহস্রারে গিয়ে পড়ে। আর এই প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে সাধকের বিন্দুসাধনা। স্থূল অর্থে সেখানে দুই শরীরের মিলনের সময় শ্বাসক্রিয়াকেই শিরোধার্য করে বীর্যকে স্বাভাবিক সম্ভোগের মতো শরীরে বাইরে বের করে না এনে সূক্ষ্ম সাধনার ক্রিয়াযোগকে সাঙ্গ করেই সহস্রারে ঠেলে উঠিয়ে দেওয়া হয়। পার্থক্য কেবল যুগল-সাধনে নাদবিন্দুযোগ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে শারীরিক মিলনকে অস্বীকার করে নয়। এখানে সাধকের ব্রহ্মচর্যের বালাই নেই কোনও। অনেকে অবশ্য বলবেন, 'নেই কেন'? বীর্যরক্ষাই তো ব্রহ্মচর্য-সাধনের মূল উদ্দেশ্য। এখানেও তো তা সাধিত হচ্ছে?' উত্তরে বলি, পুরোপুরি ব্রহ্মচর্য পালনে নারীগণকে পুরুষদিগের সাধনের অন্তরায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ভাগবত'-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন : 'আত্মবান ব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্ত্রী সঙ্গীগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভয়শূন্য দেশে একা অবস্থান করে আলস্য পরিত্যাগ করে সব সময় আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করবেন। কারণ স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীর সাহচর্যে তাঁর মনে যেরূপ ক্লেশ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন কোনও কিছুতেই তার কোনওরকম সম্ভাবনা নেই'— 'যোষিৎসঙ্গাদ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।' জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী শঙ্করাচার্য তাঁর 'মণিরত্নমালা'-তে প্রশ্নোত্তরাচ্ছলে সেই একই কথাই লিখেছেন : 'কিমত্র হেয়ং? কনকঞ্চ কান্তা।' অর্থাৎ কোন কোন বস্তু ত্যাগের যোগ্য? উত্তর হল, ধন ও স্ত্রী। সেখানে বলা হয়েছে যে, পুরুষের দৃশ্ছেদ্য বন্ধন স্ত্রী তাই রমণীপ্রসঙ্গ ত্যাগ অবশ্যই করতে হবে। স্ত্রীসম্ভোগের সুখ সম্যকরূপে পরিত্যাগের যোগ্য। নরকের দ্বার নারী। সুরার ন্যায় মানুষকে উন্মত্ত করে রাখে স্ত্রী। প্রশ্ন করা হয়েছে, এই জগতে বিজ্ঞ হতে মহাবিজ্ঞতম কে? উত্তরে বলা

হয়েছে, যাকে পিশাচী-রূপিণী নারী বঞ্চনা করতে পারেনি। তবে নারীগণের সাধনার অন্তরায় হিসেবে পুরুষদিগকেও তদ্রূপ হিসেবে বর্ণনা করেছে শাস্ত্র। শাস্ত্রকাররা কেবল পুরুষদিগের পক্ষপাতী এবং নারী-বিদ্বেষী তা তো নয়। কেন-না তাঁরাই তো আবার বর্ণনা করেছেন নারীদের দেবীরূপে। এমনকী পুরুষের শরীরেরও অর্ধাংশ হিসেবেও তাঁদের দেখানো হয়েছে। কেন-না নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই ব্রহ্মময় অস্তিত্ব বর্তমান। আর এই অস্তিত্ব আসে ব্রহ্মচর্যসাধনায়। যে সাধনার মূল লক্ষ্য ঊর্ধ্বরেতা হওয়া। তন্ত্রশাস্ত্রও সে কথা বলেছে ঠিকই : 'ঊর্ধ্বরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।' অর্থাৎ কিনা, যিনি ব্রহ্মচর্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ঊর্ধ্বরেতা হয়েছেন, তিনি মর্ত্যবাসী হয়েও মনুষ্যপদবাচ্য নন। তিনিই প্রকৃত দেবতা। কারণ : 'ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ'। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠা হলে বীর্যলাভ হয়। তাহলে কথা হচ্ছে নারীর বা সাধিকার ব্রহ্মচর্যব্রত পালিত হয় কীভাবে? তিনি তো আর ঊর্ধ্বরেতা হতে পারেন না? শাস্ত্র বলছে নারীর রজ সহস্রারে সুপ্ত অবস্থাতে থাকে আর তাঁর কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণে সেই সহস্রারের সুপ্ত রজ নীচে নেমে আর আসতে পারে না। সুতরাং সাধনযোগে তাঁর আর রজঃস্বলা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে যুগল-সাধনে কিছু ক্ষেত্রে নারীর রজঃস্বলাদশাই মিলনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ একেবারে স্পষ্ট নারীর ব্রহ্মচর্যত্ব এখানে আর কোনওভাবেই কিন্তু নেই। আমার প্রশ্ন পুরুষেরও সেইভাবে আছে কি? সম্ভোগাচার চলছে, তবে সেই আচারে যোগক্রিয়াকে সচল রেখে বীর্যকে কেবল সহস্রারের ব্রহ্মরন্ধ্র ঠেলে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর নারীর ব্রহ্মচর্যত্বদশা যদি এখানে থাকে তবে তিনি আর সহস্রারের রজকে মূলাধারে নেমে আসতে দিচ্ছেন না। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মচর্যের যে বিধি শাস্ত্রবিহিত— নারী ও পুরুষ দু'জনেই দু'জনেরর সাধনপক্ষের প্রধান অন্তরায়, তা এখানে রক্ষিত নয় কোনওভাবেই। কেন-না এখানে, যুগল-সাধনে তো নারী ছাড়া সাধন হবেই না। তন্ত্রে একক সাধন তো তবু আছে। আমি যেটা দেখেছি, ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিকগণই বেশি একক-সাধনে ব্রত। তা নারী ও পুরুষ, দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শাস্ত্রমতে চক্রোপযোগী 'কুলনায়িকা'কে বলা হয়েছে যে, হতে হবে নটী, বেশ্যা, রজকী। ভৈরবী-সাধনে ভৈরবদের সাধনসঙ্গিনী হিসেবে আমি যেসব ভৈরবী মায়েদের দেখা পেয়েছি, কথা বলেছি—সেসব মায়েরা কিন্তু কেউই উচ্চবর্ণজাত নন। বেশিরভাগই অন্ত্যজশ্রেণির। কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া। আমার অভিজ্ঞতা ভৈরবীরা প্রায় সকলেই অভাবতাড়িত হয়েই ভেকধারী হয়ে গিয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। স্বইচ্ছায় ভাবের আলো মেখে এ পথে এসেছেন এমন ভৈরবীদের সংখ্যা নগণ্য। বংশ পরম্পরায় ভৈরবী হয়েছেন আবার এমনি নজিরও

আমি দেখেছি। এ সব ক্ষেত্রে যেটা হয় মা প্রথমজীবনে সংসারী ছিলেন; পুত্রকন্যা নিয়ে পুরোদমে ঘরকন্যা সামলেছেন, তার পর ভাবাবেগে অন্তরলোকের ইশারায় ঘর ছেড়েছেন। আবার বিবাহবিচ্ছিন্না, নিপীড়িতা, নির্যাতিতা মহিলাদেরও এ পথে আসতে দেখেছি আমি। যৌনকর্মীরাও এখানে এসে জুটেছেন কেবল একটু অন্যভাবে বাঁচার আশায়— সে-সবও আমার নিজের কানেই শোনা। কিন্তু সব ক্ষেত্রই ব্যবহৃতা নারীর ছবিই দেখতে পেয়েছি কেবল তাঁদের মুখে। কিছু ব্যতিক্রম যেগুলো, সেগুলো সবই ভৈরব বা সাধকের সঠিক বোধিস্তরের বিনীত শ্রদ্ধাটি পাওয়ার গুণ। তবে তা বলা ভাল, 'দু' চারজনের কপালেই খালি জুটেছে। এখনও পর্যন্ত ভৈরবীদের যে ছবি আমি এঁকেছি সেখানে কেবল সেই সাধকের শুদ্ধ বসনের আরতির দীপটিই জ্বালানো। ভৈরবদের ক্ষেত্রেও কথাটি এখানে প্রযোজ্য। কিছু ভৈরবীদের 'আমি'-তে যে বিদ্যুতের ছোঁয়া আমি দেখেছি তা অনেকক্ষেত্রে জীবনে প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সকরুণ বেঁচে থাকার দীপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন-না ভৈরবীরা সব তন্ত্রাধারের আলো পেতে চেয়েছেন জীবনের অন্ধকারে বীতশ্রদ্ধ হয়েই। আর এখানে এসেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বুঝেছেন, যে আশ্রয়ে তাঁরা এসেছেন জীবন বাঁচাতে সেখানেও নারীর যৌন হেনস্থার গানখানি কম রমণীয় নয়। পুরুষের যৌনাচারের ভ্রষ্টাচারের ব্যাভিচারের দীর্ঘ উজ্জ্বল দুর্গতিময় পা ফেলবার জায়গাটি এখানেও বেশ প্রশস্তকর। সে-সব গল্পও প্রসঙ্গক্রমে আমি কিছু কিছু বলবই। কেন-না তন্ত্রে, নারী আগমনের ক্ষেত্রটি শাস্ত্রকাররা দেখিয়েছেন অসম্ভ্রমের, অমর্যাদার আখর হিসেবে। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়াও পুরুষ এখানে এসেছন কোন তুলসীমালাটি গলায় দিয়ে? আমি যা দেখেছি বেশিরভাগ ভৈরবও সমাজচ্যুত কর্মহীন হয়ে পড়ে ভেক নিয়েছেন শুধু। ধর্মের আলোকে মুখের দাড়িগোঁফকে আর মসৃণ করে না কামিয়ে, চুলের ঢলকে বাড়িয়ে নিয়ে তাকে তেলহীন রুক্ষ ময়লায় সজ্জিত করে নিয়ে কেবলই জীবনধারণ আর জীবিকার খোলসকে পাল্টে নেওয়া। সে-সব ধুলোময়লার ভেতর দিয়েও পথ হাঁটব আমরা। না হলেস মনের বেদনে চৈত্রমাসের হাওয়াতে লাগবে কীভাবে? তার আগে বিন্দুসাধনা বা ভৈরবীচক্র বা প্রকৃতি-মিলনের শাস্ত্রছবিকে শিরোধার্য করি।

বলা হয়েছে শাস্ত্রে 'কুলনায়িকা'-কে পুষ্পশয্যায় রেখে অর্চনা করার কথাও। শক্তিকে, প্রকৃতিকে বা নারীকে, নায়িকাকে দীক্ষিত হতেই হবে। শক্তি অদীক্ষিতা হলে তাঁর কানে মায়াবীজ দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। শক্তিকে এভাবে শোধন করার কথাও উল্লেখিত রয়েছে। বলা হয়েছে, শক্তির উপরে একাগ্রচিত্তে পঞ্চ ম-কারে পুজো সারার কথা। সিঁদুর দিয়ে শক্তির কপালে ত্রিকোণযন্ত্র আঁকার কথা। ত্রিকোণের মধ্যে গণেশ ও তিন কোণে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পুজো করা; শক্তির

দুই স্তনে বসন্ত ও মদনের পুজোও করতে বলা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দক্ষিণ চরণ থেকে মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত এবং মস্তিষ্কের বাম দিক থেকে বামপদ পর্যন্ত কামকলা ও সোমকলার অর্চনা করার কথা। শক্তি কুলাগারে তিনটি নাড়ির কথাও বলা হয়েছে তন্ত্রে। চান্দ্রী নাড়ি জল, সৌরী নাড়ি রজ, এবং আগ্নেয়ী নাড়ি বীজ বা বীর্য ক্ষরণ করে। এই তিন নাড়িকে অর্চনা করার কথাও বলা হয়েছে সেখানে। রক্তচন্দনচর্চিত মদনাগারে প্রথমে ভগমালা মন্ত্র উচ্চারণ করে ত্রি-তারা মন্ত্র পাঠ করে 'ঐ হ্রীং শ্রীং ঐ জং ব্লং ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐ হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্রে ধূপ দিয়ে অর্চনা করার কথা বলা হয়েছে। মদনাগার যে যোনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপরই বলা হয়েছে সাধকের নিজ লিঙ্গের অর্চনা করার কথা। সেখানে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলে নিজ লিঙ্গকে পুজোর উল্লেখ আছে। আমি যে চক্রপন্থা দেখেছি সেখানে কিন্তু সাধক স্বীয় লিঙ্গের পুজো করেননি। করেছেন সাধনসঙ্গিনী। আর পঞ্চ ম-কারের পুজোতে দু'জনেই সামিল হয়েছিলেন। মদ-মাংস-মাছ-মুদ্রা-মৈথুনে পুজোআর্চা বিপরীত ক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়েছিল। অর্থাৎ যুগল আচারের প্রয়োগই আমি দেখেছি। শাস্ত্রে সাধকের স্বীয় লিঙ্গপুজো সুসম্পন্ন করার পর আবার শক্তির অঙ্গে বা প্রকৃতি শরীরে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা ইত্যাদি দেবতার অর্চনার কথা বলা হচ্ছে। ত্রিকোণের মধ্যে অর্থাৎ আবার যোনির মধ্যে গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পুজো সারার মতো অবধূতেশ্বরী, কুব্জা, কামাখ্যা, সমরা, চক্রেশ্বরী, কালিকা দেবীর অর্চনা করার কথাও বলা হয়েছে। এর পর তাম্বুল বা পান খেতে দিয়ে তা অনুমতি নিয়ে কুলাগার অর্থাৎ কিনা নারীর যৌনাঙ্গ বা যোনিতে নিজ শিব বা লিঙ্গ নিক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে আবারও সেই যথোচিত মন্ত্রপাঠে। চক্রমধ্যে পান আমি কেবল ঘটে দিতে দেখেছি। নারী এবং পুরুষ কাউকেই খেতে দেখিনি। তবে নারীকে বা প্রকৃতিকে / শক্তিকে পান দেওয়ার অর্থ যৌনাঙ্গের চিহ্নরূপটি দেখিয়ে দেওয়ার স্মরণিকা ছাড়া আর কী। কেন-না তাঁকে পান খাওয়ার পরই পানসদৃশ যোনিতে নিজ লিঙ্গকে প্রবেশ ঘটানোর অনুমতি চাইছেন পুরুষ। আমি কিন্তু চক্রমধ্যের সেই তিন ভৈরবের কারওকেই যোনিতে লিঙ্গ স্থাপনের সময় অনুমতি চাইতে দেখিনি। তবে সকলেই এই চূড়ান্ত মিলনের আগে দেখেছি স্বীয় শক্তিকে একেবারে দণ্ডবৎ হয়েই প্রণাম করেছেন। এ প্রণামই হয়তো সেখানে প্রকারান্তরে অনুমতিপর্ব ছিল। সম্ভোগকালে মন্ত্রপাঠ তো আমিও শুনেছি। শাস্ত্রও তাই বলছে। সম্ভোগকালে অষ্টোত্তরশত ত্রিভুবনেশ্বরীর মন্ত্রজপ। পরে বীর্যপাত বা শুক্রত্যাগের সময় এই মন্ত্রই আবার 'স্বাহা' যোগে পাঠ। এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে বীর্যকে সাধক মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়ে নিচ্ছেন না। ক্ষরণ হচ্ছে তার। অর্থাৎ কিনা বিন্দুচ্যুতি ঘটছে। সাধক ঊর্ধ্বরেতা দান

করে তুলছেন না স্বীয় বীর্যকে। ভৈরবী-সাধনে তন্ত্র বীর্যরক্ষার পক্ষে সেইভাবে সায় দিচ্ছে না। আমি যে কটি ভৈরবীচক্র দেখেছি সেখানে সাধককে ঊর্ধ্বরেতা করে নিতেই দেখেছি বলে মনে হয়। দুই শরীরের প্রচণ্ড তন্ময়তায় আমার তাই-ই মনে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বীর্য যদি ক্ষরিত হত তাহলে ক্ষরিত সত্তার উন্মত্ততা ধরা পড়ত ঠিকই। তবে সেটা নাও হতে পারে। কেন-না বিন্দুধারণ কিন্তু তন্ত্রসাধনার মূল উদ্দেশ্য নয় কখনওই। তাই সাধক যদি তাঁর শুক্রক্ষরণ করেন সঙ্গিনীর যোনিমধ্যে সেই ক্ষরণের উন্মত্ততাও তিনি রোধে সক্ষম হবেন শ্বাসবায়ুকে কাজে লাগিয়ে। তখন শরীরে প্রবল স্থিতাবস্থা আসবে। কেন-না দেহমিলন তন্ত্রে যোগ মাত্রই। 'জ্ঞানার্ণব তন্ত্র'- এ বলা হয়েছে যে, শিবশক্তি যোগের নামই যোগ। এই যোগে শীৎকার মন্ত্র জপ, বাক্য স্তব, আলিঙ্গন কস্তুরী, চুম্বন, কর্পূর, নখক্ষত, দন্তক্ষত প্রভৃতি বহুবিধ কুসুম যখন তর্পণ ও বীজপাত বিসর্জন বোদ্ধব্য। অর্থাৎ এখানকার অঙ্গক্রিয়া আবার পুরোপুরি 'কামসূত্রম্' বাহিত হলেও বিন্দুধারণ পর্বটিই সাধনাসূচক। 'কুলার্ণব'-এ আবার আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দন, দর্শন, স্পর্শন, যোনিবিকাশ, লিঙ্গ ঘর্ষণ, প্রবেশ ও স্থাপন— শক্তিপুজোর এই নয় পুষ্পের বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনার সঙ্গে আমার দেখা অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মেলে বলে মনে হচ্ছে। 'জ্ঞানার্ণব'-এ বলা হয়েছে, কুলদ্রব্য অর্থাৎ শুক্রবস্তু হল শিবশক্তিময় জীবামৃত। তা পর-ব্রহ্মস্বরূপ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এই পর-ব্রহ্ম লাভ স্থূল মৈথুনেও যেমন সাধকের ঘটে থাকতে পারে, তেমনি সূক্ষ্মভাবে কেবলমাত্র কুণ্ডলিনীশক্তির সঙ্গে শিবের কাল্পনিক মিলনেও ঘটানো সম্ভব। তন্ত্রশাস্ত্র সে পথেরও তো নির্দেশ দিয়েছে। আমার যেটা মনে হয়েছে তন্ত্রে দুটো পথ। ভোগমোক্ষ পথ একটি। যে পথে স্থূল পঞ্চ ম-কার যোগ একান্ত প্রয়োজন। মদ, মাংস, মাছ দুই শরীরের মুদ্রা ও মৈথুন অবশ্যই প্রয়োজনীয়। অপর পথটি হল যোগমোক্ষ। সেখানকার সাধনাও পঞ্চ ম-কার যোগেই হয়, তবে সেখানে ব্যবহৃত হয় সূক্ষ্ম পঞ্চ ম-কার তত্ত্ব। সেই সাধনাও বিন্দুসাধনাতে সামিল। পথ ও পন্থা একই। তবে ভৈরবীসাধনের স্থূলক্রিয়া এখানে একেবারেই নিষিদ্ধ। তন্ত্রের এই পথই আমার মনে হয় সঠিক ব্রহ্মচর্যের পথ। যেখানে শাস্ত্রে বর্ণিত সেই পুরুষ-নারী একে অপরের সাধন-অন্তরায় একেবারে পুরোপুরি। কীভাবে এই যোগমোক্ষ সাধনাতে বিন্দুধারণ হয় সূক্ষ্মরূপের পঞ্চ ম-কার ব্যবহার করে তার কথাই এখন বলব।

তারাপীঠ থেকেও অনেকখানি ভেতরে চলে আসতে হল। বামাখ্যাপার বাড়ি আটলা পেরিয়েও যেতে হল খানিক। অটো থেকে নেমেও পথ তো আর কম নয়। গ্রামের মানুষ বলেন ভাল, 'ওই তো ওধার পানে চলে যান। বটগাছ, তার গায়েই

শীতল বাবার বাস। দেখবেন বটের গোড়ায় হেলান খেয়েই রয়েছেন। যাবেন আর কোথায়। এখন আর হাঁটাচলা করতে পারেন না বিশেষ। বয়স তো আর বাবার কম হল না বুঝলেন। দু'কুড়ি পেরিয়ে এখনও তাগড়।'

তা, সেই বটগাছ তো আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার গায়ে পৌঁছতে আমার প্রায় ঘণ্টা খানেক হাঁটতে হল। এ পথ অবশ্য গ্রামের লোকেদের কাছে কিছুই নয়। তবে আমরা যারা কেবল বাসে-ট্রামে অভ্যস্ত শহরবাসী, তাদের কাছে এ পথ হেঁটে পেরেনো কম কিছু নয়। ভাদ্রের রোদে রীতিমতো আমার শরীর থকে ঘাম ঝরছে।

যাই হোক, বটতলা গিয়ে আমার শরীর ঠান্ডা হল খানিক। একে তো ঝুরিনামা প্রাচীন বটের তল; এধার-ওধার ফেঁকড়ি বেরিয়ে সার সার চারাগাছ বেষ্টিত চত্বর, তারওপর সামনে শীতল বাবার প্রায় ধ্যানস্থ মূর্তি— এই যুগ্মতায় রুদ্র উগ্রতার শরীর যেন আমার এখন গৌরিক মাটি মাখানো। বাতাসের আঁচলে জীবনের মহাসঙ্গীত এখানে মনে হচ্ছে যেন শুনতে পাচ্ছি। এক মহা আনন্দের লীলা চলছে যেন ভেতরে। বলছে : 'আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে। / আমার মাঝারে নিজেকে করিয়া দান।'

শান্ত স্থির নীরব আনন্দের মতো এক সময় চোখ খুললেন শীতল বাবা।

বললাম, 'দয়াল বাবা পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার এখানে।'

আমার কথায় শরীরের ভাবগতির পরিবর্তন হল না কিছু শীতল বাবার। একই রকম নিমগ্ন তিনি, তবে আর ধ্যানস্থ নন।

আবার বললাম, 'অনেক আশা নিয়ে এসেছি। আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল আপনার কাছে। আপনাকে কি প্রশ্ন করতে পারি?'

কোনও উত্তর এল না আমার কথার। একই রকম তাঁর ভাবগতিক। দেখে মনে হচ্ছে কোনও অবগাঢ় মুহূর্ত থেকে ডুব দিয়ে সবে উঠেছেন। তাঁর এই মহাভাবের কিছু জেনে বুঝেই এখানে এসেছি। দয়াল বাবাই আমাকে বলেছিলেন, 'ওখানে যান। অভীষ্ট-লক্ষ্য একেবারে সার্থক হবে। কিছুই বলতে হবে না আপনাকে। শুধু চুপ করে বসে থাকবেন। বাবাই পড়ে নেবেন আপনার মন। সেইমতো উত্তর করবেন দেখবেন নিজেই।'

তবে কাঁহাতক আর এভাবে বসে থাকা যায়। ঘণ্টা খানেক তো হল। তাই দয়াল বাবার কথা মনে থাকলেও নীরবতা আমিই ভাঙলাম। তবুও কেন কাজ হল না। ঘড়ির কাঁটাই এগিয়ে যেতে থাকল। আরও ঘণ্টা খানিক প্রায় অতিবাহিত। বসে আছি আমি। দুপুর নামছে। চারধারে পাখপাখালির শব্দ গাঢ় হচ্ছে। এরই

মধ্যে ঘোমটা মাথায় এক বউ এসে হাজির হলেন বাবার সামনে। হাতে তাঁর প্রসাদী ভোগের থালা। রাখলেন বাবার সম্মুখে। বাবা তার থেকে বেশ কিছুটা প্রসাদী ভাত-তরকারি তুলে একটা কলাপাতায় মাখামাখি করে বসে বসেই বটতলার চাতালের একধারে ছড়াতে লাগলেন। দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল গাছগাছালি থেকে নানাবিধ পাখি। একটা ঘুঘু এসে বসল বাবার ডান কাঁধে। কানের ভেতর তার ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল। শালিকটা বাবার কোলের ওপর। কিছু দূরে আমি বসে। তবু ওরা যেন আমার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে বাবাময় হয়েই রইল। এরই ভেতর বাবা থালাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

বললেন, 'নে, প্রসাদ খা। দুপুরে মায়ের ভোগ হয়েছে। সেই কত দূর থেকে এসেছিস তুই। খা খা। তারপর তোর সব উত্তর দেবো কুলকুণ্ডলিনী বোঝাব। পঞ্চ ম-কার বুঝবি। তবে না মহাযোগের মহাদশায় যেতে পারবি।'

বললাম, 'কী আমি জানতে চাই বুঝতে পেরেছেন আপনি?'

— পারব না কেন রে? বিরহের অভিসার বইছে যে তোর শরীরময়, আমি দেখতে পাচ্ছি। নানা জিজ্ঞাসা তোর। মূল তো তার সহস্রারে গিয়ে পরমশিবের সঙ্গে মহামিলন। সেই মিলনানন্দ তুই জানতে চাস তো?

— হ্যাঁ। বিন্দুসাধনের সারবস্তুটি বুঝতে চাই আমি।

— ভোগের আগুনে পুড়ে এলি তুই। যুগল সাধনার রক্তরাগ থেকে সরে এসে দ্যাখ একক সাধনাও আসলে যুগলই রে। যুগলের জোড়ায় জোড়ায় যে লাবণ্য তা তো এখানেও রে। সব পথই আসলে তাঁকে পাওয়ার পথ।

বললাম, 'এক সাধনায় যুগল বলতে কি আপনি শরীরের শিব-শক্তির যোগকেই ইশারা করছেন'

বললেন, 'সে তো অনেক পরের ধাপ। আগে সারমর্মটি তোকে ধরতে হবে। নে, খেয়ে নে। তার পর সব হবে ক্ষণ।'

বললাম, 'আপনি খাবেন না?'

বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে। সেই সকাল থেকে খাচ্ছি রে। শরীরের অভ্যন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মার্গ থেকে জ্যোতির্ময়ী সব মায়ের খাবার। তুই যা খাচ্ছিস স্থূলে আমি তাই খেয়ে এতক্ষণ পেট ভরিয়েছি সূক্ষ্মে। নে নে খা খা। মা আমার থালা-বাটি-গ্লাস নিতে আসবে। আসলে এ সব হল গিয়ে সব পাখির আহার।'

— আমি এসে ভাগ বসালাম আর কী।

— দেহধর্মের পাখি তুই। মনের কুসুম বনের ডালে ডালে যেদিন ডাকতে পারবি, মনুষ্যজন্ম হবে তোর। না হলে ওতে আর তোতে কোনও প্রভেদ নেই। সবই জীবনের অকারণ কিচিরমিচির।

ইতিমধ্যেই আমার খাওয়া সম্পন্ন হয়েছে।

বাবা বললেন, 'ওদিকটা একটু উঠে যা। দেখ পাড়ার একটা এজমালি টিউকল আছে হাত-মুখ ধুয়ে নে। মন্দিরের দাওয়ায় মা বসে। বল এগুলো সব নিয়ে যেতে।

মুখ-হাত ধুয়ে আমি মন্দিরের দিকে গেলাম। কিছুই বলতে হল না আমায়। দেখলাম একঢাল ঘোমটার ছন্দ আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শীতল বাবার সিদ্ধাসনের দিকেই। আমি মায়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তখন।

পশ্চিমাকাশের কোথাও কোথাও এখন গোলা-সিঁদুরের মতো গাঢ় হয়ে আছে। গাছের সারির হালকা ফাঁকে আকাশের এই নতিস্বীকার অনেকখানি আমারই মতো বোধহয় সংকেতময়। বাবা সেই আলোর দর্শন খুঁজে দিতেই এখন আমার সামনে বসেছেন। আমার দশা এবার সেই আকাশেরই মতন।

বললেন, 'যজ্যুতেহসৌ যোগঃ— যা যুক্ত করে, মিলিত করে তাই হল গিয়ে যোগ। এই মিলন শিবের সঙ্গে জীবের, শিবের সঙ্গে শক্তির, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার, রামের সঙ্গে সীতার, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার। সবই তো যুগ্মতার মিলন। যুগল মিলন। জীবরূপী শরীরে শিব এল। এ যুগল সাধনা নয়?'

বললাম, 'এই সমন্বয় তো শ্রীমদ্ ভাগবতে রয়েছে।'

— শুধু শাস্ত্রে কেন রে? তোতে-আমাতে সমন্বয় নেই? জগৎ চলছে আমাদের অদ্বয় তত্ত্বে। এক থেকেই দুই। দুই থেকে বহু রে। ব্যাখ্যা কেবল পৃথক। যোগীগণ বলছেন পরমাত্মা, জ্ঞানীরা বলছেন ব্রহ্ম, ভক্তের কথায় ভগবান, সাধক তাই কী বলেন জানিস?

— কী?

— সাধকের কথা হল : এ আমি বহু হব জাগিল রে বাসনা। এই বাসনা যার মনে জেগেছে সেই-ই পৌঁছতে পারবে মহাযোগে।

— পৌঁছনোর পথ সেই ষট্‌চক্র ভেদ। তাই তো?

— এই ভেদ হয় যোগে। কুণ্ডলিনী যোগে। যোগ ভেতরেও আবার বাইরেও।

বললাম, 'ভেতরের যোগ তো বুঝলাম বাবা। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিক্রিয়া। কিন্তু বাইরের যোগটা কী?'

— মহাশক্তি যখন শরীরে বাইরের পঞ্চভূতকে ভেতরে টেনে এনে শরীরের মধ্যকার ক্ষিতিকে আশ্রয় করে তখন তপ্তভাব হয়। একই ভাবে জলকে আশ্রয় করলে ঠান্ডাভাব, জিভে মিষ্টিভাব, মনে মৃদুভাব আসে।

— চক্রে এই যে পঞ্চভূতের বাস এ তো কল্পনা মাত্র বাবা।

— কল্পনা কী রে! ও তো আধার। শরীরকে কেন্দ্র করে বায়ুর আশ্রয় গ্রহণে নানাপ্রকার শ্বাসের ক্রিয়া, অঙ্গ সঞ্চালন, স্পন্দন, মনের চঞ্চলতা। আর এই সবের ভেতর দিয়েই মনের শূন্যভাব আসে।

— তাহলে আপনি বলছেন শূন্যতা কেবল মনের?

— বোধ তো মন থেকেই আসবে রে। মন শূন্য বলেই শরীর শূন্য। কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে উত্থানকালে তার তেজেই তো দেহকে তপ্ত করছে, আবার মূলাধারে যখন সেই শক্তি ফিরে আসছে পুনরায় তখন অমৃতরূপ জল সমগ্র দেহকে সুশীতল করছে। কুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছচ্ছে তখনই সেখানকার স্নায়ু থেকে রস বের করে নিচ্ছে।

বললাম, 'এই রসকেই তো ব্রহ্মরন্ধ্রের সুধা বলবেন?'

— অবশ্যই। কেন নয়? এই রস হল আমাদের পঞ্চ ম-কারের প্রথম ম, মদ। মাংস সাধনা জিহ্বার সংযমের সাধনা।

— মৎস্য সেই নাড়ির খেলা। সত্ত্ব-রজ-তম। তাই তো?

— তুই যা বলছিস সব অর্জিত বিদ্যা বলছিস। তাই সহজ সূত্র মনে হচ্ছে তোর।

— তা ছাড়া কী?

— আসল কী জানিস বাপ মায়া থেকে সরে আসা। এই মায়াকে বধ না করতে পারলে কিছুতেই কিছু হবে না। মায়া বধ হলে নাড়ি জাগবে। তার জাগরণে অনুভূতি আসবে। সেই অনুভূতি মুখে বলা যায় না। মৈথুনের আনন্দ তুই জানতে চাইছিস?

— হ্যাঁ।

— সেই আনন্দ কীরকম করে তোকে বলব! তোর সে আনন্দ শিরস্থানের আনন্দ নয়। মূলাধারের আনন্দ। হস্তমৈথুনে বা স্ত্রীযোনি সম্ভোগে বীর্যকে ক্ষরণ করে এক আনন্দ লাভ। সেই অনুভূতিটা বল তো আমাকে?

— সেটা তো উত্তেজনার অনুভূতি।

— কীরকম সেটা শুনি?

— শরীরের ওঠাপড়ার...

— কেমন করে উঠছে আর পড়ছে শরীর। শুনি?

— সেই জাগরণ কীভাবে বলব আপনাকে? এই উত্তেজনার বহর কেবল উত্তেজিত মানুষই ধরতে পারবে।

— অ্যাই, অ্যাই, বাবা তো সার বলে ফেলেছ। বীর্যপতনের অনুভূতি তুমি ভাষাতে বলতে পারছ না, আমি ধারণের অনুভূতি বাপ কীভাবে বলব তোমায়?

— বীর্য কি সত্যি সত্যি মস্তিষ্কে উঠতে পারে বলে মনে হয় আপনার?

— এ বড় জটিল প্রশ্ন বাপ। নারী-পুরুষের স্থূল মৈথুনে আনন্দ আছে কেবল।

— সূক্ষ্মে শান্তি, পরম এই তো বলবেন আপনি?

— আসলে সবটাই আলোড়ন। জগতের আলোড়ন জগৎময় শরীরে এসে লাগছে।

— কীভাবে সেটা হচ্ছে বলে মনে হয় আপনার?

— মিলন বা পারস্পরিক সংযোগে স্থূল বিশ্ব জন্মাচ্ছে। মানবি তো তুই?

— হ্যাঁ, সেটা তো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ একটা।

— কেমন করে সেটা হচ্ছে? তোর অনুভূতি বল আমায়।

— এটা অনুভূতি কেন বাবা? এটা তো যোগ নয়। এটা প্রক্রিয়া। সিস্টেম একটা।

— শরীরটাও তো তাই বাপ। এত জানো তুমি এটা জানো না। সৃষ্টিতে যেমন সংযোগ ও ঘর্ষণ আছে যেটা সৃষ্টির মৈথুন, সেই মৈথুন শরীরেও হয়। আদি জগৎ তো মৈথুনরত জগৎ। সৃষ্টির আদিতে ছিল কেবল কাম।

বললাম, 'এ তো সেই শাস্ত্রের কচকচানি। শাস্ত্র বলছে : মৈথুন পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থত্যন্তকারণম্।'

বললেন, 'খুব কি ভুল বলেছে শাস্ত্র?'

— না তা ঠিক নয়।

— শোন, শক্তি অণু-পরমাণু সৃষ্টি করে। জগতে বিজ্ঞানে, শরীরে সব তাদের খেলা। এই খেলাকে বুঝতে হবে আগে। শক্তির সংযোগে যেমন জন্ম হচ্ছে অণু-পরমাণুর তেমন উল্টো টানে তো শূন্যে লয় হয়ে আসছে শক্তির। এই লয়টা বিশ্বে যেমন সত্য, শরীরে সত্য।

— তাহলে আপনি বলছেন যে বীর্য মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে?

— তোর মানতে অসুবিধে হলে তাকে শক্তি হিসেবে দেখ না। তাহলে তো আর বিন্দুসাধনা স্থূল অর্থে থাকছে না।

— স্থূল অর্থে আমিও তো যাচ্ছি না বাবা।

— যাচ্ছিস রে তুই। ভাল করে বোঝ আগে। আসল হচ্ছে শরীরে শক্তি ভরে সেই শক্তিকে শূন্যাবস্থানে এনে একীভূত হওয়া। এটাই হল আসল বিন্দুসাধনা। যেখানে বীর্য-রজ স্থূল বই কিছু নয়। তবে তোর মতের স্থূল সেই বস্তু শরীরের পারস্পরিক সংযোগে চুরমার হচ্ছে। তাকে ধারণও বলতে পারিস তুই। কী বলবি

সেটা তোর ব্যাপার। সাধকের ওতে তো মাথাব্যথা হওয়ার কথা নয়। আমাদের সাধন হল সন্ধিক্ষণ। তার সেই লগ্ন শান্ত স্তব্ধ মুগ্ধ অমৃত। সেই বিশ্বজগতের কথা এর বেশি তোকে মুখে আমি বলতে পারব না।

কথা থেমে যাওয়ার পর এখন বাবার এই সাধনপীঠে গোধূলির চরাচর। তার সেই রসিক উদাসীন ভূখণ্ডটি এই পরিবেশ-পরিস্থিতির ভেতর কেমন করে আমি তুলে ধরব! বাবার শরীর এখন গাছগাছালির ডাল। সন্ধ্যার নিস্তরঙ্গিত সঙ্গে ঘরে ফেরা পাখিদের সেখানে আনাগোনা। ওঠাবসা। সেখানে আমাদেরও কোনও স্থান নেই। সামাজিক জীবনের ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে সেই মহাশক্তিমান অখণ্ড মণ্ডলাকার কতটা বুঝব আমরা? এটা তো ঠিক, আচ্ছন্ন সত্তার সীমারেখা নিরূপণ করা যায় না। আমি কেবল তার বোধ, শান্তি, দুঃখ আঁকতে পারি। আমার জিজ্ঞাসাকে দিতে পারি সম্পর্কে-সিক্ত সেই মহাশূন্যতার আলোড়ন। প্রত্যক্ষ সংযোগে তার পুঙ্খানুপুঙ্খতা জানা একপ্রকার এখানে প্রায় দুর্জ্ঞেয় উপকরণ বাতুলতা মাত্র।

বিন্দুসাধনার অভিযাত্রাটি সঠিক পন্থায় অনুধাবন করতে হলে আমাদের কিন্তু সেই সদর্থক অর্থে 'যোগ' শব্দটির কাছেই ফিরে যেতে হবে। যার কথাই শীতল বাবা আমাকে বলেছিলেন। 'যোগ' কথাটির ব্যাকরণিক প্রয়োগও তাই, যা আমাকে বাবা বলেছিলেন সেদিন তাঁর সাধনপীঠে বসেই। শব্দটিকে বিশ্ববিশ্রুত হিসেবেই আমরা এখন দেখতে পারি অনায়াসে। আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতের যুজ্ ধাতু থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এই শব্দটি। যার অর্থ যুক্ত হওয়া। এই যুক্ত হওয়া আসলে আধ্যাত্ম জগতে সাধকের নিজ শরীরের প্রতিই একাত্মতা। যে একাত্মতার সাধক শরীরে বা সাধন শরীরে প্রথমে দুই সত্তাই অনুভূত হয়, তার পরই শরীর সেই দুই সত্তা বা শরীরের মিলনে একত্র হয়ে পড়ে। যেখানকার স্থির লক্ষ্যে বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সাধনবলে এই হিন্দু প্রত্যক্ষ করাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হিসেবে দেখা যেতে পারে। যেখানে পৌঁছতে হলে ষট্‌চক্র ভেদ আবশ্যিকই।

আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ডবাহী জ্যোতির্ময়ী একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মার্গের কথা বলে থাকেন দেহসাধক, যেখানে আছে এই ষট্‌চক্র। যা ভেদ হয় শক্তির মাধ্যমে। আধ্যাত্মবাদ শক্তিকে বলছে কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনী যেখানে থাকে তার নাম তার নাম মূলাধার চক্র বা পদ্ম। মেরুদণ্ডের শেষ-নিম্নপ্রান্তে আছে চতুর্দশযুক্ত মূলাধার পদ্ম বা চক্র। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে Root বা overies কিংবা Teste বলাও যেতে পারে। লিঙ্গমূলে ছয়দল বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান— Abdomen বা Pancreas gland। নাভিতে দশদল বিশিষ্ট মণিপুর— solar plexus বা Adrenals gland, হৃদয়ে দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহত পদ্ম বা চক্র— Heart বা Thymus

gland কণ্ঠে ষোড়শদল বিশিষ্ট বিশুদ্ধ চক্র— Throat বা Thyroid gland, ভ্রূমধ্যে দ্বিদল বিশিষ্ট আজ্ঞা চক্র— Third Eye বা Pineal gland আর সব চক্রের ওপরে শিরোদেশে সহস্রদল বিশিষ্ট সহস্রার চক্র— Crown বা Pituitary gland। জাগ্রতা কুণ্ডলিনী এক একটি চক্র ভেদ করতে সহস্রারের দিকে যেমন-যেমনভাবে অগ্রসর হতে থাকে তেমন-তেমনভাবে নানারকম অনুভবের আলো, রাজ্য, শক্তি বা বিভূতিলাভের রাজ্য ও ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে। এখন প্রশ্ন হল কীভাবে এই ক্রমবিকাশ পর্যায়টি সম্পন্ন হয় বা হয়ে থাকে?

প্রতিনিয়তই শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের শরীরের Potential energy-র যে মূল আধার, ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ বা যোগশাস্ত্র যাকে মূলাধার চক্র বা পদ্ম বলে অভিহিত করছে, সেখানে গিয়ে আঘাত করছে। এই আঘাত যে পরিমাণ শক্তি নিয়ে হচ্ছে সেই সমপরিমাণ ওয়েভলেংথ নিয়েই মস্তিষ্ক স্নায়ুতে আলোড়িত করছে। যার ফলে সেখানে যে ধরনের ওয়েভলেংথ হচ্ছে সেই ধরনের ওয়েভলেংথ সম্পন্ন দৃশ্যই সাধক দেখতে পাচ্ছেন। সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের যেটা হচ্ছে সেখানে ক্রিয়ার স্থূলতা বেশি থাকার ফলে আমরা স্থূল দৃশ্যই কেবল দেখতে পাই। যোগে মস্তিষ্ক-স্নায়ুতে যে ধরনের ওয়েভলেংথ তৈরি হয় সেখানে যোগীর পক্ষে কখনও স্থূল দৃশ্য দেখা সম্ভবপর নয়। সাধক যোগে দৃশ্যের সাধারণ স্থূলতাকে সূক্ষ্মান্তরে নিয়ে যেতে পারেন কুণ্ডলিনীকেই সঠিক মাত্রাতে জাগরণ ঘটিয়ে। সাধারণভাবে সকলের শরীরেই কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে থাকে মূলাধারে। সাধক বা যোগীর প্রাথমিক কাজই হল এই কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দেওয়া। চক্রগুলোর যেমন দলশোভিত রূপারূপের বর্ণনা রয়েছে যোগশাস্ত্রে, তেমনই সেখানে কুণ্ডলিনীকেও অতিজ্যোতির্ময়ী রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইনি সর্পাকৃতি, মূলাধার চক্রপদ্মে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করে নিয়ে গভীর নিদ্রাভিভূতা। কোটি বিদ্যুতের প্রভাযুক্ত, নানা বর্ণের জ্যোতি দ্বারা আচ্ছাদিতা, ইনি মিলনাকাঙ্ক্ষিনী এবং আদিরস বা শৃঙ্গারে উল্লাসিনী। সহস্রার হতে যে পরমামৃত ক্ষরণ হচ্ছে সেই কারণ পানের জন্য ইনি সতত আগ্রহশীলা। এই কারণ বা মদকে বিন্দুরূপেই দেখা ভাল। যুগল সাধনে যে বিন্দুধারণের কথা বলেন সাধক তাকে এই কারণ হিসেবেই দেখা যেতে পারে। যাকে হয়তো সাধক মূলাধারে সুপ্ত বীর্য বলে চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবিক কখনও বীর্যবস্তু মাথায় উঠে যেতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করা হয় দুইভাবে। প্রথমত, তাপের আধারে। তাপ মানে হল প্রাণায়াম। প্রাণায়াম মানেই হল শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। যোগশাস্ত্র রেচক-কুম্ভক-পূরক প্রাণায়ামের কথা বলেছে। দ্বিতীয়ত, জপের দ্বারা। এ ক্ষেত্রে সাধককে জপ করতে হয় বিশেষ বিশেষ কিছু মন্ত্র, যে মন্ত্রগুলোকে জপ করতে

হয় নির্দিষ্ট সংখ্যায় এবং অবশ্যই নির্দিষ্ট নিয়মেই। দিনরাতের বিশেষ এক সময়ে করতে হয় এই জপ। জপের সময় মানসচক্ষে সবসময়ই ভাসিয়ে রাখতে হবে বীজমন্ত্রের দেবরূপ। কুণ্ডলিনী জেগে উঠলে প্রথমে গিয়ে ওঠে মূলাধারে। সেখান থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠানকে চক্র না ভেবে নিজের স্থান হিসেবেও দেখা যেতে পারে। তার পরই এই নিজের স্থান স্বাধিষ্ঠানে শক্তি বা কুণ্ডলিনী এলেই সাধক তাকে চেষ্টা করতে থাকেন ঠেলে মণিপুরে তুলে দিতে। বলা হয় আলোর স্থান হল গিয়ে মণিপুর। অগ্নিদেবের স্থান সাধক এই চক্রপদ্মে কল্পনা করেন। বায়ুর ক্রিয়া যথার্থ শুরু হয় স্বাধিষ্ঠানে। তাই স্বাধিষ্ঠানকে বায়ুর স্থান বলা হয়। মূলাধার থেকেই শুরু হয় যোগ বা আধ্যাত্মপথের পৃথিবী। তাই বোধহয় একে পৃথ্বীমণ্ডল হিসেবেই দেখে থাকেন সাধক। মণিপুরের পর শক্তি গিয়ে ওঠে অনাহতে। এখানে শব্দ শুরু হয়। তবে এই শব্দ কিন্তু কোনওভাবেই সংঘর্ষজনিত শব্দ নয়। শক্তিই এখানে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে শব্দরূপে। অনাহত থেকে শক্তি ওঠে বিশুদ্ধ চক্রপদ্মে। সাধক বলেন, এখানে আছে সুনির্মল পবিত্রতা। এ অঞ্চল গঠিত সাত্ত্বিক উপাদানে। অর্থাৎ কিনা শরীরের সত্ত্বগুণ। কুণ্ডলিনীকে তখনই নিদ্রারতা হিসেবে দেখা হয় যখন মানুষ তার অহং সর্বস্ব ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখেন। সাধক বলেন, অহংকারের স্তর, আমিবোধ বা অহং-এর নাশ হতে থাকে কুণ্ডলিনী জাগতে থাকলেই। ঠিক যেমন বিশুদ্ধ চক্রে এসে শক্তি সত্ত্বগুণকে নষ্ট করে দেয়। সত্ত্বগুণ নষ্টের পরই শক্তি গিয়ে ওঠে আজ্ঞা চক্রপদ্মে। এখানে এলে প্রথম প্রথম গড়ে ওঠে যথার্থ জ্ঞান সম্পর্কে অস্পষ্ট কিছু ধারণা। কুণ্ডলিনী এখানে ওঠাতে পারলেই সাধক সেই শক্তিরূপকে দেখে থাকেন অনেকটা সেই বিদ্যুৎচমকের মতো। মূলাধার থেকে আজ্ঞা চক্রপদ্ম পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াটা হল কুণ্ডলিনী অগ্রগতির প্রাইমারি স্তর। মণিপুর পর্যন্ত অবশ্যই অনেকে কুণ্ডলিনী জাগাতে পারেন। শক্তির উর্ধ্বগতি অনাহতে গিয়ে দাঁড় করানোই কঠিন কাজ। আগম শাস্ত্র তাই অনাহতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহাবিশ্বে যেমন সৃষ্টির স্তর আছে তেমনই শরীরবিশ্বে ছয় চক্রকে ছয়টি প্রতীক হিসেবে দেখছে যোগশাস্ত্র। বলা হচ্ছে ছটি চক্রে রয়েছে একটি বিশেষ গুণ। এক একজন নিয়ন্ত্রক বিশেষ দেবতার কল্পনাও এখানে রাখা হয়েছে। যেমন, মূলাধার স্বাধিষ্ঠানের গুণ তম, নিয়ন্ত্রক দেবতা অগ্নি এবং এই দুই চক্রের প্রথমটি ভুবর্লোক ও দ্বিতীয়টি স্বর্গালোকের অধীন। মণিপুর অনাহতের গুণ হল গিয়ে রজ। নিয়ন্ত্রণ দেবতা সূর্য। মণিপুর হল মহর্লোক এবং অনাহত জনর্লোক। বিশুদ্ধ আজ্ঞায় রয়েছে সত্ত্বগুণ। নিয়ন্ত্রক দেবতা চন্দ্র। প্রথমটি তপর্লোক ও দ্বিতীয়টি সত্যর্লোকের অন্তর্গত। হিন্দু শাস্ত্র বলছে যে,

আত্মাকে আচ্ছন্ন করে আছে ছয়টি দেহ বা কোষ। এই স্থূল দেহের ওপরে আছে সূক্ষ্ম কোষ আর তার ওপরে স্বভাবতই আরও সূক্ষ্মতর কোষ। এইভাবে সূক্ষ্মতম পর্যায়ে পাঁচটি কোষের কথাও বলা হচ্ছে। স্থূল দেহের নাশ হলে থাকছে সূক্ষ্ম দেহ। সূক্ষ্ম দেহের নাশ হলে সূক্ষ্মতর দেহ। তাহলে এভাবে ভাবলে যেটা দাঁড়াচ্ছে, সাধক তাঁর কুণ্ডলিনীশক্তিকে যে পর্যায়ে ওঠাতে পারেন, তিনি সেই পর্যায়ে সূক্ষ্ম দেহধারণ করে সেই লোকের ফলভোগ করতে পারেন। 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ' সূক্ষ্ম দেহের পঞ্চকোষের কথা বলেছে। এই কোষগুলো হল অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। প্রথম তিন কোষের শরীরকে বলা হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর। বাকি দুই কোষের শরীরকে বলা হচ্ছে কারণ শরীর। এখন কথা হচ্ছে উপনিষদের এই ব্যাখ্যা কতটা বা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য? বিজানী ডাক্তাররা অবশ্য বলছেন যে, দেহ তন্নতন্ন করে খুঁজেও যে নাড়িপথ দিয়ে কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রারে উঠে যায় তার সন্ধান তাঁরা কোনওভাবে পাননি। তবে যোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্র বলছে যে, এইসব নাড়িগুলো সূক্ষ্মদেহের নাড়ি। স্থূলে তাদের দেখা পাওয়া অসম্ভব। কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি কেবল সূক্ষ্ম দেহেই সম্ভব। সুতরাং স্থূল দেহে তার সন্ধান মিলবেই বা কীভাবে? তবে আমার যেটা মনে হয় শাস্ত্রের এই বিষয়আশয় কিন্তু কোনওভাবেই বুজরুকির নয়। আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে যে শক্তি তার দশ ভাগ মতোই আমরা কিন্তু দৈনন্দিন কাজ ও চলাফেরায় ব্যবহার করতে পারি। বাকি নব্বই ভাগই জমা থাকে শরীরে। এই শক্তিই হল কুণ্ডলিনী— যার ব্যবহার করতে আমরা পারি না। যোগীরা এর ব্যবহার করেন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। সৃষ্টিতে যেমন সূক্ষ্ম ব্যোম থেকে ক্ষিতি পর্যন্ত পঞ্চভূতের উপাদান আছে, তেমন শরীরেও এর মান্যতা দিচ্ছেন সাধক। বলা হচ্ছে সাধনায় বিশুদ্ধ চক্র পার হলে কুণ্ডলিনী এই পঞ্চতত্ত্বের সীমানাকেও অতিক্রম করে ফেলে। মূলাধারে ক্ষিতি, স্বাধিষ্ঠানে জল, মণিপুরে তেজ, অনাহতে বায়ু ও বিশুদ্ধে ব্যোম। এই পাঁচ চক্র পার হলে শরীর নাশ হয়, তখন আর সৃষ্টি থাকে না। পঞ্চতত্ত্বই নেই তবে আর জগৎ কী? প্রচণ্ড গতিসম্পন্না কুণ্ডলিনী যখন এই সীমার বন্ধন ছিঁড়ে দেয় তখন সৃষ্টির উৎসে এসে পৌঁছয় শরীর। সৃষ্টির উৎসে তিনটি অবস্থা। এক, সৃষ্টির আদি প্লাজমা বা অপরিচ্ছন্ন জ্যোতি। দুই, ইদম ব্যতীত অহং বোধ বা স্বচ্ছ দর্পণ অবস্থা। তিন, পরম শূন্যতা। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ একেই বলছে সৎ, চিৎ, আনন্দ। আসলে যেটা হয়, আজ্ঞা চক্র থেকে সহস্রারে গিয়ে যখন পৌঁছয় কুণ্ডলিনী তখন আর শরীরে কোনওরকমের স্বতন্ত্র সত্তাবোধই থাকে না। ব্যক্তিসত্তা তখন গিয়ে বিশ্বসত্তাতে মিলিত হয়। আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত যখন কুণ্ডলিনী

অবস্থান করে তখন তো আর শরীর যুগল হয়ে থাকে না। শক্তি ও শিব আলাদা হয়ে থাকে। সহস্রারের কূটস্থানে যখন কুণ্ডলিনী পৌঁছয় তখন শরীর যুগল হয়। অর্ধনারীশ্বর হয়। শিব-শক্তির মিলন হয়। একীভূত সেই অস্তিত্বকেই নির্বিকল্প হিসেবে ভাবা যেতে পারে। এই চরম অবস্থাকে সূক্ষ্মস্তরে বিন্দুসাধনা হিসেবে দেখা যেতেই পারে। তবে ক'জন সাধক আর পারেন এই স্তরে পৌঁছে যেতে। হাতে গোনা কয়েকজনেরই কেবল এই দশা অনুভূত হয়। না হলে তো বেশির ভাগ সাধক কিছু চক্রকে পার করে অষ্ট সিদ্ধি নিয়ে বসে থাকেন। এই অষ্ট সিদ্ধি হল আট ধরনের পাশ। প্রথম সিদ্ধি হল অণিমা। সাধক তাঁর শরীর অণুর মতো ক্ষুদ্র করে নিতে পারেন। দ্বিতীয় মহিমা— বৃহৎ হয়ে যেতে পারেন তিনি। তৃতীয় সিদ্ধি লঘিমা। তুলোর মতো হাল্কা হতে পারেন তিনি। চতুর্থ হল গরিমা— ভারী করে ফেলা শরীর। পঞ্চম হল প্রাপ্তি। ইচ্ছেমতো কিছু লাভ করার ক্ষমতা। ষষ্ঠ প্রকাম্য। ইচ্ছেমতো যে-কোনও বস্তু এনে দেওয়ার ক্ষমতা। সপ্তম ইশিত্ব। ইচ্ছেমতো সব কিছুর উপর প্রাধান্য স্থাপনের ক্ষমতা। অষ্টম হল ইচ্ছেমতো যাকে-তাকে বশ করার ক্ষমতা। আমি অনেকেই অষ্ট সিদ্ধি রপ্তসাধক কিংবা সাধিকাকে দেখেছি। তারাপীঠে ছিপছিপে কালা বাবাকে দশ জন মিলেও আসন থেকে তুলতে পারেনি। ভরা নদীর ওপারে দেখেছি যোগমায়া ভৈরবীকে। এপারে আমি। নিমেষেই তিনি এপারে। দয়াল বাবা আমাকে শ্মশানে বসেই লুচি-তরকারি খাইয়েছেন। মানদা মা আমার নামধাম, ইচ্ছে, কামনা সব বলে দিয়েছেন ঠিকঠাক। ভৈরবীচক্রে আমি বশ হয়ে এমন পড়েছিলাম যে বুঝে উঠতে পারিনি তাঁরা কী সব ক্রিয়াকর্ম করছেন। এইসব কর্মে কোনও অলৌকিক কিছু নেই। যে কেউই আমরা একটু রপ্ত করতে পারলেই কুণ্ডলিনী যোগে এসব ভেলকি অনায়াসে দেখাতে পারব। আর এসব করেই কিছু কিছু সাধক-সাধিকা মান-প্রতিপত্তি-অর্থ করে নিয়ে মন্দির-আশ্রম-আখড়া বানিয়ে বৈভবে জীবনধারণ করছেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগে তাঁরা সব বছরের পর বছর করতে গিয়েই সিদ্ধি হারিয়ে বসছেন। ঠিকঠাক মেলাতে পারছেন না আর শেষদিকে। তখন প্রথমাবস্থায় ভক্তশিষ্যের প্রহার জুটছে। ঠাঁই নাড়া হতে হচ্ছে। হাজতবাসও হচ্ছে জাঁদরেল ভক্তের দাপটে অনেক সময়। এভাবেই কিছুদূর কুণ্ডলিনী জাগিয়েও তাঁরা একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়ে ভেক নিয়ে শেষে সমাজের অনুকম্পায় বেঁচে আছেন। তন্ত্রধারী বাবা জ্যোতিষ করছেন। জড়িবুটি দিচ্ছেন আর সাধনার নামে যৌনব্যবসা পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। এসবও আমার নিজের চর্মচক্ষে দেখা। শিমুরালি স্টেশনে নেমে কালীগঞ্জ থেকেও খানিকটা ভেতরে একেবারে ভাগীরথী নদীর ধারে সুধাসুন্দরী ভৈরবীর

কাছে গেছি। যাওয়া মাত্র তিনি আমার শরীর নিয়ো পড়লেন। বললেন, 'আপনের তো জোয়ার গতর। এ ঘরে করণ খেলে ভাল। আমার এই ভৈরবটারও এককালে আপনের মতো গতর ছিল, মদে খেলো সব— তা সে বলে কী ঢাকাচাপা দিয়ে কোতে। নেকানেকি হবে তো। আমি বলি তা হোক। আমার আব্রুর বালাই নাই। এ শরীরে কত মানুষ কাত করেছি।'

সুধাসুন্দরীর কাছ থেকে কোনওমতে পালিয়ো বেঁচেছি আমি। তিনি আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কথা কিছুদুর এগোতে তাঁর বুকে হাত রাখতে। তাতেই না কি আমি বুঝতে পারব যে, সেখানে কেমন নদী বইছে। তিনি আমাকে এও বলেছিলেন যে, বীর্যধারণ আমাকে তিনি নিজে হাতে শিখিয়ে দেবেন। এতে যার-তার সঙ্গে যখন-তখন শোয়া যাবে। বাচ্চা হওয়ারও ভয় থাকবে না। একসময় তিনি চরম হতাশায় বললেন, 'বিন্দু ধরতে দম লাগে। এ ভৈরব এখন পারেন না। শালার দম নেই। সাধনে আসবেন। সব শেখায়ে দেবো আপনেরে। চলেন পালাই। আশ্রম বানাই।' একবার এক ভৈরব-ভৈরবী দুজনেই আমাকে শেযে বলে বসলেন, 'আপন শক্তিরে এখানে নিয়ে আসবেন। মা আপনার শক্তির দম-শ্বাস শেখাবেন। আমি আপনারে। কত লোকে শিখতে আসে।' বুঝতে আমার একটু অসুবিধে হল না শেখার নামে এখানে শরীর ব্যবসা আসলে চলে রমরমিয়ে। আর এক ভৈরবী আমাকে আরও অবাক করে বলেছিলেন, তাঁদের দেহমিলনের ছবি পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায় অনেকে। এ ছবি নাকি ভালো বিক্রি হয়। লোকে দেখেদুখে শেখে। এভাবেই যুগল সাধনায় শরীরী ব্যবসা, নীল ছবির ব্যবসা চলছে রমরম করে প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে। অনেক সময় নিজে দেখেছি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা পর্যন্ত গিয়ে উঠেছেন তান্ত্রিকদের ডেরায়। মদ-গাঁজা-চরসের প্রাপ্য হিস্যা বুঝে নিতে, আবার মেয়েমানুষের লোভে। তন্ত্রসাধনার এও এক দিক। যেদিকে বিন্দুধারণের নামগন্ধে ম ম করছে কামগন্ধ, ব্যভিচার, যৌনবৃত্তি আর চোরাকারবার। তবে তার আলোর দিকটি গ্রীষ্মজীবনের বাইরে নক্ষত্রে নক্ষত্রে আকাশ ঝিকমিক।

দুই শরীরের সাধনায় আরও এক আকাশের সন্ধানে এখন আমরা পা বাড়াব। গুটিগুটি এগোলেই সেখানে শুনতে পারব গুবগবি আর একতারার আওয়াজ। গান হচ্ছে :

মেয়ে অমূল্য রতন সাধনার ধন
যে করে ভজন কাছে রয় সদায়।
যত যোগী ঋষি মুনী মহা মহাজ্ঞানী
মেয়ের সঙ্গ ছেড়ে পড়েছে দশায়।

প্রকৃতি সাধনার মূল উদ্দেশ্য বিন্দুধারণ

রিকশা থেকে নেমেও বেশ কিছু পথ হাঁটতে হল। একজনাকে জিজ্ঞাসা করতেই এক বাক্যেই একেবারে ঠিকানার হদিশ দিয়ে দিলেন। নরম ধানের খেত। দু'পাশে পুকুর। শান বাঁধানো বটের তলায় শিবঠাকুর। মনসাতলা। এসব পেরিয়ে শেষে পৌঁছলাম শীতল ঠাকুরের আশ্রম। তবে একে আশ্রম না বলে ছড়ানো গেরস্থালির ছবি বলাই ভাল। নিকোনো উঠোন। চট দিয়ে ঘেরা শৌচালয়। সামনে ভাঙা প্লাস্টিকের বালতিতে পিঁড়ি দিয়ে জল ঢাকা। হলুদ এক মগ উল্টোনো। দাওয়ায় রান্নার উনুন। উঁচু মাটির এক অবয়বে কুপি রয়েছে। অনেকে একে আবার লম্ফও বলেন। উনুনের উপর কালি লাগানো মাটির হাঁড়ি বসানো। তবে আঁচ নেই। দরজার গোড়ায় বসে ধবধবে সাদা চৌকিদার বেড়াল পাহারা দিচ্ছে। আমাকে দেখেই ও ঘরে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন সাধিকা ভৈরবী। বুঝলাম, চৌকিদারই খবর করেছে। মুখে কোনও কথা না বলেও বুঝিয়ে দিতে পেরেছে নতুন মানুষের আগমন। তবে নতুনই বটে। এ তল্লাটে প্রথম আমি। আগে কোনওদিন আসিনি গেদে লাইনে। মাজদিয়া থেকে নেমেও বেশ ভেতরের জায়গা। তবে বহুখ্যাত শিবনিবাস যেদিকে, সেদিকটা হৈ আশ্রম নয়। লোকে বলেন শীতল ঠাকুরের আশ্রম। আমার মতে, একে আশ্রম না বলে আস্তানা বলাই শ্রেয়। সে যাই হোক। বেলাবেলি পৌঁছে গেছি। আগে অবশ লোক মারফত খবর পৌঁছেছিল।

ভৈরবী আমাকে সাদর সম্ভাষণ করলেন।

বললেন— আসেন বসেন। হেথায় বসেন বাবা।

বসলাম ঘরের মাটির মেঝেতে। খেতুর পাতা দিয়ে বোনা চাটাইয়ের ওপর। যার চারধারে কাপড়ের পাড়ের ওপর নকশা তোলা। নানা পদ্মচক্রের ছবি। বুঝলাম এসবই ভৈরবীর হাতে করা। অনেকদিনই একসঙ্গে সাধনভজন করছেন শীতল ঠাকুর আর সাধিকা ভৈরবী। পাশাপাশির খবর, একযুগ হতে চলল এঁদের একসঙ্গে দেখছেন। তবে মাঝেমাঝেই উধাও হয়ে যান। তারপর আবার একদিন

ফিরেও আসেন। উঠোনে আগাছা জন্মায়। দাওয়ায় পিঁপড়ে মাটি তোলে। সেসব ঝেরে-ঝুরে পরিস্কার করে আবারও বসবাস। জীবনধারণ। তখন আবার খবর পেয়ে কিছু মানুষজন আসেন। ভক্তশিষ্য জোটে। অমাবস্যার বিশেষ তিথিযোগ পরলে এখানেই যাগযজ্ঞ হয়। তান্ত্রিক, সাধু, ভৈরবীদেরও জমায়েত হয় কিছু। আজ এসবের কিছুই নেই। শুনশান ফাঁকা আশ্রম। শীতল ঠাকুরের আশ্রম।

বললাম— শীতল ঠাকুর নেই?

মুখে একগাল হাসি খেলিয়ে ভৈরবী উত্তর দিলেন, আছেন, আপনে যে বলে-কয়ে এয়েছেন এত দূর পানে। সরে পড়লে হবে। পাটিয়েচি একটু দুকানে। এতদূর থেকে এলেন একটু জল-বাতাসা তো দিতে হবে না কি! তার ওপর মান্যি-গন্যি লোক। সমাজে ভক্তি-ছ্রদ্ধা আছে।

বললাম— ওসবের দরকার নেই কোনও।

— তা বললে কী হয়! অতিথি হলেন নারায়ণ। সাক্ষাৎ আজ হেতায়। এতদূর পানে এয়েছেন!

বললাম— শুনেছি তো আপনারা গৃহজীবনে বিশ্বাস করেন না। তাহলে আর গৃহকল্যাণের বাণীবন্দনা কেন?

ভৈরবী হাসলেন। ঠোঁট দুটি রাঙা। দাঁতে সেই ছটার ছোপ। খুব পান খান দেখে বোঝাই যাচ্ছে। তবে এখন মুখে কোনও পান নেই। গৃহস্থ ঘরের বউয়েরই মতো রূপ। কিন্তু কপালে লেপ্টানো সিঁদুর, পলাভর্তি হাত, গলায় গোটা কতক রুদ্রাক্ষ ও অন্যান্য নানা মালার দাপট, চুলে ভারী জটা বলে দিচ্ছে যে তিনি গৃহস্থ বউ নন। ভৈরবী-মাতাজির যোগসাজশের বৈভবকে সাঙ্গ করে বসে আছেন।

বললেন— নারায়ণ গৃহে থাকেন এডাই তো ভুল বুঝলেন। ডাহা এক মিথ্যা। এই মিথ্যার রাজপাটে আমরা সব বাস করতেছি। সত্যটারে ধরতে পারলাম না।

বললাম— সত্যটা তবে কী? নারায়ণ থাকেন কোথায়? স্বর্গরাজ্যের অলীক কল্পনায়?

— এইডাও একখান ভুল। তবে দোষ আপনের লয়। মনুষ্যের জেবন তো ভুলে ভরা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীসের ভুল?

ভৈরবী বললেন, নারায়ণ থাকার কথা শরীলে। তিনি তো বুঝবার জিনিস। অতিথি আইলে তারে লইয়া যে মাইনষের কাজ— জল-বাতাসা দেওয়ান তা তো শরীলের দানাপানি, ভগবান কী আর গৃহে থাহেন! থাহেন দেহে। দেহ-আনুগত্য না আইলে ভগবানে উৎসুক্য আইব ক্যামনে আপনের? দেহে যে তিনি ঘুমাইয়া

মরেন। ভগবান হইল গিয়া কুম্ভকর্ণ। তার সদা সব্বদা গুম ভাঙনের জন্য বাজনদার দরকার। যুদ্ধে যখন তিনি গেলেন অসময়ে যে তারে উঠতে হইল, তাই তো ঢাক-ঢোল সব। ভগবানরে জাগাতে শরীল পেটাতে হয়। দেহখান গঠন করতে হয়। দেহে তিনি মইরা থাহেন। জাগাইতে হয় তাকে গুরুর করুণায়।

কথা বলতে বলতেই বৈরবী এক ভাঁড় জল এগিয়ে দিলেন।

বললেন— খান, গুড় দেওয়া আছে। শরীলখান জুড়াইব। তিনি আইয়া পড়লে বেবাক কথা হইব। আপনার উৎসুক্য সব কইবেন ভৈরবরে। নিরসন হইব সব। তিনি যে জ্যান্ত শিব।

কথাটা বলেই ভৈরবী হাতজোড় করে কপালে ঠেকালেন।

বললাম— কতদিন আপনারা একসঙ্গে আছেন?

কথাটা শোনা মাত্রই রেগে উঠলেন ভৈরবী। মুখ তাঁর রাঙা হয়ে উঠল। চোখে তাঁর আগুনের ছটা। কণ্ঠার হাড় সটান দাঁড়িয়ে গেল। চিবুক একেবারে শক্ত। আতিথেয়তার সেই নমনীয়তা আর তাঁর শরীরে নেই। পাল্টে উঠেছে শরীর আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য দ্রুততায়!

বললেন— কী মনে করেন আপনে আমারে? আমি বেবুশ্যে মাগী। ওসব তো আপনাদের ভদ্দ সমাজে হয় বিয়ে না করে ঘর করা। মানে তো শরীল ভোগ। মানাঝোনা নেই। শুধু ঠাসাঠাসি। ছিঃ ছিঃ। আপনে আমারে শেষে বেবুশ্যে ভাবলেন। পেটের দায় আমার ছেলো না। ভৈরবও ভাল ঘরের। সহজিয়া পথে বাপ-ঠাকুরদাও ছিলেন। তবে তিনিই কেবল বিবাগী হলেন। আমাদের গেরামে এলেন। মছলন্দপুর। তারে দেখে ভক্তি-ছ্রুদ্ধা এল। বে-থা তখনও হয়নি আমার। এক কাপড়ে চলে এলুম। সেই থেকে আছি। আমি যদি বেবুশ্যে হতাম আর উনি যদি গতরে ভুলতেন তবে এক গতর হত বলেন? বেবুশ্যে মাগীর নানা গতর চাই। পুরুষ তো গতরখাকী। ভৈরব তেমন লন। সিদ্ধাই সাধকে নাড়া বাঁধা লোক। তিনি আমাকেও তন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। তিনি ঝেমন ঝেমন মিলন বলেছেন তেমন চলে আসছি আমরা।

বললাম— না না। তেমন বলতে চাইনি আমি। আপনাদের সুনাম, সম্মান এসব শুনেই তো এতদূর এসেছি। আপনি ভুল বুঝেছেন আমার কথার।

দেখলাম, নরম হয়ে এলেন এবার ভৈরবী।

বললেন— দোষ আপনের নয়। অনেকে ভাবে এ অনাচারের দেশ। শরীল টেপাটেপির খেলা চলে এখানে। ভৈরবী মানেই বেবুশ্যে। কিন্তু এরা জানে না ভৈরবী সাধিকা না হলে শক্তিমান সাধকের সাধনপথ খুলবে না। সমাজ তো সব

সময় ভেবে এসেছে যে নারীরা বেবুশ্যে। এটা ভাবেনি মাথারা সব, মিনসেরা লালঝোল মেটাতে মাগীদের বেবুশ্যে করেছে। যে মাথা বিধান দেচ্ছে নারী বেবুশ্যে সেই দেখো গা লাইন দিয়েছেলো তার ঘরে। পায়নি শরীল। তাই সেই নারী হল এখন বেবুশ্যে। এ পথে অনাচার আছে। বেবুশ্যে মাগী আছে। তবে ডেকরা মিনসে কম নেই। এরাই সব বদনাম করল পথের। ভেক নিল। শরীল টেপাটেপি করল। বুঝল না, টেপাটেপি করলেই হবে! স্তর আছে না। সাধনগুরু আছে না। সেই গুরু না পেলে সাধনলীলা বুঝবে সব কী করে শুনি!

বললাম— সেই কথাই তো শুনতে এসেছি মা।

বললেন— বসেন ঠাকুর এসে গেছেন।

দেখলাম, এক শক্তপোক্ত পুরুষ একঢাল জটার মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। নমস্কার বিনিময় হল।

ভৈরবী বললেন, আপনেরা বসেন। আমি একটু আখাটা ধরিয়ে চা করে নিয়ে আসি।

বললাম—ব্যস্ত হতে হবে না আপনাকে মা।

ভৈরব বললেন, বিন্দুখেলা বুঝবেন বলে এয়েছেন। এত বছরের সাধক-সাধিকার জেবন আমাদের। বাচ্চা-কাচ্চা নেই তাই সকলেরই উৎসুক্য আছে জেবনটার নড়াচড়ায়। অনেক মান্যি-গন্যি মানুষ আসেন। তাঁদের প্রথমে যা বলি, আপনারেও সেই একই বলি।

বললাম— বলুন।

বললেন— হিসহিসানি কিছু জানা আছে আপনের?

ঘাড় নাড়লাম আমি।

— তাহলে তো এ পথে ঘোরাফেরা অনেক দিনেরই মনে হচ্ছে।

আমি উত্তর করার আগেই ভৈরবী চা নিয়ে প্রবেশ করলেন ঘরে। সঙ্গে একবাটি মুড়ি।

বললেন— জুড়ান যাওয়ার আগে সব খইয়ে নেন আপনারা। তারপর কতা এগোক।

তিনজনই আমরা চায়ে চুমুক দিলাম। ভৈরবের ভাঙা হাতলের কাপ। ভৈরবীর হাতে ধরা অ্যালুমিনিয়ামের টোল পড়া গ্লাস আর আমার হাতে বিয়েবাড়িতে জল দেওয়ার মাটির গ্লাস বা ভাঁড়। ধোঁয়া উঠছে তার থেকে। বিকেল এগিয়ে এগিয়ে আসছে। রোজের তেজ মিইয়ে আসছে ভৈরবীর করা রাগের মতোই এখন। ভাবছি, সাধনের দরজা কতখানি বা হাট হবে এখন। এই বারো বছরের সাধনায়।

তবে যদি বা হয়ও তার ভেতরে বা কতখানি মণিমানিক্য আছে কে জানে! যুগলসাধনার ভাবধারা এর আগে তো কম চক্ষুস্মান হয়নি আমার। সে অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। তবু আশা করতে দোষ কোথায়! ভৈরবীই তো বলেছেন তাঁদের 'সিদ্ধাই সাধকে নাড়া বাঁধা'-র কথা। এই পথ তো বলে : 'গুরুপদে ডুব দেখ গা/ ধাক্কা সামলায়ে।' দেখা যাক কতখানি বা এঁরা, এই যুগল ধাক্কা সামলিয়ে নিতে পেরেছেন।

সৃষ্টির এক প্রান্তে বা উৎসে রয়েছে শূন্যতা আর অপর প্রান্তে বস্তুজগত। কুণ্ডলিনীকে সাধক দেখছেন শক্তি হিসেবে, যা এসেছে সেই শূন্যতা থেকেই। যাকে আবার চিহ্নিত করা হচ্ছে শিব বলে। শিব এখানে আসলে সাধক শরীরের শূন্যতা। যার ভেতর শক্তির উন্মেষ ঘটছে। সাধক যাকে বলছেন কুলকুণ্ডলিনী জাগা। প্রশ্ন হচ্ছে সাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে কেন কুণ্ডলিনীকে? শীতল ঠাকুরও তো বলেছেন, হিসহিসানি বোঝার কথা। যা সর্পযুক্তিকেই চিহ্নিত করে। আসলে সাপের গল্পকাহিনি মানুষের অস্তিত্বে ও মূল্যবোধেও চিহ্নিত হয়ে আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। দেহসাধনা তার কায়াকল্পকে সঙ্গে নিয়েছে শারীরিক অস্তিত্বেরই ঘোর যুক্তিকতায়। কুণ্ডলিনীর অর্থে যাওয়ার আগে, তাকে সাপ দিয়ে বোঝানোর যুক্তি-যুক্ততায় প্রবেশ করার আগে পৃথিবী জুড়ে যে মনুষ্য ইতিহাসের সঙ্গে সাপ জড়িয়ে আছে সেটা বুঝে নিলে এটা বুঝতেও সুবিধে হবে যে সাপ আসলে এক জাগরণক্রিয়ারই পরত শক্তি-অস্তিত্বের।

মেসোপটেমিয়ার এক ভাস্কর্যে রয়েছে, সুমেরীয় রাজা Gudea-র হাতলশূন্য পেয়ালা, যার গায়ে আঁকা রয়েছে জড়াজড়ি দুটো সাপ। সুমেরু অঞ্চলের লোকবিশ্বাস হল— গি নামে পুরুষ এবং ইরা নামে নারী-সর্পের সঙ্গমের ফলেই পৃথিবীর উর্বরা শক্তি দেখা দেয়। ধরিত্রীর গর্ভে তখন শস্যের জন্ম হতে শুরু করে। ইরার অর্থ আজও কিন্তু পৃথিবীই। গি হল পুরুষাঙ্গরূপ গিরি। এইগিরিশৃঙ্গ থেকে জলধারারূপ রেতঃপাতেই ধরিত্রী গর্ভবতী হয়। খ্রিঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দে সিরিয়ান সীলেও একটি সাপের হদিশ মেলে। মাঝখানে এক দেবতা, তাঁর কাঁধের উপরে জ্বলছে দুই সূর্য। দু'কাঁধ বরাবর উঠেছে দুটি সাপ। মিশরে যখন গ্রীক প্রাধান্য ছিল তখন মিশর থেকেও পাওয়া গেছে সর্পজড়িত দেবতার মূর্তি Atergatis। এরকম আরও নানা মূর্তি পাওয়া গেছে নিকট প্রাচ্যে। সম্ভবত সাপ এখানে বোধহয় সময়ের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। আমাদের দেশেও আবার বিষধর সাপকে কালসর্প বলে কিন্তু চিহ্নিত করা হয়। কাল এখানেও খানিকটা হলেও সেই সময়কেই চিহ্নিত করছে। মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার মুকুটেও ছিল সর্পফণা। সাপ এখানে তাঁর

রূপের অহংকার, কামনার স্বাধিকারকেই যেন স্পষ্ট করছে তাঁর জীবনপঞ্জীর সর্বায়ত কামনারই সত্য হয়ে গেছে এক্ষেত্রে সাপ। ক্লিওপেট্রার ব্যভিচার, অকাতরে পুরুষ-সংসর্গ, উন্মত্ততা সাপের সঙ্গে জড়ানো সেই যৌনজীবনের মিথকেই যেন ব্যক্ত করে। শুধুমাত্র মেসোপটেমিয়া, মিশর বা নিকট-প্রাচ্য নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও সাপের প্রাদুর্ভাব আমরা লক্ষ্য করি। শ্যাম ও কাম্বোডিয়ার বৌদ্ধ ভাস্কর্যে ছিল সাপের প্রাধান্য। ধ্যানরত বুদ্ধের মস্তিষ্কবলয়ে নানা ধরনের সাপ। ভারতবর্ষে মহাবীর জৈন এবং গৌতমবুদ্ধ উভয়ের ক্ষেত্রেই সাপের কাহিনি জড়িয়ে আছে সব বিচিত্রভাবেই। মথুরার শিল্পীদের খোদাই করা যে পার্শ্বনাথের মূর্তি পাওয়া গেছে— তাতে দেখা যায় যে, দিগম্বর নিরালঙ্কার পার্শ্বনাথের মাথার উপর রয়েছে সর্প-ছত্র। নাগেদের শাসনকেন্দ্র মথুরাতে এক সময় ছিল সাপের প্রাধান্য। যে-কোনও নাগরাজকেই বহু সর্প-ফণার নীচে আসীন দেখা যেত দেবতার ভঙ্গিতে। এই সর্প-প্রাধান্যতার পেছনে অনার্য ভাবধারাই প্রসারিত বলেই মনে হয়। সাপ অনার্যদের প্রতীক। মৃত্তিকার উর্বরতার প্রতীক। সাধারণ মানুষের জীবনেরও প্রতীক। এর প্রমাণ হোমারের 'ইলিয়াডের' মধ্যেও রয়েছে। গ্রীক-বীরেরা যাত্রা করবেন অনার্যনগরী ট্রয় ধ্বংস করার জন্য। তাঁরা প্রস্তুত, তখনই দেখলেন আর্যদের প্রতীক ঈগল উড়ছে আকাশে। তারা ধারালো নখের বেষ্টনীতে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত এক সাপ। উল্লসিত হয়ে উঠলেন গ্রীক যুদ্ধযাত্রীরা। এ হল আর্যদের জয়ের ইঙ্গিত অনার্যদের উপর। জিউস পথের প্রতীক ঈগল, পুরুষের প্রতীক ঈগল জয়লাভ করবে পূর্বদেশের মাতৃতন্ত্রের প্রতীক সাপকে। যে সাপ যৌনজীবনের এক স্বামীর বাইরেও উপভোগ করতে পারবে বহু পুরুষকেই। যেজন্য দেখি, জিউস পতের সংসারজীবনের রীতিনীতি ভেঙে হেলেন পালয়ে গেলেন ট্রয় নগরীতে। পূর্বদেশের যৌনজীবনে প্রভাবিত হয়ে। ভারতীয় আর্যরাও একদিন গরুড়ের সঙ্গে সাপের যুদ্ধ দেখিয়ে সাপকে ধ্বংস করার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন। রাজা জনমেজয় সর্পনাশ যজ্ঞ পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্পন্ন হয়নি। পার্শ্বনাথ, মহাবীর আর গৌতমবুদ্ধের পূর্ণ জ্ঞানলাভের সময় যে সাপের আবির্ভাব মহাবীর ও বুদ্ধের সঙ্গে, তা হয়তো সাধারণত্বেরই প্রতীক। সাধারণের জন্য ধর্ম প্রবর্তনের সাহায্যে সেইজন্য এই পৃথিবীর প্রতীক, সাধারণের প্রতীক আবার যোগীশরীরের শক্তির প্রতীক সাপই এগিয়ে এসেছিল প্রথমে। তীর্থঙ্করদের চিরশত্রু সম্বর একদিন রথে চড়ে আকাশপথে যাচ্ছিলেন। নীচে গহন অরণ্যে তখন ধ্যানমগ্ন পার্শ্বনাথ। সম্বরের রথ যেতে গিয়ে পার্শ্বনাথের মাথায় বেঁধে আটকে গেল। কৈবল্যের মুখোমুখি তখন পার্শ্বনাথ ধ্যানমগ্ন। মহাসাধকের মাথার ওপর দিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও

নেই। তাই আটকে গেল সম্বরের রথ। সম্বর নীচে নেমে সাধকের ধ্যান ভাঙাতে গিয়ে দেখলেন, তাঁরই চিরশত্রুকেই। সেজন্য তিনি আরও চেষ্টা চালাতে লাগলেন যে পার্শ্বনাথের ধ্যান যাতে ভেঙে যায়। তিনি যাতে আর নির্বাণ লাভ করতে না পারেন। সম্বরের ইচ্ছেতে তখন চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে তীব্র ঝড় উঠল। বিদ্যুতের গর্জনে পৃথিবী কাঁপতে থাকল। পাহাড়-পর্বত ভেঙে ধুলো হয়ে গেল। তবু পার্শ্বনাথের ধ্যান ভাঙল না। তখন তিনি মারের মূর্তি ধরলেন। মারের (মৃত্যুদেবী) মুখ থেকে বেরোতে থাকল আগুনের লেলিহান শিখা। গলায় ভয়ানকভাবে দুলতে থাকল মুন্ডমালা। মৃত্যুর দেবী ভয়ানক মার মার শব্দ করে এগিয়ে যেতে লাগলেন পার্শ্বনাথের দিকে। তথাপি তাঁর হুঁশ নেই কোনও। এমন সময় সর্পরাজা ধরেন্দ্রও কাঁপতে থাকলেন মারবেশী সম্বরের দাপটে। তিনি বুঝলেন এসবই সৃষ্টি করা হচ্ছে আসলে পার্শ্বনাথের ধ্যান ভাঙানোর জন্য। তখন ধরণেন্দ্র ও তার স্ত্রী বেরিয়ে এলেন পাতালপুরী থেকে। পার্শ্বনাথের দুই হাতের পাশে দু'জনে দাঁড়ালেন তাঁরা। ফণা তুলে দিলেন মাথার ওপর। ঝড়জল আর স্পর্শ করতে পারল না পার্শ্বনাথকে। ভয় পেয়ে সম্বর তখন পালিয়ে গেলেন। বন্ধ হয়ে গেল সম্বরের সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সাপ এভাবেও মানুষের, ধর্মের, আধ্যাত্মের সঙ্গেও জড়িয়ে গেল। শুধু প্রজননে, যৌনতায়, আকাঙ্ক্ষায়, কামনায় আটকে রইল না। তথাপি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে 'মনসামঙ্গলে' সাপ বা তার প্রতীকী-নারী মনসা এলেন কিন্তু কামনা, আকাঙ্ক্ষা, রিরাংসার প্রতিমূর্তি হয়েই। সাপের মূর্ততার সঙ্গে প্রজনন-বিশ্বাসের কথা তো বলেইছি। মনসার যে সমস্ত মাতৃমূর্তি বা চিহ্নমূর্তি আমাদের দেশে পূজাচারের অব্যাহত ধারাকে এখনও বহন করে আনছে, সেখানে মনসার কোলে যেমন আমরা মানবশিশুকে দেখে থাকি, তেমনই পাই মনসাঘটের প্রতিকৃতি। এই ঘটকে আমরা প্রজননের রজঃশক্তি মানতেই পারি। মনসাকে তাই যদি তাঁর শরীরের রূপে চিহ্নিত করে নিই তাহলে তার রূপান্তরে কাব্যকলায় যা পাই তা ওই রূপান্তরিত শরীরক্রিয়ার চিত্রকলা। মনসার ক্রোধ, ইচ্ছে, কামনা, পুজোর স্বীকৃতি— সবেতেই রয়েছে কিন্তু পুরুষের পরাক্রমকে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। চাঁদ সদাগর যে বাঁ হাতে শেষে ফুল ছুঁড়তে বাধ্য হলেন সেকানেও বশ্যতার স্বীকৃতি লেগে। মনসাকে যদি আমরা সাধক শরীরের শক্তি হিসেবে দেখি যা থাকছে কিন্তু সেই কুণ্ডলিনীতেই, যাকে সাধক আবার চিহ্নিত করছেন সর্প প্রতীকে। তবে চাঁদ সদাগর হলেন সাধকের পরম শূন্যতা। তাঁর ফুল ছোঁড়ার অর্থ শক্তিকে নিজস্বতার মধ্যে নিয়ে আসা। ঠিক এমন করে ভাবলে শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমনও যোগী শরীরের তাৎপর্য লাভ করবে আর

সমুদ্র মন্থনের গল্পে সর্পের রজ্জু হিসেবে ব্যবহারও যোগ শরীরে প্রতীকময়তার জায়গা নেবে। কালীয় হবে শক্তি। আর শ্রীকৃষ্ণ সাধকদেহ। যেখানে তিনি কালীয়কে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করে রাখবেন অনায়াসে যোগে, শ্বাস আর দমের কাজে। একইভাবে সমুদ্র হবে সাধক শরীর। যাকে সাধক মন্থন করে নিলে ইন্দ্রিয়গুলোর হলাহল ওঠা স্বাভাবিক। যেগুলোকে সাধক বশীভূত করে ধারণ করে রাখেন শিবের মতোই আর তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে যান। শক্তিকে, কুণ্ডলিনীকে শাস্ত্র তো সর্পরূপ দিচ্ছে। তাহলে শক্তিমন্থন করেই হলাহল ধারণ হচ্ছে। যাকে সাধক পরম শূন্যতায় আবার মিশিয়ে দিতে পারছেন। আর এই গল্পে বর্ণিত দেবতাকে সাধকের শুভচিন্তা মানা যেতে পারে। অসুর এক্ষেত্রে অশুভ চিন্তা। ইন্দ্রিয়দোষের শক্তি। যাকে সাধক পরাভূত করেন। এভাবেই সাপ কিন্তু বিস্তার করে আছে পৃথিবীব্যাপী গল্পে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, শরীর নিহিতার্থের সঙ্গে সব সময়ই কোনও না কোনও ব্যাপারে জড়িয়ে আছে। যা শক্তিতেই সামিল হয়। কুণ্ডলিনীকেই কোনও না কোনওভাবে ইঙ্গিত করে। তাই বেশ বুঝেশুনে ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ, হিন্দুতন্ত্র সাপকে কুণ্ডলিনীশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কুণ্ডলিনীর কুল কথার অর্থ দ্রাবিড় ভাষায় শক্তি। কুণ্ড কথার অর্থ গর্ত। শরীরের গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম গর্তের কথা যোগশাস্ত্র বলছে। মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে শক্তি মানবদেহের প্রান্তভাগের দিকে ক্রমে অগ্রসর হতে হতে এখানে স্থির হয়ে পড়ে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখানে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। সাধক এই তাপকে অভিহিত করেছেন প্রাণাগ্নি বলে। এই তাপকে শ্বাস বা প্রাণ বায়ু দ্বারা উত্তাপিত করে নিয়ে গেলে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে তা দ্রুত উপরে উঠে সাধক কথিত সেইসব পদ্মচক্রে সামিল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ যেটা হবে এক্ষেত্রে শক্তি তাপকে বস্তুরূপে পেয়ে একটি বিশেষ Frequency-তে চলে যাবে। যার ফলে মস্তিষ্কে আপনা আপনি বহুমাত্রিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে যাবে। একে ইংরেজিতে বললে Multidimensional vision বলা যেতে পারে।

শাস্ত্র বলছে : গুহ্যদেশ থকে দুই আঙুল উপরে লিঙ্গমূল থেকে দুই আঙুল নীচে চার আঙুল পর্যন্ত বিস্তৃত মূলাধারপদ্ম আছেন। তার মধ্যে ব্রহ্মনাড়িমুখে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। তাঁর গায় দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিন বার বেষ্টন করে কুণ্ডলিনীশক্তি আছেন। বলা হচ্ছে : 'পশ্চিমাভিমুখী যোনির্গুদমেঢ্রান্তরালগা। /তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুণ্ডলী সদা॥' গুহ্য ও লিঙ্গ এই দুইয়ের মধ্যস্থানে পশ্চাদভিমুখী যোনিমণ্ডল আছে সেই যোনিমণ্ডলকে কন্দও বলা হয়। যোনিমণ্ডলের মধ্যে কুণ্ডলিনীশক্তি

নাড়িসকলকে বেষ্টন করে সার্দ্ধ ত্রিকুটিলাকার সর্পরূপে আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়ে সুষুম্না ছিদ্রকে অবরোধ করে অবস্থান করছেন। সাধক বলছেন যে, এই কুণ্ডলিনীই হলেন নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা প্রকৃতি। তাঁর দুই মুখ এবং বিদ্যুল্লতাকার ও অতি সূক্ষ্ম। দেখতে অনেকটা সেই অর্দ্ধ ওঙ্কারের মতো। পদ্মের মধ্যে যেমন ভ্রমরের অবস্থিতি, তেমনই সমস্ত জীবদেহের মধ্যে কুণ্ডলিনী বিরাজিত থাকেন। ওই কুণ্ডলিনীর মধ্যে কলার কোষের মতোই কোমল মূলাধারে চিৎশক্তি থাকেন। তাঁর গতি অতি দুর্লক্ষ্য। কুণ্ডলিনীশক্তি সাধক বলছেন প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণ তেজঃস্বরূপ। দীপ্তিমতী এবং সত্ত্ব, রজ, ও তম— এই ত্রিগুণের প্রসূতি ব্রহ্মশক্তি। এই কুণ্ডলিনীশক্তিই ইচ্ছে, ক্রিয়া ও জ্ঞান— এই তিন নামে নামিত হয়ে শরীরের সবকটা চক্রে ভ্রমণ করেন। এই শক্তিকেই দেখা হচ্ছে জীবনীশক্তি হিসেবে। এই শক্তিকে আয়ত্ত করাই সাধক জীবনের মূল উদ্দেশ্য। কুণ্ডলিনীস্থ শক্তিকে বলা হচ্ছে যে, জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ। কিন্তু এই শক্তিই ব্রহ্মদ্বারকে রোধ করে নিদ্রা দিচ্ছেন। যার জন্য জীবাত্মা রিপু ও ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হয়ে অহংকারগ্রস্ত, অজ্ঞান-মায়াচ্ছন্ন হয়ে সুখ-দুঃখের ভ্রান্তিজ্ঞানে কর্মফল ভোগ করছেন। সাধকের অভিমত, কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা না হলে শত শত শাস্ত্রপাঠে ও গুরুপোদেশে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না এবং তপ্-জপ ও সাধনভজন সমস্তই বৃথা। 'মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। / তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চর্চনাদিকম্ ।।/ জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্ ।। ' মূলধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি যতক্ষণ না জাগরিতা হবে ততক্ষণ কাল পর্যন্ত মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চ্চনা বিফল। যদি পুণ্যপ্রভাবে সেই শক্তিদেবী জাগরিতা হন, তবে মন্ত্রজপাদির ফলও সিদ্ধ হবে। বলা হয়েছে যে, শরীরস্থ চক্র, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চপ্রকার ব্যোম যে ব্যক্তি অবগত নয়, তার পক্ষে যোগতত্ত্বের কিছুই জানা সম্ভব নয়। যোগীকে তাই চক্র যেমন চিনতে হয় মূলাধার, ত্রিলক্ষ্য ও পঞ্চপ্রকার ব্যোম যে ব্যক্তি অবগত নয়, তার পক্ষে যোগতত্ত্বের কিছুই জানা সম্ভব নয়। যোগীকে তাই চক্র যেমন চিনতে হয় মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ইত্যাদি তেমনই জানতে হয় ষোড়শাধারকেও। বাউল সাধকও ষোড়শাধারকে 'ষোলতলা' বলে গুহত্য দিয়েছেন গানে। বলেছেন: 'এ কোন্ কারিকর, গড়লে এ ঘর, একটা রূপের নিশান। ' নয় দরজা ষোলতলা, দ্বাদশে বাতি ঘোষণা।। ' ঘর এখানে দেহভাণ্ড। দেহ বাড়ি। নারীদেহ বাড়ি। কেন না বাউলের গান দেহতত্ত্ব ঠিকই তবে তাকে যুগল দেহতত্ত্ব বললে বোধহয় আরও সঠিক হবে। তন্ত্র দেহতত্ত্বকে ধারণ করে ঠিকই তবে তান্ত্রিকের কাছে ভৈরবী সাধনার যুগল দেহতত্ত্বের আধার কখনও মুখ্য নয়। বাউলের সাধনায় যা একেবারে

ভরকেন্দ্র। সাধন সঙ্গিনী ছাড়া সাধন হবেই না। কারণ হল, বাউলের সাধন মানেই যুগল সাধন। সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলনে তাঁদের অভিমতের 'গুরুবস্তু' বা 'কৃষ্ণবস্তু'কে ঊর্ধ্বেরতা দানেই পরমমোক্ষ। তন্ত্রে এই মিলন থাকলেও তা কখনও মোক্ষ নয়। বাউল নয় দরজা বলছেন শরীরের নয়টি প্রত্যঙ্গকে। তাঁরা একে আবার 'নবদ্বার'ও বলে থাকেন। এই প্রত্যঙ্গগুলো হল— দুই কান, দুই চোখ, দুই নাক, মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ। উপস্থ বললে অনেকের কাছে পরিষ্কার নাও হতে পারে। বলি জননেন্দ্রিয়, লিঙ্গ/ যোনি। 'ষোলতলা' হল ষোলটি আধার। যে আধারে লয় যোগ সাধন হয়। একে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন 'ষোড়শাধারং'। 'পাদাঙ্গুষ্ঠৌ চ গুলফৌ চ /পায়ুমূলং তথা পশ্চাৎ দেহমধ্যঞ্চ মেঢ্রকং ।।/ নাভিশ্চ হৃদয়ং গার্গি কণ্ঠকূপসস্তথৈব চ। /তালুমূলঞ্চ নাসায়া মূলং চাক্ষোশ্চ মণ্ডলে। /ভ্রবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ মূর্দ্ধা চ মুনিপুঙ্গবে।।' অর্থাৎ ডান পায়ের আঙুল (দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ), গোড়ালি (পাদগুল্ফ), গোপনীয় বা অপ্রকাশ্য অংশ (গুহ্যদেশ), পুংজননেন্দ্রিয় বা শিশ্ন (লিঙ্গমূল), নাভির গর্ত বা কুণ্ড (নাভিমণ্ডল), মন (হৃদয়), কণ্ঠনালীর নিচস্থ গর্ত (কণ্ঠকূপ), জিভের অগ্রভাগ (জিহ্বাগ্র), দন্তপংক্তি বা দাঁতের পাটি (দন্তাধার), টাকরা (তালুমূল), নাক বা নাকের ফুটো (নাসাগ্রভাগ), দুই ভুরুর মধ্যবর্তী স্থান বা অংশভাগ (ভ্রূমধ্য), চোখ বা চোখের অংশভাগ (নেত্রাধার), কপাল (ললাট), মাথা বা মস্তক (মূর্দ্ধা), শিরোমধ্যস্থ বা মাথার ভেতরে অধোমুখের সহস্র পদ্ম (সহস্রার)। এই ষোলটি ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্ঠানে লয় যোগ হয়। লয় যোগ হল আমাদের মনকে যে কোনও পদার্থের উপর একত্র করে একতানে বেঁধে ফেলা। বাউল যে 'দ্বাদশ বাতি'র কথা বলেন তা হল অনাহত চক্রের বারোটি পাপড়ি। এই দ্বাদশ দল হল— ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ। এগুলো বলা হচ্ছে যে সব মাতৃকাবর্ণ। মাতৃকা হল শক্তিরূপিনী। সেই আধারেও রাখতে পারি এই বারোটি পাপড়িকে। এর রং সিঁদুর বর্ণের। এর প্রত্যেক দলে একেকটি বৃত্তি রয়েছে। এগুলো হল— আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহংকার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ। এই অনাহত পদ্মে বা চক্রের মধ্যে অরুণবর্ণের সূর্যমণ্ডল ও ধূম্রবর্ণের বায়ুমণ্ডলের অবস্থান। এই পদ্মে সাধক ধ্যানে বসলে অনিমাদি লাভ করেন। অনিমিত্ত ঘটনা রাশি তাঁর চোখের সামনে ভাসে। কুণ্ডলিনী আলোচনার কালে যোগী ত্রিলক্ষ্যর কথা বলে থাকেন। 'আদিলক্ষ্যঃ স্বয়ম্ভুশ্চ দ্বিতীয়ং বাণসংজ্ঞকম্। /ইতরং তৎপরে দেবি জ্যোতীরূপং সদা ভজ।।' স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ— এই তিন লিঙ্গই হল সাধকের ত্রিলক্ষ্য। এই লিঙ্গত্রয় যথাক্রমে মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা চক্রে অধিষ্ঠিত। কুণ্ডলিনীশক্তির বিকাশকালে, পঞ্চপ্রকার ব্যোমের ভূমিকার

কথাও বলছেন সাধক। শাস্ত্রে একে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ব্যোমপঞ্চকং' হিসেবে। 'আকাশন্তু মহাকাশং পরাকাশং পরাৎপরম্/ তত্ত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষম্॥' আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্যাকাশ— এই পঞ্চব্যোম। পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ— এই পঞ্চতত্ত্বকে পঞ্চাকাশ বলছে যোগশাস্ত্র। বাউল বলছেন পঞ্চভূত। তান্ত্রিকেরও একই অভিমত। এই পঞ্চাকাশ রয়েছে শরীরস্থ চক্রেই। কুণ্ডলিনীকে সর্পসদৃশ মানার কারণ, কুণ্ডলিনী যেমন বস্তুরূপে জীবদেহে বন্ধনে ঘুমিয়ে থাকে— যাকে বলা হচ্ছে গর্তস্বরূপ, তেমনই সাপও গর্তে বিশেষত শীতকালে কুণ্ডলায়িত হয়ে ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে থাকে। তাপে কুণ্ডলিনী খুলে সোজা হয়ে গতি সম্পন্ন হয়। সাপও গরমকালে উষ্ণতায় গর্ত থেকে বের হয়। কুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধারে সাপের মতোই কুণ্ডলায়িতা হয়ে থাকে বলে একে বলে কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলায়িতা থাকে সাড়ে তিন প্যাঁচে। জড়িয়ে থাকে শিবলিঙ্গকে। শিবলিঙ্গ হল গিয়ে সাধক দেহের পরমাত্মা। যাকে সাড়ে তিন প্যাঁচে জড়িয়ে রয়েছে কুণ্ডলিনীশক্তি। এই সাড়ে তিন প্যাঁচের অর্থ ব্যাখ্যা আমাকে করেছিলেন তারা ভৈরব। তাহেরপুরে দয়াল বাবার আশ্রমে থাকেন তিনি। তাঁরই মন্ত্রশিষ্য। দয়াল বাবা একশ পেরিয়ে গেছেন বলে ভক্তশিষ্য দাবি করেন। তবে তাঁর নিজের মুখে বয়সজনিত অভিমত কোনওদিন শুনিনি। যথেষ্ট বয়স হযেছে একথা সত্য। আনুমানিক নব্বই উত্তীর্ণ অবশ্যই। কিন্তু এখনও কর্মক্ষম। স্মৃতিধারী। নির্ভুল শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। আশ্চর্য! এই বয়সেও তাঁর দাঁত সেইভাবে পড়েনি। মাথায় চুলও রয়েছে যথেষ্ট। পাকা হলেও তা একেবারে ভয়াবহ পাকে জর্জরিত নয়। চশমা নেই। খালি চোখে বইপত্র, খবরকাগজ সবই পড়তে পারেন। তা এই দয়ালের আশ্রমে বসেই তারা ভৈরব আমাকে কুণ্ডলিনীর সাড়ে তিন প্যাঁচের অর্থ বুঝিয়েছিলেন। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। আশ্রমের আরতি শুরু হয়নি তখনও। দুপুরে এখানে প্রসাদ নেওয়ার পর একপ্রস্ত কথা হয়েছে বাবার সঙ্গেও। বাবা এখন বিশ্রামে। আরতির পর দণ্ডবত প্রণামের সময় আবার তাঁর দর্শন মিলবে। না হলে খুব একটা সমাগমে থাকেন না তিনি। বইপত্তরে মজে থাকেন। জিজ্ঞাসু এলে আগেভাগে জানিয়ে আসতে হয়। ভৈরব এই আশ্রমে বহুদিন আছেন। আছেন তাঁর সাধন সঙ্গিনী ভৈরবীও। সকলে তাঁকে অচলা মা হিসেবেই এখানে চেনেন। মূলত এই দু'জনই মানুষ দয়াল বাবার দেখাশোনা করেন। বাবা ছিন্নমস্তার উপাসক। প্রতি অমাবস্যায় হোমক্রিয়া করেন। ছিন্নমস্তার শক্তিময়তার শরীরঘেরা বোধ আমাকে দয়াল বাবাই বুঝিয়েছিলেন। মন্দিরের দ্বারে বসে আছি আমি আর বাবা। কিছু আগেই মায়ের অন্নভোগ হয়েছে। ভোগারতির পর অচলা মা বলির হাঁড়িকাঠে

আরতি সেরে সেই সিঁদুরে আমার কপালে তিলক একে বললেন, এইবার বেশ আবেশ হয়েছে।

দয়াল বাবা তৎক্ষণাৎ-ই উত্তর করলেন, আবেশ কি আর তিলকে হয়, আবেশ আসে শরীরে মত্ততায়। মায়ের মত্ততা না জানলে তা আসবে কীভাবে শুনি? মা যে ত্রিধারায় নিজের রক্ত নিজেই পান করছেন এর মানে আগে বুঝতে হবে যে। তবে তা শরীরে লেগে যদি আবেশ হয়। জ্ঞান আছে পুস্তকে। তা পড়লে হয় কিন্তু ভাব যে পড়ে আসে না। বিদ্যা ধারণ করা যায় মায়ের সিন্দুর কপালে আঁকার মতো কিন্তু ভাবাবেশ ধারিত হয়। মা যেমন ত্রিধারা নিয়ে আছেন।

বললাম— এই ত্রিধারার অর্থ কী?

বললেন— ছিন্নমস্তার ত্রিরুধির ধারাতে আছে হল সেই মা অন্নপূর্ণার ত্রিধা শক্তি।

— তাহলে বলছেন আপনি তিনটি ধারার রক্তস্রোতের ফিনকি যে মা পান করছন তা অন্নপূর্ণার।

— অবশ্যই। অন্নপূর্ণার অর্থ কী জানা আছে?

— অন্নদাত্রী যিনি।

— তা ঠিক। কিন্তু এই অন্ন কী চাল-ডাল-কলা- মুলো রে?

জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কী এই অন্ন?

বললেন— জগত সংসারের অন্নস্বরূপ হলেন অন্নপূর্ণা। জগতের অন্ন ভোক্তা অর্থাৎ কিনা যিনি ভোজন করেন, ভোগ্য অর্থাৎ যিনি তা ভোগ করছেন আর ভোগ অর্থাৎ যিনি সেই ভোগ্য আর ভোক্তার সুখদুঃখাদি অনুভব করতে পারছেন।

বললাম— এ নিশ্চয়ই শরীর ইঙ্গিত করছেন।

— একেবারে ঠিক। অর্জিত বিদ্যা তো কিছু আছে তোর। যা দিয়ে তুই ধরে ফেলেছিস। বাঃ বাঃ। ভাল ভাল।

— একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন তবে।

— জগত তো শরীর। জগত ভোক্তা হয়ে আছে সাধন শরীরে। তার ভোগ্য হল প্রকৃতি।

বললাম— শক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী?

বললেন— হ্যাঁ। এই ভোগ্যকেই ভোগে আনতে হবে রে। মানে কুণ্ডলিনীকে জাগাতে হবে ঠিকমতো।

বললাম— মায়ের তিন রুধির তবে মা একা কেন পান করছেন না? এক রক্তস্রোত মা পান করছেন। অপর দুই ধারাস্রোত দুই সখীর মুখেই বা কেন?

খুশিতে লাল হয়ে উঠল দয়াল বাবার মুখ। যেন সূর্যদেব সবে অস্ত গিয়েছেন এই ভরদুপুরে তাঁরই আকাশমুখে।

বললেন— এই তো জিজ্ঞাসুর মতো প্রশ্ন। যৌক্তিক মানুষ ক'জন আসেন এখানে। সবই তো গয়ং গচ্ছ। ভাগ তো শরীরই করে না কি?

বললাম—হ্যাঁ।

— ছিন্নমস্তা অর্থাৎ কিনা সাধক শরীর ভোগ করছে। ভোগ করেই সে হয়ে উঠছে স্বতন্ত্র দুই রূপের ছায়া। এক, ভোক্তা। দুই ভোগ্য। সেজন্যই মায়ের দু'পাশে দুই সহচরী। মানে হল এই দুই সাধকের আসল ছায়াপাত। এই দুই থাকলেই কুণ্ডলিনীস্থ শক্তি মহামায়া হয়ে উঠতে পারে। এর মানে কী জানিস?

বললাম— কী?

— মানে হল ভোক্তা আছে, ভোগ্য আছে কিন্তু ভোগ না হলে সব বৃথা। সাধন রসাতলে। ভোগ মানে শরীর। শরীরজগত পালনের জন্যই ভোগ। না হলে কুণ্ডলিনী জাগবে কীরূপে? মা আমার সব সময় সেই জাগরণ নিয়েই বসে আছেন।

দুপুর গড়াচ্ছে ছিন্নমস্তার আশ্রমে। কিছু আগে ভোগ পেয়েছি। এখন এই নাটমন্দিরে বসে ভাবছি, প্রতীকের আকস্মিক অভিঘাতগুলো শরীরের একেকটি প্রহরমূর্তি ঠিকই কিন্তু সেই প্রহরকে রসগ্রাহী করতে পারেন বোধহয় এমনই প্রাজ্ঞ কোনও ঋতদর্শী উপাসক!

দয়াল বাবার আশ্রমে বসেই তারা ভৈরব আমাকে বলেছিলেন, কুণ্ডলিনীর তিন প্যাঁচ শরীরের তিনগুণ— সত্ত্ব, রজ, তম।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাকি অর্ধেক যে পড়ে রইল।

বললেন— পড়ে থাকবে কেন কর্তা! ওই অর্ধেক প্যাঁচই তো সব। কথার মাঝেই পাশে এসে বসেছেন অচলা ভৈরবী।

ভৈরব তাঁর দিকে আঙুল তুলে বললেন, ওই অর্ধেকই তো আমার ভৈরবী। ও না থাকলে শক্তিমান আমি কীরূপে কর্তা?

বললাম— এই সাড়ে তিন হাতের তো আমি অন্য ব্যাখ্যাও দিতে পারি। যদিও সেটা হয়তো আপনাদের পছন্দ হবে না।

ভৈরব বললেন, বলেন বলেন। পছন্দ তো পরের ব্যাপার। যুক্তিদর্শটা শুনি আগে।

বললাম— আমাদের শরীর তো যার যার নিজের হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত। তাই শাস্ত্র জেনে-বুঝে কুণ্ডলিনীকে সাড়ে তিন প্যাঁচ দিয়ে রেখেছেন।

— শাস্ত্র তো ঠিকই করেছেন কর্তা। আপনের যুক্তিদর্শও তো ঠিক।

বললাম— আপনিই তো তিনগুণ আর অর্ধেককে শক্তি বা ভৈরবী শক্তি বললেন এই মাত্র।

বললেন— এও ঠিক বাবা। আবার ও-ও ঠিক।

বললাম— কীভাবে মেলালেন শুনি?

— সাড়ে তিন হাত মাপ তো শরীরেরই। আর শরীরেই তো শক্তি। কুণ্ডলিনী।

— তাহলে তিনগুণ আর ভৈরবী?

মা তখন মাথা নীচু করে বসে।

ভৈরব বললেন, তিনগুণ তো অন্য কোথাকার নয়। ও যে শরীরেরই গুণ। সব শরীরে তা বর্তায়।

বললাম— তাহলে ভৈরবী? আপনাদের একত্র সহবাস তো ঘরকন্নারই মতো।

— একেবারে ভুল কথা বার্তা। ঘরকন্যা ঠিকই বলেছেন। তবে তা অত স্থূল ব্যাখ্যার নয়।

বললাম— তাহলে আপনার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটা এবার শুনি।

বললেন— ঘর হল শরীর। কন্যা শক্তি।

— ঘুরে-ফিরে তো সেই একই জায়গায় এলেন।

— আপনার আসল কথা হল ভৈরবী সাধনার ব্যাভিচার নিয়ে।

বললাম— হ্যাঁ। তাই তো। যাঁর সঙ্গে সহবাস করছেন তাঁকে আবার মা বলে ডাকছেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে ভাব এখানে তো তাই-ই বর্তায়। শুধু যোগক্রিয়ায় কিছু দম-শ্বাসে সঙ্গিনীর শরীরে বীর্যপাত হচ্ছে না। তার ফলে আপনাদের বাচ্চাকাচ্চা নেই। এটা হয়তো শেখার।

— বলতে চাইছেন আপনে বিনা কণ্ডোমে মিলনে বাচ্চা না হওয়াটুকু শেখাই কেবল সাধন আখর।

— তাছাড়া আর কী! এক অর্থে ধরলে তো খানিকটা তাই-ই।

— আপনার যুক্তিদর্শে গেলে তো এখন ভৈরব-ভৈরবীর বাচ্চাও হয়। অনেকে তো ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করে। সাধনা করে।

বললাম— সে তো বাউলও করে। গান জীবিকা করে সাধন ভেক নিয়ে থাকে। তান্ত্রিকও তো তাই-ই করে। ভক্ত-শিষ্য জোটায়। তাবিজ করে। বাণ মারে। বশীকরণ করে তুকতাক করে। দু'জনেই সঙ্গিনী পাল্টায়। ব্যভিচারে মাতে। নারীকে ব্যবহার করে আর বলে নারী শক্তি।

— মানছি এও ঠিক। তবে এই নারী ব্যবহার কী শুধু সাধন পথে?

বললাম— আপনার ইঙ্গিত বুঝেছি। কিন্তু সংসার তো আর বলছে না ওটা সাধন পথ।

বললেন— এটা কী বলছেন! বিধিনিয়ম, শৃঙ্খলা তো ওখানেও থাকতে হবে। না হলে ব্যবস্থা তো ভেঙে পড়বে।

— সে তো আপনাদের ভ্রষ্টাচারকে চাপা দেওয়ার জন্য এই তুলনা টানছেন।

— তা আমি একেবারে করছি না কর্তা। আপনে ভীষণ শিক্ষিত মানুষ। বুঝবেন। এ পথে নারী সম্মানীয়া। তাঁর শরীরে মাতৃভাব আর কামিনীভাব দুই-ই আরোপিত। দুইয়ের মূলে নারী। নারী তাই আধার। সম্ভোগ আধার যেমন, তেমনই মাতৃ আধার। যা শক্তি। সেই রূপকেই সাধক শরীরে ধারণ করেন কুণ্ডলিনী পথকে খুলে দিয়ে। এই হল পথের অর্থ। অর্থময়তার ভুল নেই কিছু। পুরুষ-প্রকৃতি না হলে চলবে। ভুল এখানে যা তা হল পথচারীর। কর্তা এটা নিশ্চয়ই মানবেন।

ভৈরবী এতক্ষণ মাথা নীচু করে বসে ছিলেন।

বললেন— যদি আপনারা অভয় দেন একখানা কথা কই।

ভৈরব ইশারায় সম্মানীয় সম্মতি দিলেন।

আমি বললাম— অবশ্যই।

ভৈরবী বললেন, নারী সাধন আধার বাবা। পাত্র, সে পাত্রে ছেঁদা হলে তা তো কিছুটা পাত্রেরও দোষ বাবা। যিনি এই কম্ম করলেন তাঁরাও যেমন।

বললাম— তা ঠিক। কিন্তু...

— বুঝেছি। আপনে বলবেন বাবা অসহায় নারীর কথা। সেও ঠিক। তবে নারী শক্তিনামে থাকবে কেবল— গর্জাবে না? সঠিক পথে খুঁজে যাবে না যোগ্য পথচারীকে? এ পথ তো খোঁজার। ব্যভিচারের মধ্যেও দেখবেন আলো আছে। অন্ধকার আছে বলেই তো বাবা আলোর জন্য হাপিত্যেশ।

এই বলে ভৈরবী আমার চোখের দিকে সরাসরি দৃষ্টি রাখলেন। সেখানে যেন তামাম দুনিয়ার নির্মীয়মান মূল্যাঙ্কন সব আটকে গেল। বাইরে তখন অন্ধকারের রেশও সরু হয়ে উঠছে। তার ভেতরও হামলে পড়ছে শেষ বিকেলের একখণ্ড আলো। ও-ও বোধ হয় ভৈরব ভৈরীর বলা সেই সাধন পথের সঠিক দিশার পথচারী। যাকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকৃতির আঁধার রেশেও বেশ দেখা যাচ্ছে।

কুলকুণ্ডলিনীকে দেবী হিসেবে দেখা হলেও আসলে তা তো শক্তিই। শরীরের মধ্যে যে Potential energy তার কথাই কিন্তু বলছে হিন্দুতন্ত্র ও নানা যোগের গ্রন্থাবলী। এই শক্তি মানবদেহের সর্বনিম্ন চক্র অর্থাৎ মূলাধারে মধ্যে গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের ঠিক মাঝখানে সর্পাকারে কুণ্ডলায়িতা অবস্থায় নিদ্রিত আছেন বলে

মনে করেন দেহসাধক। এখানে তিনি শিবলিঙ্গকে সাড়ে তিন প্যাঁচে জড়িয়ে আছেন বলে বর্ণনা করেন। প্রশ্ন হল যে এই লিঙ্গ-কল্পনার বিজ্ঞানযুক্তিকতা কিছু আছে কি? উত্তর হল, হ্যাঁ অবশ্যই তা আছে। লিঙ্গটিকে মানা হচ্ছে যে, মানুষের সূক্ষ্ম শরীর। সাধক একে বলছেন মুক্ত আত্মার স্বরূপ। একে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রাখার অর্থ হল, মায়াশক্তির আবরণকে জড়িয়ে রাখা। আধ্যাত্মবাদ বলছে যে, এই মায়াশক্তির আবরণ বা বন্ধন খুলতে না পারলে জীবাত্মার আত্মজ্ঞান বা আত্মউপলব্ধি জাগবে না। আসবে না উপনিষদ কথিত সেই 'আত্মন'। সাড়ে তিন প্যাঁচ কুণ্ডলিনীর কল্পনা এইজন্যই যে, প্রত্যেকটি মানুষই তার নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা। সকল মানুষই ভেবে দেখলে এই সাড়ে তিন হাত মায়ায় জড়িয়ে আছে। তাই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা মায়াকে সাড়ে তিন প্যাঁচে জড়িয়ে রাখা হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবতায়। কুলকুণ্ডলিনীর প্যাঁচ খোলার অর্থ, মানবসত্তার আবরণকে খুলে শরীরস্থ তাপ উপরে উঠিয়ে দেওয়া। তার জন্যই ধাপে ধাপে চক্রপদ্মের আয়োজন। উপনিষদে বলা হয়েছে : 'শান্তো ইয়ম্ আত্মা'। অর্থাৎ কিনা আত্মা পরম শান্ত। কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রার পদ্মচক্রে পৌঁছলেই এই পরম শান্তির উপলব্ধি আসে। তান্ত্রিকরা ও যোগীরা শক্তির উত্থান ও গতিকে বিচিত্র স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো বর্ণনা করেছেন। হিন্দুরা দেহের মধ্যে ষট্‌চক্র বা সপ্তচক্র অনেক ক্ষেত্রে মতান্তরে নটি চক্রের কল্পনা করেছেন। বৌদ্ধরা তেমনই দেহের মধ্যে চারটি চক্রের কল্পনা করেছেন। নাভিতে নির্মাণচক্র। হিন্দুতন্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর একত্রে মিলিয়ে বৌদ্ধরা নির্মাণ চক্রের কল্পনা করেছেন, বলেছেন তাঁরা একে নির্মাণকায়। এর যুক্তি হল, নাভির নীচেই হল জননেন্দ্রিয়ের স্থান এবং শরীরের সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গ এখানেই বিরাজমান। যা কিনা সৃষ্টির মূল। এই স্থানে সর্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বলে বলা হচ্ছে বিন্দু ও বৌদ্ধ দুই তন্ত্রেই। হিন্দুতন্ত্রে মণিপুরে আগুনের স্থান কল্পিত হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে যেহেতু মণিপুর নির্মাণ চক্রের মধ্যেই নিহিত তাই আগুন এখানেই প্রজ্জ্বলিত। জননেন্দ্রিয়ের মূল এবং নাভির নিম্নভাগ পর্যন্ত এর বিস্তার। বৌদ্ধমতে দ্বিতীয় চক্র ধর্ম চক্র হৃদয়প্রদেশে অবস্থিত। একে বলা হচ্ছে ধর্মকায়। হিন্দুতন্ত্রে যা আসলে অনাহত। কণ্ঠে সম্ভোগ চক্রের কথা বলছে বৌদ্ধমত। সম্ভোগকায় বলে এটি কথিত। হিন্দুদের বিশুদ্ধ চক্র আর কী। চতুর্থ চক্র বৌদ্ধতন্ত্রে মহাসুখ চক্র। যা মস্করের শীর্ষদেশে অবস্থিত। একে উষ্ণীষকমলও বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে সহজকায়। ভগবান বুদ্ধের সম্ভোগ কায়া এখানেই পরম প্রশান্তিতে মিশে যাচ্ছে। একে তাই অনেক বৌদ্ধ সাধক নির্বাণ চক্রও বলছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ— এই দুই মতাদর্শই বলে যে, মানবদেহ হল গিয়ে মহাবিশ্বেরই ক্ষুদ্র একটি

অংশ। মহাবিশ্বের সকল সত্য এই মানবদেহে আছে। একই মতাদর্শে হিন্দুতন্ত্র ও বাউল সাধনায়ও মিল রয়েছে। যা বৌদ্ধমতেও সামিল করা যায়। সকলেই বলছে যে, মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দিক দিয়ে দুটো নাড়ি চলে গেছে, যার নাম, ইড়া ও পিঙ্গলা। কেউ বলছেন চন্দ্র ও সূর্য। মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে যে নাড়ি চলে গেছে, তাকে বা হচ্ছে সুষুম্না। অনেকে তিন নাড়িকে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীও বলছেন। বৌদ্ধরা সুষুম্নাকে বলছেন অবধূতিকা। ইড়া তাঁদের ললনা নাড়ি। প্রতিরূপে হিসেবে অনেকে বলছেন ধমন, চন্দ্র ইত্যাদি। পিঙ্গলা হল রসনা নাড়ি। প্রতিরূপে কালি, চমন, সূর্য এইসব। সুষুম্না অবধূতী বা অবধূতিকা। প্রতিরূপে দেবী, প্রজ্ঞা, নৈরাত্মা, যোগিনী, সহজসুন্দরী ইত্যাদি। বৌদ্ধতন্ত্রমতে, এই অবধূতিকা দিয়েই বোধিচিত্ত উর্ধ্বদিকে অগ্রসর হয়ে চক্রে চক্রে বিত্রি ধরনের আনন্দবোধকে সাধক শরীরে অনুভূত করায়। হিন্দুতন্ত্রের শক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী বৌদ্ধতন্ত্রে বৌদ্ধদের দেবী। চক্র হল তাঁদের কায়। এই শক্তি যখন প্রথম নির্মাণ চক্রে উঠে আসে, তখন অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো দাহ অনুভব করা যায়। সেইজন্য বৌদ্ধরা শক্তির এই অবস্থাকে চণ্ডালী বলে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা তাকে বোঝা যায় না বলে ডোম্বী নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে এখানে, এই ডোম্বীর অবস্থান একেবারে দেহনগরের বাইরে। শাস্ত্র দিয়ে একে ধরা-ছোঁয়া যায় না কখনও। আবরণ না কাটলে বৌদ্ধমতে নাঙ্গা না হলে এর সঙ্গ পাওয়া সম্ভব নয়। বৌদ্ধ চর্যাপদে এই নিয়ে অনেক মরমিয়া সঙ্গীত আছে। বাংলার বাউলও এইসব বোধকে সঙ্গীত মুখরতার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে শক্তিকে মাতঙ্গী, চণ্ডালী, শবরী, কিরাতী ইত্যাদি নানা নামে ভূষিতা করা হয়েছে। হিন্দুতন্ত্রের ডাকিনী, শাকিনী, লাকিনী, হাঁকিনীর মতোই। বৌদ্ধ সহজিয়ারা মানবদেহের পাঁচটি চক্রের পাঁচ শক্তির রূপ করেছেন এইভাবে— প্রথমেই চণ্ডালী। তিনি বৌদ্ধ সহজিয়া পঞ্চ মরমিয়া যৌগিক শক্তির এক শক্তি। মূলাধারের শক্তি বৌদ্ধমতে ডোম্বী। স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রের শক্তির নাম নটী। মণিপুর ও অনাহত চক্রের প্রান্তদেশস্থ শক্তির নাম রজকী। অনাহত ও বিশুদ্ধ চক্রের শক্তির নাম চণ্ডালী। সহস্রারের কূটস্থানের যে শক্তি হিন্দুতন্ত্রমতের ব্রাহ্মণের শক্তি বৌদ্ধমতাদর্শে যোগিনীরূপে আখ্যায়িত। যোগিনীকে শূন্যতার আস্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধনির্মাণকায়াতে বা নির্মাণ চক্রে যোগবলে যে শক্তি অনুভূত হয় তা এতই ভয়ঙ্কর যে একে বলা হচ্ছে চণ্ডালী। চণ্ডালী অর্থ চণ্ডা (স্ত্রীলিঙ্গ) ঈপ্ (পরব্রহ্ম) মহিষী। মণিপুর চক্র অঞ্চল ভস্ম হয়ে এলে বলা হয় যে এই স্থানে হুম্ শব্দ দ্বারা চন্দ্র তার কিরণ বর্ষণ করে। চণ্ডালীকে বলা হচ্ছে এখানে দেবী নৈরাত্মা/

অবধূতিকা/প্রজ্ঞা। হেব্রজ তন্ত্রে চণ্ডালী সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভয়ঙ্করী শক্তি চণ্ডা হিসেবে তিনি প্রজ্ঞাস্বরূপা। অলি কথার অর্থ হল বজ্রসত্ত্বা। সুতরাং চণ্ডালী অর্থ হল গিয়ে বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিলন। এই ধরনের মিলনজাত যে তেজপুঞ্জের পঞ্চভূতাত্মক আবেগ তা এখন এই শক্তিমত্তার উদ্ভব হলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখনই বজ্রসত্ত্ব 'হুম' নামকরণে স্পষ্ট হয়। একে হিন্দু তন্ত্রের 'ওঁ' হিবে দেখা যেতেই পারে। মতান্তরে আবার, চণ্ডা হল ইড়া। অলি পিঙ্গলা। এই দুই নাড়িতে যখন প্রবাহিত প্রাণ ও আপনি বায়ুর মিলন হয় বলা হয় তখনই চণ্ডালীর উদয় হয়। নাভি হল মধ্য নাড়ি অবধূতিকা। যা হিন্দুমতে সুষুম্না। এই দুই নাড়ির মিলনে স্থূল সাত্ত্বিকতার পুড়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে পুড়ে গেলেই সুখের উদয়। আবার আরেক মত বলছে যে, চণ্ডা অর্থ হল শূন্যতা ও করুণার মিলন। এই অবস্থার সময়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যায় অপরিবর্তিত এক শাশ্বত পর্যায় লাভ করে। সহজিয়ারা আরও সব শক্তির নাম করেছেন। যোগিনীশক্তি। তিনি বজ্রবান বৌদ্ধ ধর্মেরই দেবী। এঁরা বোধিসত্ত্বের দেবী বা শক্তিরূপে আরও নানা মূর্তিরূপের কথা বলেছেন। মাতঙ্গী। যাঁর অর্থ হল পতিতা স্ত্রীলোক। পিশাচী যোগিনী। যাঁকে চিহ্নিত করা হচ্ছে তুকতাক্‌কারিণী রমণী বলেই। ডাকিনী। অর্থ হল মড়াখেকো রমণী। হিন্দুতন্ত্রমতেও ডাকিনী রয়েছেন। অর্থ হল জ্ঞানী যোগিনী। ডাক কথার অর্থ হল জ্ঞান। তার স্ত্রীলিঙ্গ ডাকিনী। শাকিনী এখানে হলেন আবার সুবেশা যোগিনী। লাকিনী জীর্ণা-শীর্ণা ক্ষুধাতুরা যোগিনী। হাঁকিনী হলেন ভীষণ চিৎকারকারিণী যোগিনী। নাথ সন্ন্যাসীরা কুণ্ডলিনীকে বলেছেন কুলটা। যার অর্থ দাঁড়ায় বেশ্যা। এর কারণও আছে। আজ্ঞা চক্র পার হওয়ার আগে এর ব্যবহার অত্যন্ত চটুল হয়ে পড়ে। অনেকটা বেশ্যার মতো। কখনও স্থূল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়াসক্ততা ফিরে আসছে শরীরে আবার কখনও শক্তি উপরে উঠে শিব না শূন্যতাকে আলিঙ্গন করছে। নাথ সাধু বলছেন, শক্তি স্থূল ও অস্থূল জগতের মধ্যে চপলমতি কুলটার মতোই ঘুরছেন। সাধক তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না কিছুতেই। তাই তাঁরা বলছেন যে কুণ্ডলিনী হলেন কুলটা। নাথরা বৌদ্ধ গুহ্য সাধনার ধারা থেকেই এসেছেন বলে অনুমেয়। শেষে এঁরা বৌদ্ধধারা থেকে বেরিয়ে গিয়ে শৈবতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যান। এঁদের দেহভিত্তিক সাধনাকে বলা হয় কায়া সাধনা। এঁদের যুক্তি দেহকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে মৃত্যুহীন আধ্যাত্ম দশা অনুমেয় হয়। বৌদ্ধতন্ত্র থেকে যা ব্যতিক্রম কিছু নয়। আর হিন্দুতন্ত্র যেহেতু বৌদ্ধধারার কিছু পথ ও পন্থাকে নিজের মতো

করে সাজিয়ে নিয়েছে তাই সেখানেও একীভূত একটা তান থাকা তো স্বাভাবিক। দেহসাধনার মূল কথা হল কুণ্ডলিনীরই জাগরণ। যার বিশেষণ নানা মতে নানা ভাবে এসেছে।

কুণ্ডলিনীশক্তি ও আদ্যাশক্তি কিন্তু আসলে একই শক্তি। পার্থক্য কিছুই খুব একটা নেই। আদ্যাশক্তি হল বিশ্বসৃষ্টির আদি পর্যায়ের শক্তি। ইংরেজিতে বললে বলতে হয় Primordial Energy. কুণ্ডলিনীশক্তি সত্তার মধ্যে বন্ধনে জড়িয়ে থাকা শক্তি। দেহশক্তি। কুণ্ডলিনীশক্তি দেহবন্ধনে জড় হয়ে থাকে। তাই তাকে জাগানোর কথা বলেন সাধক। শক্তি যেহেতু ভারতীয় আধ্যাত্মবাদে মহিলা দ্যোতক তাই তাঁকে সম্মানিয়া করে নিয়ে দেবী হিসেবে ভাবতে থাকেন সাধক। বলা হয় যে, যে সব সাধকরা কুণ্ডলিনীশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জাগৃতি করে নিতে পেরেছেন তাঁরা সব অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হন। ইচ্ছেমতো বিশ্বজগৎ পর্যন্ত পরিক্রমা করতে পারেন। তবে এটা কোনও গালগল্পের ব্যাপার নয়। এর পেছনে যথার্থ এক যৌক্তিকতা আছে। জগতে সবচেয়ে গতিসম্পন্ন হল আলোর গতিবেগ। ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪০০ মাইল প্রতি সেকেন্ডে। বলা হয় যে, মনের গতিবেগ এই আলোর থেকেও বেশি। আলো ছুড়ে দিলে ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা পৌঁছতে যে সময় নেবে তার আগে কিন্তু পৌঁছে যাবে মন। কেউ যদি আমেরিকার চিত্র মনের মধ্যে তুলে নিতে পারেন, তাহলে দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গেই মন আমেরিকা পৌঁছে গেছে। সিদ্ধ সাধকরা এই মানসশক্তির জোরেই সবকিছু করেন। একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যেতে পারেন এই মানসশক্তিতে। কোনও স্থানের কথা মনে করতেই সেখানে উপস্থিত হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানীরা নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভূমিকাকে লক্ষ্য করে যা মন্তব্য করেছেন তা হল : The World is made of mind stuff এখানেও আসছে কিন্তু সেই সাধকের অর্জিত মানসশক্তির ব্যাপার। কুণ্ডলিনীকে সাধক আখ্যায়িত করছেন বিদ্যুল্লতা বলে। এর কারণ হল, কুণ্ডলিনী প্রচণ্ড বায়ুর শক্তির সাহায্যে আঘাতপ্রাপ্ত হন্ধে বিদ্যুৎগতিতে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। যার ফলস্বরূপই সাধক মানসনেত্রে কখনও কখনও দেখতে পারেন বিদ্যুৎ চমকের মতো নানা আলোর ঝলক। তন্ত্রশাস্ত্র একেই বলছে : 'কোটীসূর্য বিভাসিতম।' অর্থাৎ কিনা কোটি সূর্য একসঙ্গে উদয় হলে যেমন দীপ্তি আসবে এই জ্যোতির উজ্জ্বলতা তেমনই। এখন কথা হচ্ছে শরীরের মধ্যে সূর্যের এত এত কিরণরশ্মি জ্বললেও তা শরীরকে পোড়াচ্ছে না বরং সর্বাঙ্গে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। এই অপার শান্তিময়তার আলো সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্র বলছে : 'কোটীচন্দ্র সুশীতলম।' অর্থাৎ এই আলো সূর্যের মতো প্রবল তেজরশ্মির নয়। এই আলোর

মধ্যে সহস্রকোটি চন্দ্রের নরম আলোর সমাবেশ ঘটেছে। মানুষের দেহে কুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধারে ঘুমিয়ে থাকে। মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগাতে গেলে সেখানে ঘুমন্ত কুণ্ডলিনীর উপর ক্রমাগত প্রবল চাপ সৃষ্টি করতেই হবে। চাপ সৃষ্টি না হলে কুণ্ডলিনী আবার সেই নীচে নেমে যাবে। আমাদের শরীরের নিম্নদেশের চক্রে একটি মাধ্যাকর্ষী শক্তি আছে। আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই বলে মেরুদণ্ডের নীচের দিকের শেষ প্রান্তে এই শক্তিটা থাকে। চতুষ্পদ প্রাণীর শরীরে তা ছড়িয়ে তাকে। পাখির শরীরেও একইভাবে থাকে। চতুষ্পদ প্রাণীর শরীরে তা ছড়িয়ে থাকে। পাখির শরীরেও একইভাবে থাকে। তাই পাখি কখনও সোজাভাবে উঠতে পারে না। এই শক্তি তাদের ক্ষেত্রেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবাইকেই নীচে টানে। পশুদের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। পশুরা যে অনেকক্ষেত্রে দুর্যোগ, দুর্বিপাকের ভাষা বুঝতে পেরে আগেভাগে ডেকে ওঠে, পাখিরাও কলরব করে এগুলোর কারণ কিন্তু তারাও অনেকে যোগী মানুষদের মতোই অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বুঝতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে এরকম ঘটলে বলা হয় যে, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। পশুদের, পাখিদের ক্ষেত্রেও তাই-ই বর্তায়। কাকেরা যেমন আগেভাগে বুঝতে পারে বিপর্যয়ের ছায়া। কুকুরেরাও। পিঁপড়েরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস পেলে বিশেষত বর্ষার সূচনায় তাদের ডিমগুলোকে সব নিরাপদ ডাঙায় সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। জ্যোতিষীরাও যে গ্রহবিচার করে লোকেদের নানা ধরনের পাথর পরতে দেন, তার যে কাজ হওয়া অনেক ক্ষেত্রে না হওয়া এসব তো আসলে সেই দেহের উপরে গ্রহগুলোর প্রভাব। সূর্য আর চন্দ্রের প্রভাব তো এক্ষেত্রে অপরিসীম। চেক বিজ্ঞানীরা মহিলাদের উপর চন্দ্রের বিভিন্ন কলার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ঋতুকালে বা মাসিক রজঃস্রাবের সময় তাঁদের শরীরে রীতিমত উত্তেজনা তৈরি করে চন্দ্র। আর সূর্যের প্রভাবের ফলে তো তাপের হেরফেরে পৃথিবীব্যাপী আমাদের গায়ের বর্ণের পার্থক্য ঘটে থাকে। শরীরের মধ্যে যে তাপপ্রবাহের ফল, ক্রিয়া তা যে শক্তিমত্ততা তা তো মেনে নিতেই হবে। সাধক শরীরের সেই শক্তিমত্ততাকে পৃথিবীর শক্তিরূপে নিয়ে যান সেই প্রতীককল্পে। মনঃসংযোগ করে চুপ করে নিবিষ্টতায় বসলেই কিন্তু মূলাধারস্থ শক্তি (কুণ্ডলিনী) উপরে উঠতে থাকে। মূলাধারস্থ শক্তি শ্বাস দ্বারা তাড়িত হয়ে উপর দিকে উঠতে থাকলে প্রথমে ওঠে পেট। বায়ু তখন দেহকে নড়াতে থাকে। তারপর বায়ু দেহচক্রের সুষুম্না নাড়ির মধ্যে বইতে থাকে। তখন শরীরে কম্পন অনুভূত হয়। পেট দিয়ে বায়ু উপরের দিকে ওঠার সময় ভেতরে এমন কম্পন চলতে থাকে শরীরস্থ নাড়িগুলো এত সক্রিয়তা লাভ করে যে রীতিমত দুলতে থাকে। কিন্তু

মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বায়ু যখন তাড়িত হয়ে উপরে উঠতে থাকে তখন যে কম্পন অনুভূত হয় তাকে ইংরেজিতে বললে বলতে হবে Trembling. মেরুদণ্ডের গাঁটগুলো সব বন্ধ থাকে। যখন শক্তি উপরে চলতে থাকে তখন সব গাঁটিগুলোকে ধাক্কা দিতে দিতে মুখগুলোকে খুলে দেয়। তখন শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। বায়ুশক্তির প্রভাবে মুখগুলোর ময়লাগুলো সব সরে গিয়ে অতি ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। তখন বায়ু অতি সহজেই আরও উপরের দিকে উঠে গিয়ে সরাসরি মস্তিষ্কমণ্ডলে প্রবেশ করে। প্রবল বায়ুর চাপে ফুলে ওঠে মস্তিষ্ক। তখনই শরীর হালকা হয়ে ওঠে। তার বাহ্যতা হারিয়ে বসে। এই প্রক্রিয়াকেই সাধক, তান্ত্রিক চক্রে চক্রে সাজিয়ে, শক্তিকে কুণ্ডলিনী করে সাধন অবয়বের পাঠের জন্য সামনে নিয়ে আসেন।

মুড়াগাছার তান্ত্রিক ভোলানন্দ দীর্ঘদিন ধরে ভৈরবী সাধনায় লিপ্ত আছেন। যথেষ্ট তাঁর নামডাক আছে। দূর-দূরান্ত থেকে জনসমাগম ঘটে তাঁর স্থাপিত তারা মায়ের মন্দিরে। তিনি হাত দেখেন। পাথর দেন। শেকড়-বাকড় তাবিজের কারবারও করেন। অনেকক্ষেত্রে মানুষের মনকে ঠিকঠাক পড়ে দিতে পারেন। বর্তমানে তিনি ব্যবসায়ী তান্ত্রিকগুরু হলেও কিছু সাধনযোগ তাঁর আছে এ কথা অস্বীকারের জায়গা নেই। যার জোরে তিনি মন পড়তে পারেন কিছুটা হলেও। তাবিজে শক্তি ভরে দিতে পারেন। শরীরগুণে পাথরের ভেদাভেদ বুঝে ধারণকারীর হাতে তুলে দেন। সেখানে কিছু যা কাজ ওই সাধনযোগের শক্তির জোরে। তবে এক্ষেত্রে ধারণকারীরও মনের বিশ্বাসের জোর আছে। তান্ত্রিক জ্যোতিষের ইচ্ছেশক্তি আর ধারণকারীর বিশ্বাসের একত্র ফলাফলে থাকে এই কাজ হওয়া বা না হওয়া। এগুলো বড় কিছু ব্যাপার নয়। তা এই ভোলানন্দ ভৈরব এক অদ্ভুত কথা বলেছিলেন আমায়। তাঁর শক্তিমত্তা যাচাইয়ের জন্যই আমি যেতাম তাঁর কাছে। বলা ভাল হাত দেখাতে কখনও নয়। তিনি আমাকে পাত্তা দিতেন মূলত দুটো কারণে। এক, তাঁর গুরু দয়াল বাবার ওখানে আমার প্রতিপত্তি আছে। দুই, তিনি মনে করেন আমার তন্ত্রচর্চার নিদর্শনে তাঁর নাম যদি কোনওভাবে উঠে আসে তাহলে যে তাঁর ব্যবসার আরও উন্নতি ঘটবে। এইসব ধারণা বশেই তিনি আমাকে দরবারে স্থান দেন। তবে নিজে কিছুটা শিক্ষিত আর গুরু-আধারের কারণে তাঁরও কিছু অর্জন হয়েছে যে তা তাঁর সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পেরেছি। একদিন শনিবার ধরে গেছি তাঁর দরবারে। বারগুণে সেদিন জনসমাবেশ বেশি। তা দেখাতেই বোধহয় তিনি আমাকে সেদিন আসতে, সেখানে ভোগ খেতে বিশেষ আর্জি রেখেছেন। এতে তাঁরও সুবিধে। গবেষক হিসেবে আমার পরিচয় প্রদান করে তিনি জনসমাবেশে তাঁর তান্ত্রিকগুণ আরও বেশি প্রসারিত করতে পারবেন।

ভোলানন্দ ভৈরবই সেদিন আমাকে বললেন, কুণ্ডলিনীর উত্থাপন কী জানেন আসলে? যা আপনি জানতে এসেছেন।

বললাম— কী?

বললেন— এই যোগ তো প্রকৃতি-পুরুষ যোগ। তারই বাহ্যক্রিয়া হল গিয়ে ভৈরবীযোগ।

বললাম— কীভাবে এই দুই প্রক্রিয়াকে মেলাচ্ছেন আপনি?

— দুই কেন হবে। কুণ্ডলিনী উত্থাপনের শক্তি হল মানসক্রিয়া।

— অবশ্যই। সেজন্যই তো বলছি দুটোকে এক করছেন আপনি কীভাবে?

— মানসক্রিয়া কোথায় ঘটছে?

বললাম— শরীরে।

বললেন— পঞ্চপ্রাণের এই শরীর, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় আর পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের এই শরীর, এর সঙ্গে মন আর বুদ্ধি যোগ দিলে এই সপ্তদশের আধারস্বরূপ হলেন জীবাত্মা। এই জীবাত্মাকেই পরমাত্মা করে নিচ্ছে কুণ্ডলিনীর শক্তিযোগ। শরীর পুরুষ। শরীর শিব। তা লয় হচ্ছে শক্তিতে এসে। পুরুষে প্রকৃতি এসে মিশছে তা এই মানসক্রিয়ায়। শ্বাসে। দমে। প্রাণায়ামে।

— হ্যাঁ।

— তন্ত্র আচার মানে বুঝলেন। আচার। দিব্যাচার, বীরাচার, পশ্বাচার, বামাচার, চীনাচার, দক্ষিণাচার, সময়াচার, কুলাচার— এইসব নানা আচার আছে তন্ত্রে।

বললাম— এর কাজগুলো বা কর্মানুষ্ঠানগুলো?

— কর্মানুষ্ঠান সবই শরীরের। প্রকৃতি-মিলন সবেতেই আছে।

বললাম— তাহলে তন্ত্র মানেই প্রকৃতি সাধনা।

বললেন— অবশ্যই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে প্রকৃতির মানে আপনি করে নিচ্ছেন যে ভৈরবী। এখানে বিপত্তি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে প্রকৃতি কী?

— প্রকৃতি অবশ্যই নারী।

বললাম— তাহলে তো সেই মিলনযোগই এল!

— এল। তবে দিব্য, দক্ষিণ, পশ্বাচারে যে প্রকৃতিযোগ তা পূজা, জপ আর শ্বাসক্রিয়ার। সেখানে সাধক শরীর প্রকৃতি হচ্ছে। শক্তি আসছে তাতে। শরীর প্রকৃতি হচ্ছে। শরীর ছিল পুরুষ। কুণ্ডলিনীর জাগরণে প্রকৃতি আসছে শরীরে। শিব আর শক্তি এখানে এভাবে মিলিত হচ্ছে। সময়াচার যেটা, সেখানেও মানসপূজা।

— বাকীগুলো সব তাহলে...

— বামাচার, বীরাচার, চীনাচার ও কুলাচারে চলে পঞ্চ ম কারের সাধনা। পঞ্চ ম কারের সাধনায় পঞ্চ ম কারকে ব্যবহার করতে হয়। চক্রানুষ্ঠান চলে। আমি বামাচারী মতের। আমাদের প্রকৃতিযোগ আছে।

— চক্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে বইতে পড়েছি কিছু। অমাবস্যাতে চক্রানুষ্ঠান শ্মশানে হয় শুনেছি। এ কি আজকে সম্ভব?

— কথাটা ঠিকই বলছেন। শ্মশান আজ আর সাধনার নিরাপদ ক্ষেত্র নয়। সেখানে নানা অসামাজিক কাজ হয়। এখন গুরু নির্দেশে আশ্রমেই মিলনযোগ ঘটে। সেখানে যে চক্রানুষ্ঠান হয় সব সময় তা নয়। আমার ক্ষেত্রে তো তা হয়নি। শুনেছি গুরুদেবরা চক্রানুষ্ঠানে বসতেন। তেনারা পুরনো কালের মানুষ। তাঁদের সময় সম্ভব ছিল। তবে বামাচারী, বীরাচারী, কুলাচারীদের ভৈরবী সাধনা করতেই হবে।

বললাম— পঞ্চ ম কারের সাধনা মানেই ভৈরবী আসন পাততে হবে। তাই তো?

— ঠিক তাই। স্থূল মদ পান যেমন করতে হয় মৎস্য, মাংস খেতে হয় তেমনই স্থূল মৈথুনে তো আসতে হবেই। দুই শরীরের মৈথুনে নির্বাণ কলা নামবে শরীরে।

— সেই বোধ কেমন?

— সে কী আর বলে বোঝানো যায়। গুরু বলতেন জগত স্ত্রীময়। সকলকে জননীবোধে নমস্কার করবে।

— সকলে যদি জননীই হবেন তাহলে কী সাধক মায়ের সঙ্গে মিলিত হবেন?

— আপনার এ লাইনে ঘোরাফেরা বহুদিনের। গুরুমুখে আপনার নাম শুনেছি। আমার আর মলিনা ভৈরবীর মিলনযোগে তারা ভৈরব আর অচলা মা ছিলেন। তাঁরাও মিলনযোগে রত ছিলেন সেই সময় গুরু নির্দেশেই তা কিন্তু হয়েছিল। তাঁরাও আপনার কথা বলেন। আপনি তো জানেন এসব। জননী হল ভাব। কামিনীও ভাব। যখন সাধক মিলনে মাতেন তখন তিনি কামিনীভাবে থাকেন। মিলন শেষে আবার জননী হয়ে ওঠেন। মিলন কী জানেন? তন্ত্রমতের যুগল মিলন।

বললাম— যুগল মিলন তো বাউলের কথা।

— তা ঠিক। আমাদের হল প্রকৃতি-মিলন।

— ব্যাপারটা তো একই।

রেগে উঠলেন ভৈরব। সুর চরা করলেন।

— না এক মোটেও হল না। শক্তি আমাদের দেবী। চক্রে চক্রে দেবীর বাস। শরীর শিব হলে তবেই সেখানে দেবী অধিষ্ঠাত্রী হন। নচেৎ নন। বাউল ঈশ্বর মানেন কই! সেখানে দেবদেবী নেই।

বললাম— ওঁরা নিজেকে তো কৃষ্ণ মনে করেন আর সঙ্গিনীকে রাধা।

— কৃষ্ণ হওয়া কী মুখের কথা! কৃষ্ণ হল যোগের আধিপত্য। তন্ত্রের মৈথুনে সেই আধিপত্য আসে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীসের আধিপত্য?

বললেন— শিব আর শক্তির। তন্ত্রে মূলক্রিয়া প্রকৃতি-সাধনা নয়। সাধনার একটা অঙ্গ।

— তা ঠিক। তবে প্রকৃতি-সাধনার মূল উদ্দেশ্য তো বিন্দুধারণ। বাউল সাধনেও তো তাই।

— বিন্দুধারণের থেকেও মূল কথা কী জানেন?

— কী?

— তন্ত্র হল শরীরধারণ। প্রকৃতি সহযোগ শরীরের অঙ্গ মাত্র। সেটার গুরুত্ব নেই।

বললাম— গুরুত্ব শুধু ব্যাভিচারে।

বললেন— আপনি জেনে-বুঝে সব বাঁকা কথা কইছেন। মানছি অহরহ সঙ্গী বদল করেন অনেকে। ভৈরব পাল্টান ভৈরবীকে, আর ভৈরবী ভৈরবকে। সকলে যে ঊর্ধ্বরেতা দান করতে পারেন তাও নয়। এসব ভেক। অনাচার। পথের ছত্রাক। কিন্তু পথটা তো সবুজ। শরীরে মাতোয়ারা। যার লক্ষ্য শক্তি বই অন্য কিছু তো কখনও নয়।

তন্ত্রে প্রকৃতি-সাধন বলা ভাল উপাস্য শক্তিপুজোর একটা অংশবিশেষ। ভৈরব এক অর্থে ঠিকই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতি-সাধন তান্ত্রিকদের ককনও মল সাধনা নয়। তাঁদের সাধনার মূল কাঠামো হল চক্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া শক্তিকে। একেবারে প্রথম চক্রে যখন শক্তির বা প্রকৃতির জাগরণের আয়োজন শুরু হয় তখনই কিন্তু তান্ত্রিক মন্ত্র জপ শুরু করেন। ক্রিয়াগুলো এখানে সব অঙ্গ-রূপের অনুষ্ঠান। নারীকে তাঁরা শক্তির সাক্ষাৎ অংশস্বরূপ ভাবেন এবং নিজেকে শিব-ভাবে এনে কুণ্ডলিনীর দ্বারা উত্থিত শক্তিকে নারী বা প্রকৃতি মনে তার সঙ্গে মিলে যেতে থাকেন। এটাই তাঁদের শিব আর শক্তির পূর্ণাঙ্গ মিলনযোগ। তন্ত্র হিন্দু নারীকে অতি উচ্চ আসন দিয়েছে। বলেছে যে নারী হলেন সাক্ষাৎ মহামায়ার অংশ। কুমারী, যুবতী পুজো তাই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র',

'কামধেনু তন্ত্র', 'নিরুত্তর তন্ত্র', 'বৃহন্নলী তন্ত্র', নিরুক্তর তন্ত্র', 'গন্ধর্ব তন্ত্র', 'কামাখ্যা তন্ত্র', 'মহাচীনাচার ক্রম', 'নির্বাণ তন্ত্র' ইত্যাদি যত প্রকার তন্ত্র আছে সব জায়গাতেই একই কথা প্রায় বলা হয়েছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রকৃতি হলেন শক্তিরূপা। নারী হলেন দশমহাবিদ্যার রূপ। নারী ছাড়া তন্ত্র বৃথা। সবখানেই নারীর নানা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর স্তুতি। বাংলায় তন্ত্রসাধনার জন্য কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটি তান্ত্রিকমহলে বিশেষ সমাদৃত। সেখানে এই প্রকৃতি সাধনার রূপটি নিয়ে আলোচনাকালে বলা হয়েছে বিভিন্ন অংশভাগে বিভিন্ন কথা। কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল সবখানেই প্রকৃতির জয়জয়কার। যেমন বলা হয়েছে যে, সমস্ত জগত স্ত্রীময় চিন্তা করার কথা। বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা নারীকেও দেবীবোধে নমস্কার করার কথা। তাঁদের প্রহার, নিন্দা, অপ্রিয় কর্মে ব্যবহার না করার কথা। স্ত্রীলোক দেবতা, স্ত্রীলোক জীবন, স্ত্রীলোককেই অলংকার জ্ঞান করার কথা। স্ত্রী-সঙ্গী হয়ে থাকার কথা, স্ত্রী-হস্তে ফুল তুলে; আনা জল দিয়ে; বস্ত্র দিয়ে দেবতাকে নিবেদন করার কথা। তেমনই আবার বলা হয়েছে যে, শক্তিই শিব, শিবই শক্তি। যে এই শক্তিরূপ বুঝতে পারে না সে নারকী। বলা হয়েছে, রাত এক প্রহর গত হলে সাধক শরীরে ধূপগন্ধ মেখে সর্বাঙ্গে চন্দনচর্চিত করে— রক্তচন্দন, রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরে পান মুখে দিয়ে কুলগৃহে গিয়ে কুলনায়িকার অর্চনা করবে। কুলনায়িকা হবে নটী, বেশ্যা, রজকী। ব্রাহ্মণী কেবল ব্রাহ্মণের শক্তি হবে। নায়িকাকে পুষ্পশয্যায় রেখে অর্চনা করার কথাও বলা হয়েছে। শক্তিকে, প্রকৃতিকে বা নারীকে, নায়িকাকে দীক্ষিতা হতেই হবে। শক্তি অদীক্ষিতা হলে তার কানে মায়া বীজ দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। শক্তিকে এভাবে শোধন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে যে শক্তির উপরে একাগ্রচিত্তে পঞ্চ ম-কারে পুজো সারার কথা। সিঁদুর দিয়ে শক্তির কপালে সুন্দর ত্রিকোণযন্ত্র আঁকার কথা। ত্রিকোণের মধ্য গণেশ ও তিন কোণে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পুজো করা; শক্তির দুই স্তনে বসন্ত ও মদনের পুজোও করতে বলা হয়েছে। নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, দক্ষিণ চরণ থেকে মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত এবং মস্তিষ্কের বাম দিক থেকে বাম পদ পর্যন্ত কামকলা ও সোমকলার অর্চনা করার কথা। পরে মস্তক থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রের ষোড়শ কলার অর্চনা করার কথা। শক্তির কুলাগারে তিনটি নাড়ির কথাও বলা হয়েছে তন্ত্রে। চান্দ্রী নাড়ি জল, সৌরী নাড়ি রজ এবং আগ্নেয়ী নাড়ি বীজ বা বীর্য ক্ষরণ করে। এই তিন নাড়িকে অর্চনা করার কথাও বলা হয়েছে। রক্তচন্দনচর্চিত মদনাগারে প্রথমে ভগমালা মন্ত্র উচ্চারণ করে ত্রি-তারা মন্ত্র পাঠ করে 'ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং জং ব্লং ভগমালিন্যৈ নমঃ ঐ হ্রীং শ্রীং' এই মন্ত্রে

ধূপ দিয়ে অর্চনা করার কথা বলা হয়েছে। মদনাগার যে যোনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপরই বলা হয়েছে সাধকের নিজ লিঙ্গের অর্চনা করার কথা। সেখানে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলে নিজ লিঙ্গকে পুজোর উল্লেখ আছে। তারপর আবার শক্তির অঙ্গে বা প্রকৃতি-শরীরে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা ইত্যাদি দেবতার অর্চনা করার কথা বলা হচ্ছে। ত্রিকোণের মধ্যে অর্থাৎ আবারও যোনির মধ্যে গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পুজো সারার মতো অবধূতেশ্বরী, কুব্জা, কামাখ্যা, সমরা, চক্রেশ্বরী, কালিকা দেবীর অর্চনা করার কথাও বলা হয়েছে। এরপর শক্তিকে তাম্বুল বা পান খেতে দিয়ে তার অনুমতি নিয়ে কুলাগার অর্থাৎ কিনা নারীর যৌনাঙ্গে বা যোনিতে নিজ শিব নিক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে আবারও সেই যথোচিত মন্ত্রপাঠে। নারীকে বা প্রকৃতিকে/শক্তিকে পান দেওয়ার অর্থ যৌনাঙ্গ চিহ্নরূপটিকেই দেখিয়ে দেওয়ার স্মারণিকা ছাড়া আর কী। যার মধ্যে নিজ শিব অর্থাৎ কিনা সাধকেরই লিঙ্গ নিক্ষেপ হবে। সম্ভোগকালে আবারও মন্ত্রপাঠ। তখন অষ্টোত্তরশত ত্রিভুবনেশ্বরীর মন্ত্রজপ। পরে বীর্যপাত বা শুক্রত্যাগের সময় এই মন্ত্রই আবার 'স্বাহা' যোগে পাঠ। এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে বীর্যকে সাধক মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়ে নিচ্ছেন না। ক্ষরণ হচ্ছে তার। বাউল বিন্দুধারণের কথা বলেন। অর্থাৎ কিনা বীর্যকে ঊর্ধ্বরেতা দান করার কথা। কিন্তু এখানে বিন্দুচ্যুতি ঘটছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে 'বিন্দুধারণ' বা বাউল কথিত আরেক প্রতিশব্দ 'গুরুবস্তু'/ 'কৃষ্ণবস্তু'-রক্ষা তন্ত্রসাধনার মূল ভরকেন্দ্র নয়। সেখানে শরীরে শক্তিমত্ততার স্বরূপকেই যেন বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থে প্রত্যক্ষদর্শী প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় যে ভৈরবীচক্রের বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে 'তন্ত্রসার'-এ সংগৃহীত 'শিবাগম', 'উত্তর তন্ত্র', 'জ্ঞানার্ণব তন্ত্র', 'কুলার্ণব তন্ত্র'-এ বর্ণিত ক্রিয়াকলাপগুলোর সঙ্গে বেশ একটা সুসামঞ্জস্য আছে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে কেবল ঊর্ধ্বরেতা দানে বা বাউল কথিত 'বিন্দুধারণের' মধ্যে। ভৈরবীচক্রে প্রমোদকুমার স্ত্রী-পুরুষের সান্নিধ্যবশত উভয়েরই শরীর মন স্ফূর্তিতে মেতে ওঠার যে মুদ্রা অবয়বটি চিত্রিত করেছেন তাতে স্পষ্ট যে সাধক নিজ বীর্যকে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে ঊর্ধ্বরেতা দান করতে সক্ষম হয়েছেন। 'জ্ঞানার্ণব তন্ত্র'-এ বলা হয়েছে যে, শিবশক্তি যোগের নামই যোগ। এই যোগে শীৎকার মন্ত্রজপ, বাক্য স্তব, আলিঙ্গন কস্তুরী, চুম্বন কর্পূর, নখক্ষত দন্তক্ষত প্রভৃতি বহুবিধ কুসুম মথন তর্পণ ও বীজপাত বিসর্জন বোদ্ধব্য। 'কুলার্ণব'-এ আবার আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দন, দর্শন, স্পর্শন, যোনিবিকাশ, লিঙ্গঘর্ষণ, প্রবেশ ও স্থাপন শক্তিপুজোর এই নয় পুষ্পের বর্ণনা রয়েছে। 'জ্ঞানার্ণব'-এ বলা হয়ছে কুলদ্রব্য অর্থাৎ শুক্রবস্তু হল

শিবশক্তিময় জীবামৃত। তা পর-ব্রহ্মস্বরূপ বলেও অভিহিত করা হয়েছে এখানে। বৌদ্ধতন্ত্রে প্রকৃতি-মিলন হিন্দুতন্ত্রের মতোই শরীরগত শিব-শক্তি ক্রিয়া যেমন, তেমন এখানে বাউলের মতো সঙ্গিনী শরীরের পরিভ্রমণের নানা দশা-অন্তঃদশা আছে। বলা ভাল বৌদ্ধতন্ত্র সাধনা আর বাউল সাধনার মূলক্রিয়া এক এবং অভিন্ন। দুই সাধনাতেই বায়ুকে আয়ত্ত করে নিয়ে বাম আর দক্ষিণ নাড়িতে রুদ্ধ করে দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে বিন্দুকে উঠিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বরেতা দান করাই মূল ক্রিয়া। বাউল তো বলেনই শ্বাস আর দমের কাজের উপরই তাঁদের মূলসাধনা নির্ভর করে।

বাউল বলেন, দেহমিলনের সময় কামই কামের একান্ত পরিণাম। কামকে উপভোগ্য স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই নরনারী নানা প্রত্যঙ্গে নানারূপ ক্রিয়াকরণে মেতে ওঠেন। কেন না কামকে তাঁরা চূড়ান্ত রূপে ভোগ করতে চান। তার জন্যই 'কামশাস্ত্র'-এ যৌনমিলনের প্রস্তুতিস্বরূপ নানা আলিঙ্গন, চুম্বন, দেহে নখচিহ্নের স্মারণীক অধ্যায়, দন্তক্ষতের রূপকল্প, ভঙ্গি বা আসন, শীৎকার ধ্বনির নানা রূপের কৌশলক্রিয়ার কথা লেখা হয়েছে। যাতে কাম, সম্ভোগক্রিয়া একেবারে উত্তেজক অভ্যাসে চলে আসে। নরনারী তৃপ্তি লাভ করেন। বাস্তবিক এই তৃপ্তি। রিপুর উত্তেজনা থেকেই এই আকর্ষণ, মিলন। যে মিলনে তৃপ্তির সঙ্গে সন্তান জন্মেরও বিধিবদ্ধ অধ্যায় আছে। শাস্ত্রে যে বৈদিক বাণের কথা বলা হয়েছে তা হল, কাম-প্রবর্তিত দেহমিলন এবং এতে সন্তান সৃষ্টির ব্যাখ্যা। বাউল বলেন, বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁদের সাধনার মধ্যে যে পঞ্চবাণের ক্রিয়া রয়েছে বা যেটা বৈদিক বাম সেখানে যে ক্রিয়া তাতে রয়েছে কেবল চূড়ান্ত সম্ভোগ-ক্রিয়ার মাধ্যমে কামকে উপভোগ। এই কাম ভোগমূলক। বাউল গুরু, প্রবক্তারা, পদকর্তারা এই বিষয়েই নিদান হেঁকেছেন। লালনের পদে, গুরু সিরাজ সাঁই লালনকে বলেছেন এই পঞ্চবাণের ছিলা কেটে ফেলতে : 'পঞ্চবাণের ছিলা কেটে/ প্রেম যজ স্বরূপের হাটে, /সিরাজসাঁই বলে রে, লালন, / বৈদিক বাণে করিস নে রণ, /বাণ হারায়ে পড়বি /রণ-খোলাতে হুবড়ি খেয়ে।' বাউল মত, দেহকে কামক্রিয়ার ভেতর না রেখে দেহকে ব্যবহার করতে হবে স্বরূপতত্ত্বকে জানার জন্য। তার জন্যই বাউল সাধক দেহ থেকে কামকে তুলে ফেলে প্রেমে রূপান্তরিত করে ফেলেন। ঠিক যেমন দুধ থেকে সর তুলে মাখন বা ঘি বানানো হয়। কীভাবে বাউল সাধক এই পঞ্চবাণের ছিলা কেটে ফেলেন?

পঞ্চবাণের প্রথমটি হল মদন। বাউল বলেন এটি কামরতির সিঁড়ি। এই সিঁড়ি তিনি টপকে যান কীভাবে? অমাবস্যায় প্রথম মিলনে সঙ্গিনীর দেহের স্পর্শকাতর

প্রত্যঙ্গগুলোকে তিনি স্পর্শ করে সঙ্গিনীর শরীরে কামের বাণকে আরও যেন শানিয়ে নেন। বাউলের অমাবস্যা সঙ্গিনীর রজঃপ্রবৃত্তির দিন। তাঁরা বলেন তিন দিনের রজযোগে উল্টা স্রোতে নৌকা বাইতে হয়। তন্ত্রেও প্রকৃতি-মিলন হয় কিন্তু ভৈরবীর রজঃযোগের দিন। আবার অমাবস্যার তিথি যোগেও প্রকৃতি-মিলন হয় তবে সে মিলনে ঊর্ধ্বরেতার ব্যাপার থাকে না। বাউল সঙ্গিনীর শরীরে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন মদন পর্যায়েই। এইক্ষেত্রে যে স্পর্শযোগের কথা বলেন তাঁরা, সেই স্পর্শ চলে করনখে, পদনখে, গলায়, অধরে, জিহ্বায়, ললাটে। বাউল বলেন সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রস্পর্শর কথা। করনখে দশ, পদনখে দশ, দুই গলায় দুই, অধরে এক, জিহ্বায় এক, ললাটে দেড়। মূলত দৃষ্টিস্পর্শর কথা তাঁরা বলে থাকেন। কীভাবে হয় এই চক্ষুস্পর্শ? আমাদের শরীরস্থ সুষুম্না নাড়ি মূলাধার চক্র থেকে উৎপন্ন হয়ে নাভিমণ্ডলের যে ডিম্বাকৃতি নাড়ি চক্র আছে, তার ঠিক মাঝখান দিয়ে উঠে গিয়ে সহস্রার চক্রের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সুষুম্না নাড়ির বাঁ দিকে রয়েছে ইড়া নাড়ি। দক্ষিণ বা ডান দিকে পিঙ্গলা নাড়ি। এই দুই নাড়ি দু'দিক থেকে উঠে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ চক্রকে ধনুকাকারে বেষ্টন করে আছে। ইড়া দক্ষিণ নাসাপুট পর্যন্ত এবং পিঙ্গলা বাম নাসাপুট পর্যন্ত গমন করেছে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে সুষুম্না নাড়ি ও মেরুদণ্ডের বাইরে গিয়ে পিঙ্গলা নাড়ি চলে গেছে। বাউল সাধক দক্ষিণের পিঙ্গলা নাড়িতে কিছু সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত করে দক্ষিণ চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখেন। মদন বাণের সময় ডান বা দক্ষিণ নাকে শ্বাসগ্রহণ করে সঙ্গিনীর শরীরে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন। শোষণ বাণের সময় তাঁরা যোগাভ্যাসের ক্রিয়াকে চলিত করেন। লিঙ্গনালে উত্থিত শুক্রকে তাঁরা ঠেকিয়ে রাখেন। স্তম্ভন বাণে যুগল শরীরেই একটা স্থিরতা আসে। শ্বাসাদির কাজ কিন্তু কিছুটা বাউল সঙ্গিনীও করে থাকেন। বিশেষত কুম্ভক ক্রিয়া। হিন্দুতন্ত্রে ভৈরবীর ক্ষেত্রেও তা কখনও ব্যতিক্রম নয়। স্তম্ভন বাণের সময়ই দেহের বিভিন্ন স্পর্শকাতর অংশ স্থির অচঞ্চল হয়ে পড়ে। সাধক তখন চরম দশায় উত্তীর্ণ হয়ে যান। সম্মোহনের সময় তাঁদের দেহস্মৃতি লুপ্ত হয়। বাহ্য দেহে বিপুল আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়ে পড়ে। এরপরই তাঁরা বলেন পরমাত্মার বিকাশ ঘটে। নাভিপদ্ম থেকে হৃদয়পদ্মে এই অনুভূতির জাগরণ ঘটে। এতে তাঁরা নানা সুমধুর ধ্বনি শুনে থাকেন। পরিশেষে যখন চরম পরিণতি আসে তখন আজ্ঞা চক্রের দ্বিদলপদ্মে তাঁরা 'মনের মানুষ'কে উপলব্ধ করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হল বাণক্রিয়া যদি শুধু চক্ষুস্পর্শেরই হবে তবে স্তম্ভন বাণের সময় দেহ স্থির অচঞ্চল হয়ে পড়ছে কেন? যেটা মনে হয় চন্দ্রস্পর্শ, অষ্টমচন্দ্র স্পর্শ এগুলো কোনওটাই আসলে চক্ষুস্পর্শ নয়। প্রত্যঙ্গকে প্রত্যক্ষ

ছোঁয়া। মদনের সময়ই তা শুরু হয়। শ্বাসক্রিয়া দিয়ে সাধক সঙ্গিনীর অঙ্গ স্পর্শ করেন আর সঙ্গিনীও শ্বাসাদির চোখে সাধকের অঙ্গকে নিজ শরীরে একীভূত করে নেন। 'কামশাস্ত্র' মিলন ক্রিয়ার সময় চারপ্রকার আলিঙ্গনের কথা বলেছে। সঙ্গিনী সঙ্গীর দিকে আসতে থাকলে যদি তাকে আলিঙ্গন করা সম্ভব না হয়, অথচ সঙ্গিনীকে সঙ্গীর অনুরাগ জানানোর প্রবল ইচ্ছে তখন সঙ্গী অন্য কোনও কাজ করবার ছলে, বুদ্ধি করে সঙ্গিনীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার শরীরে নিজের শরীর স্পর্শ করবে। একে স্পষ্টক আলিঙ্গন (Slight Contact) বলে। সঙ্গী কোনও নির্জন স্থানে থাকলে তাকে সেই অবস্থায় দেখে সঙ্গিনী যদি কিছু নেবার ছলে সেখানে গিয়ে স্তন দিয়ে সঙ্গীকে আঘাত করে তখন সঙ্গী সঙ্গিনীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে যদি নিজের শরীরে চেপে রাখে সেটা বিদ্ধক আলিঙ্গন (Breast Preassure)। অন্ধকার জায়গাতে সঙ্গিনীর শরীরের সঙ্গে সঙ্গীর শরীরের যে মিলন চলে সেটা উদঘৃষ্টক আলিঙ্গন (Huffiong Embrace)। আর সঙ্গিনী এবং সঙ্গী যখন উদঘৃষ্টক আলিঙ্গনে আবদ্ধত অবস্থার কথা ভেবে একা একাই নিজের দু'হাত চেপে নিজেকে জড়িয়ে নেয় সেটা পীড়িত আলিঙ্গন (Pressiverubbing Emberace)। কামশাস্ত্রে চুম্বনের সঙ্গে পাঁচটি ব্যাপারকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে— চুম্বন, নখক্ষত, দন্তক্ষত, প্রহণন ও শীৎকার। তবে 'কামশাস্ত্র' কখনওই মিলনক্রিয়ার সময়, তিথি নির্দেশ করেনি। কেন না সেখানে কামই মুখ্য। কামই আনন্দ। কামই উপভোগ। বাউল তা তো বলছে না। বলছে কামকে 'ওজে' বা 'মিছরিতে' বা 'প্রেমে' রূপান্তরিত করে নেবার কথা। তার জন্যই এসব পথ নির্দেশিকা। মিলন কর্মসূচিকে সামনে রাখা। গুরু নির্দেশিকার মাধ্যমে তৈরি হওয়া। শরীর প্রস্তুত করা। চারুচন্দ্রের মাধ্যমে সাধনায় ব্রতী হওয়া। নিজের মলকে গায়ে মাখা ও কিছুটা তার খাওয়া, মূত্রকে নারকেল মালাতে ধরে রাখা যতবার তা হবে— সেই মূত্রকে আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া। গুরুর ধরে রাখা সঙ্গিনীর রজকেও অমৃত মনে করে পান আর বীর্যকে শরীরে ধারণ পদ্ধতি শিখে রাখা। যখন এভাবে শরীর প্রস্তুত হয়ে উঠবে তখনই মিলনযোগ। তবে এই প্রক্রিয়া সাধন সঙ্গিনী করেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয় আছে। সঙ্গিনী শ্বাস আর দমের কাজটি যে শেখেন এটা হলফ করে বলা যায়। কেন না সঙ্গিনীর সহায়তা না হলে একা বীর্যরক্ষা কখনও সম্ভব না। তান্ত্রিক যেমন নারীকে মহামায়ার ভূষণ পরান তেমনই বাউল সাধক বলেন নারী শরীরের মধ্যে ষড়দল, চতুর্দল, শতদল পদ্ম আছে। কিন্তু তা শুধু নারী শরীরে থাকবে কেন? পুরুষ শরীরেও চক্রপদ্ম তো রয়েছে। বাউল নারীর শরীরে এই পদ্ম, এই পদ্ম বলে সাধন সঙ্গিনীকে উচ্চাসনই দিতে চান এটা

ঠিক। এই পথটা তো মূলত নারীর উচ্চাসনেরই। সম্মানেরই শ্রদ্ধার। লালন ফকির, চণ্ডীদাস গোঁসাই, হাউড়ে গোঁসাই, পদ্মলোচন, দুদ্দু শাহ প্রভৃতি সহজিয়া সাধকরা তাঁদের সব ক্রিয়াকরণের গানে নারীকে যে সম্মান প্রদান করেছেন সে সম্মান বাস্তবে নারীর বা সাধনা সঙ্গিনীর এখন নেই। তার কারণ অবশ্যই পুরুষের, সঙ্গীর, সাধকের ব্যাভিচার। না হলে আমাদের লোকায়ত সাধন-আধার কিন্তু নারীকে যোগ্য আসনই দিয়েছিল। কী তন্ত্র, কী বৈষ্ণব, কী বাউল সাধনে। বাউল, সঙ্গিনীটিকে 'রাধারানি', 'মনের মানুষী' ইত্যাদি বিশেষণের মালা পরান ঠিকই যেমন তন্ত্রে ভৈরব সঙ্গিনীকে, ভৈরবীকে, 'মা' বলে সম্বোধন করেন। আসলে এই বিশ্লেষণ, সম্বোধন, মান্যতা, যথাযোগ্য প্রাপ্য স্বীকৃতি সব ছিল প্রকৃত সাধকদের, যাঁদের দেখা সচরাচর এখন মেলে না। প্রান্তিক ধর্মমতে ব্যভিচারের দাপটে যে গুটিকতক মানুষ এখনও সাধনভজনে রয়েছেন তাঁরাও যেন একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছেন। আসল কথা হল, যে ধর্মমতে ও পথে শরীর মিলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে মুখ্য ও গৌণ যেভাবেই হোক না কেন ব্যবহারিক বোধে আসবে সেই ধর্মে ব্যভিচার আসবে না, যৌনাচারে দাপট, লোভ-লালসা-শরীরভোগের ইতিহাস থাকবে না তা কখনও হতেই পারে না। তাই বর্তমানে যে যৌন অনাচারে ছেয়ে গেছে এইসব প্রান্তিক ধর্মপথ তাতে আশ্চর্যের প্রমাদ কিছুই নেই। এটা অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার নয়ই। বরং যথেষ্ট স্বাভাবিক।

বাউল সাধনে মিলন সময় নির্ণীত। তন্ত্রেও তাই। ইড়া নাড়িতে যখন পুরুষের শ্বাস বইতে থাকে অর্থাৎ চন্দ্রস্থ বাঁ নাকে আর সঙ্গিনীর পিঙ্গলা নাড়িতে বাঁ নাকে শ্বাস চলে যখনই মিলনের প্রশস্ত সময় বলে থাকেন বাউল গুরু। এই সময়টা রাতে খাবার ঘণ্টা দুই পরে আসে বলে বাউল বলে থাকেন। এটিকে সাধক অর্ধপ্রহর হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। সময়কাল তাঁরা বলেন দেড় থেকে দুই ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এই ক্রিয়া আরম্ভের সময় প্রথম চলে আলাপন। পরস্পর স্পর্শ করেন পরস্পরের প্রত্যঙ্গগুলোকে। তারপরই শুরু হয়ে যায় দমের খেলা। অনেক সাধক বলেন এই সময় কাম-বীজ জপ করতে হয়। আর সঙ্গিনীকে কামগায়ত্রী।

এই জপক্রিয়া কেন করা হয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রবীণ প্রাজ্ঞ বাউল সাধক স্মরজিৎ খ্যাপাকে। নৈহাটির সাহেব কলোনির আশ্রমে বসে তিনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে এও জানিয়েছিলেন তিনি হলেন স্মরজিৎ দাস বাউল। স্বয়ং ভবা পাগলা তাঁর গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে খ্যাপা টাইটেলটি দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তিনি স্মরজিৎ খাপা।

বললেন— কাম-বীজ ও কাম-গায়ত্রী জপে সাধক-সাধিকার শরীর রাধা-কৃষ্ণ হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী এই মন্ত্র?

বললেন— 'কাম বীজ ক্লীং। ক্লীং কামদেবায় বিদ্বহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নো কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ।'

— এগুলো কী?

— সব হল কৃষ্ণবীজ। শরীরে কৃষ্ণ জাগানো।

বললাম— রাধার বীজমন্ত্র?

— কৃষ্ণই চৈতন্য। তার বীজমন্ত্র হল— 'ক্লীং কৃষ্ণচৈতন্য নমঃ'। রাধার বীজমন্ত্র সঙ্গিনী জপেন— 'ওঁ শ্রী হ্রীং রীং রাধিকায় স্বাহা।' রাধিকার গায়ত্রীমন্ত্রও আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেটা কী?

— 'স্লীং রাধিকায়ৈ বিদ্বহে প্রেমরূপায় ধীমহি তন্নো রাধে প্রচোদয়াৎ।' এগুলো আর কিছুই নয় খ্যাপা। সব হল গিয়ে আসলে রক্ষামন্ত্র।

— কীসের রক্ষা?

— কাম থেকে রক্ষা। মিলনে শরীরের কামকেই স্মরণ করে সাধক আর সঙ্গিনী তাকে সরিয়ে দেন।

এভাবে কতখানি কাম সরে সে অন্য প্রশ্ন। কিন্তু প্রবীণ সাধকের বিশ্বাস, ধর্ম, পরমের আখরকে আমি প্রশ্নাতীত জায়গায় আনছি না। বলছি নারীর বিশ্বাসেরও কথা। এমন অনেক সঙ্গিনীকে আমি চিনি যাঁদের সঙ্গীরা ছেড়ে চলে গেছেন। অনেকেই এখন বাউলের পরিত্যক্তা রমণী। ভিক্ষাজীবী। অনেকে আবার গর্জে উঠেছেন সমানতালে গানে। গানকেই পেশা করে নিয়েছেন। এই নিয়েও কথা উঠেছে। গুঞ্জন চলছে সমানে। বাউল গায়িকার সেইদিকে হেলদোল নেই। বাউল বলেন, মেয়েদের গান আখড়ায়। বারোয়ারী মঞ্চে তাঁরা গাইতে পারবেন না। এটা তাঁদের সাধনার নিয়ম নয়। মেয়েরা গাইবেন আশ্রমে। আখড়ায়। এ বিশ্বাস এখনও অনেক মেয়ের আছে। আবার অনেকেই বুঝে গেছেন কীভাবে তাঁরা সবদিক থেকে নির্যাতিতা হচ্ছেন। সুমিত্রা দাসী, কৃষ্ণা দাসী, কালীদাসী বৈষ্ণবী— এইসব বাউল গায়িকারা আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁদের জীবনকাহিনি। সঙ্গীর চলে যাওয়া অন্য কোনও নতুন শরীরের খোঁজে। এভাবেই বলেছিলেন সুমিত্রা।

— সঙ্গিনী দম-শ্বাস ধরে তাঁকে সাধক করল। কিন্তু সুনাম হল তাঁর। সঙ্গিনী কী পেল? নেচেকুঁদে বাউল গাইবেন মঞ্চে। পয়সা নেবেন। আমরা গাইলেই

দোষ? আমরা কি গাইতে জানি না? দরকার নেই আমার অমন সাধকের। গানই আমার এখন সাধনা।

সুমিত্রা, কৃষ্ণা, তুলিকা, সুভদ্রাদের এখন খ্যাতি হয়েছে গানের। তাঁরা দল চালান। এই নিয়ে যে পুরুষেরা কথা বলেন না তা নয়। তবে মুখরতা মেয়েদেরই যে বেশি; বিশেষত সেই মেয়েরা, যাঁরা এক সময় কিছুটা হলেও বড় সাধকের আশ্রয়ে ছিলেন, সাধন সঙ্গিনী হয়েছিলেন, এখন সাধক দেহ রাখার পর আশ্রম-কর্ত্রী হয়েছেন, তাঁরাই মূলত দেখেছি মেয়েদের প্রকাশ্যে গান গাওয়া নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এটা তাঁরা বুঝেও বুঝে উঠতে পারেন না সাধকের, বাউলের ন্যায়নীতির অবক্ষয়টা আজ কোথায় যাত্রা করেছে। না হলে এ পথে আগত নবীনারা জেহাদ তোলেন, বিরুদ্ধাচরণ করেন সাধকের! প্রাচীনা মহিলাদের সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁরা দিব্যি মা-গোঁসাই সেজে সম্মানীয়া হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এ তো আমার নিজের চোখে দেখা। দেহ সাধনার এ এক আশ্চর্য উদাসীনতা। তন্ত্রও তো তার কোনওভাবে ব্যতিক্রম কিছু নয়।

মুড়াগাছার আশ্রমে বসেই ভোলানন্দ ভৈরব আমাকে তাঁর ভৈরবী সাধনার কিছু কিছু গুহ্য ক্রিয়াকরণ ব্যক্ত করেছিলেন। তাতে যোগ দিয়েছিলেন শ্যামাশ্বরী ভৈরবীও। তাঁর সাধন সঙ্গিনী। প্রকৃতি। তবে একটা জিনিস আমি বেশ ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছি যে, বাউলনীরা যুগল মিলন সম্বন্ধীয় আলোচনায় বেশ লজ্জা বোধ করেন। শ্বাস আর দমের কাজ— এইসব নানা ব্যঞ্জিত অধ্যায়কে সামনে এনে প্রসঙ্গকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। হয়তো তাঁরা এটা ইচ্ছে করেই করেন। শরীরের স্পর্ধিত ক্রিয়াকলাপ কোনও পুরুষের সামনে বলতে সমাজসুলভ লজ্জা পান। যা নারীর সহজাত অভ্যাস আর প্রকৃতি। তাছাড়া এইসব গ্রামের প্রায় নিরক্ষর মেয়েরা কতটা বা সহজাত হতে পারেন একেবারে প্রথম দেখা শহুরে এক জিজ্ঞাসু পুরুষের সামনে! কিন্তু ভৈরবীদের অনেকেরই এসব লজ্জা আর সম্ভ্রমের কোনও বালাই নেই। রাখঢাক নেই। এক্ষেত্রে তাঁরা একেবারে এখানে পুরুষের সমকক্ষ। যেমন মদ-ভাঙ্-গাঁজায় তাঁরা আচ্ছন্ন থাকেন তেমনই তাঁদের মুখে ঝরে যথেচ্ছ অশ্রাব্য গালাগাল। অনেকে আবার দেহাচারের পূর্ণাঙ্গবর্ণনা করতেও পিছ পা হন না। শিখিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়ে দেন। অবলীলায় তাঁরা বলেন যে, অনেকেই তাঁদের সাধনার করণ-কৌশল দেখতে, শুনতে, বুঝতে আসেন। তাঁদের অনেকেরই বর্ণনা মাঝেসাজে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, বাধ্য হয়ে তখন জিজ্ঞাসুকেই প্রসঙ্গ পাল্টে নিতে হয়। এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। তাতেও তাঁরা দমতে চান না। এতই তাঁদের বলবার আগ্রহ। অনেকে আবার বলবার পর পারিশ্রমিক পর্যন্ত দাবি

করে বসেন। এও জানিয়ে দেন যে, আগে বেশ্যা ছিলেন। এখনও তাই। তবে সাধনমার্গে থেকে এ কাজে বিপদ কম। না হলে পুলিশী ভয় থাকে। এখানে তা নেই। বাউল নারীরাও অনেক ক্ষেত্রে ওই সমাজ থেকে এসেছেন শুনেছি তা সাধকের মুখে। সঙ্গিনীকে তিনি ওই পথ থেকে তুলে এনে সাধন-আখর করেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য বাউলেরই মানবিক আধারটি বেশি প্রকাশ্যে আসে। হয়তো নারী-করুণার বিষয়টিকেও তিনি জাহির করতে চান তবে বেশ মর্যাদা দানের সুরে। কেন না অনেক সময় তো তাঁদের পূর্বতন সঙ্গিনীও থেকে থাকেন সে সময়। কিন্তু নারীমুখে তা আমি শুনিনি কখনও যে তিনি ওই পথ থেকে এসেছেন। এটা শুনেছি সাধক বাউল তাঁকে ঠাঁই দিয়েছেন সাধন সঙ্গিনী করেছেন, এতে তিনি কৃতার্থ। তবে ওই পর্যন্তই। এর বেশি এগোননি বাউল নারী। কিন্তু তান্ত্রিক ভৈরবী! তাঁর পথ ও মত প্রকাশে যেন কোনও কুণ্ঠা নেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার সরাসরি শিখে-বুঝে নেওয়ার প্রস্তাবও এসেছে। এসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমার তো রীতিমতো চমকে যাওয়ার দশা। অনেক ক্ষেত্রে শরীর বাঁচাতে, মান রক্ষার্থে এটা-সেটা দোহাই দিয়ে সরে পড়তে পর্যন্ত হয়েছে। তবে এটা এখানে সুনিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাউল পথে নারী কখনওই ব্যভিচারিণী নন। তান্ত্রিক নারীর মতো তার যথেচ্ছ যৌনাচারের নিদর্শন চোখে পড়েনি অন্তত আমার। বরং মনে হয়েছে এক্ষেত্রে, অনেক সময়ই তাঁরা অসহায় পরিস্থিতির শিকার। পুরুষই তাঁদের কেবল ব্যবহার করেছেন সাধন পথের অমৃত সঙ্গিনীর স্বীকৃতির লোভ দেখিয়ে। ধর্মমনা নারী প্রথমে এই অভিলাষ বোঝেননি। কিন্তু তান্ত্রিক নারী ব্যবহৃত, পরিস্থিতির ছোবলে দংশিত— এমন ছবি আমার চোখে উঠে আসেনি। তাঁর যৌনাচারই চোখে এসেছে বেশি। কখনও মনে হয়নি বাউল নারীর মতো তিনি অসহায়া। পুরুষ তাঁকে ব্যবহার করেছেন ধর্মমতের লোভ আর লোলুপতায়। তন্ত্রপথে নারী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যভিচারিণী, উগ্রা, মেজাজী, যথেচ্ছাচারিণী। এর প্রধান কারণ, নারী এখানে স্থূল মদ মাংসের মতোই স্থূল মৈথুনের মাতামাতিতে সাহসী তেজী রূপরেখা লাভ করেন। একটা উগ্রতা থেকেই থাকে তাঁদের সাজে, চলনে, চারিত্রিক ভঙ্গিতে। শক্তিময়তার বিকাশকে বোধহয় তাঁরা নিজের ভেতরই প্রকাশ করতে চান। তবে ব্যতিক্রম কিছু হয়তো আছে। আড়ালে আছে। যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু বাউলের পরিত্যক্তা রমণীর মতো এ পথে পরিত্যক্তা ভৈরবী কোথায়? একা ভৈরবী অনেক দেখেছি। তবে রীতিমতো তাঁরা তেজস্বিনী। বরং বেশিরভাগ ভৈরবীই জেহাদী, ব্যাভিচারিণী। অতলস্পর্শী সাধনা তাঁদের কোথায়! আমার চোখে পড়েনি। সাধনামার্গটি পড়ে রয়েছে কেবল খোলা খাঁচায়। ব্যতিক্রমের কথা আমি বলছি না

এখন। সাধনমার্গে আসীন হওয়া মানুষেরা আছেন তাঁদের কথাও তো বলেছি। বলেছি তাঁদের ভাব। আচার। এখন চটুলতার ভাবও কিছু প্রদর্শন করি এখানে। তাহলে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে। তারপরই নয় ভোলানন্দ ভৈরব আর শ্যামাশ্বরী মা ভৈরবীর কথাতে আসব। আসব তাঁদের বর্ণিত ও অনুভূত প্রকৃতি-মিলনের বার্তায়। তার আগে কুণ্ডলিনীর অসীম বার্তাকে নিজ মতে অপপ্রয়োগের দু'একজন ভৈরবীদের কথা বলি, যাঁদের আমি সম্মুখীন হয়েছি।

শিমুরালি স্টেশনে নেমে কালীগঞ্জ থেকেও খানিকটা ভেতরে যেতে হয়। একেবারে ভাগীরথী নদীর চর। চরের এক ছটাক জমিতেই ভৈরবী সুধাসুন্দরীর বাস। লোকে তাঁকে এখানে এ নামেই চেনেন। জল পড়া, তেল পড়া এসব মহার্ঘ ওষুধ তিনি দিয়ে থাকেন। যা খয়ে, মেখে বাতব্যাধি সেরেছে এমন মানুষ এ গাঁয়ে অনেকে আছেন। তাঁদের মুখেই শুনেছি ভৈরবী নাকি বাণ মারতে পারেন। বশীকরণও জানেন। তবে এ গাঁয়ের তিনি উপকার বই ক্ষতি করেননি। তাই কলাটা-মুলোটা ভেট যায়। ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা বসে তাঁরই জমির হাতায়। ভৈরব আছেন। তিনি বোতল পেলে কিছুই বোঝেন না। এহেন কারণে এখানে সাগরেদের অভাব হয় না কোনও। তারই ভেতর একদিন আমি গিয়ে পড়েছিলাম। ভৈরবটি তখন মদের ঘোরে ঝিমোচ্ছেন। সকাল ১১টা হবে। ভাবলাম, এই সাতসকালেই খেয়েছেন, নাকি আগের রাতের ঘোর যায়নি। ভৈরবী এগিয়ে এলেন তাঁর সুধারস নিয়েই। তবে চোখে মুখে এমন কী শারীরিক গড়নেও সুন্দরীর কোনও লক্ষণ আমি খুঁজে পেলাম না।

বললেন— আপনের বন্ধুটিরে নিয়ে এলেন না কেনে? সেও বেশ ডাগর। আপনের তো জোয়ান গতর। এ গতরে করণ খেলে ভাল।

বললাম— আপনাদের সাধনপদ্ধতির কথা কিছু শুনতে চাই। তাই এত দুর এসে ওঠা।

— তা ভালই। আপনের বন্ধুটিও কয়েছিল নেকানেকির লোক। আর আমার এই ভৈরবটা, এককালে আপনের মতনই গতর ছিল, মদে খেলো সব—তা সে বলে কী ঢাকাচাপা দিয়ে কোতে। নেকানেকি হবে তো। আমি বলি তা হোক। আব্রুর আমার বালাই নেই। এ শরীরে কত মানুষ কাত করিছি বলতে আমার নজ্জা কী।

— কবে থেকে এখানে আছেন?

— তা সেই বড় বন্যার বছর থেকে আছি। আগে থাকতাম সান্যেলের চর। জল উঠল। ঘর গেল। হেতা-ওথা ঘুরে এখন এহানে থিতু। এ ভৈরবের ঘর তখন থেকেই।

বললাম— আগে?

— তার আগে করিমপুর ছেলাম। ও ভৈরবটা ন্যাতা হয়ে গেল। চলি এলাম এর সাথে। এও দেহি এখন ডেকরা নেই আর। গতর গেছে। আপনের মতোই তো ফুটফুটে গতর ছেলো তাঁর। তা আপনে বে করেছেন?

বললাম— না।

চোখ কপালে তুললেন সুধাসুন্দরী।

— সে কী কন! এমন গতর! তা ভাল। জেনে-বুঝে নেন সব। শিখে পড়ে। হাতে-কলমে দেখাব সব দেহভাণ্ড। কারণরস বুঝাব। পাত হবেনি কোনওভাবে আপনের। বে হলে বউ বলবে কোতা থেকে শিকে এলে গো এমন রস! এত দম! তখন কবেন তো সুরসুন্দরী সোন্দর করে শেখায়ে দে ছিল!

এই বলেই ভৈরবী বলে, বুকে একটু হাত রাখেন না। বুঝবেন কেমন নদী বয় সেহানে।

আমি তো তাঁর এই সরাসরি প্রস্তাবে বেশ সিটিয়ে বসে আছি। দেখছি যে ভৈরবের নেশাচ্ছন্নতা তখনও কাটেনি। তাঁর সামনে বসেই সুরসুন্দরী এসব বলে চলেছেন। ভাবছি এখান থেকে কখন সরে পড়ব। কত ছেলে-ছোকরার আনাগোনা এখানে। তিনি কি এঁদের সঙ্গেও এমন আচরণ করেন! ঠিক জানি না। ভাবছি, না বোধহয়। না হলে এ গাঁয়ে থাকতে পারতেন না। আমার ভাবনার মধ্যেই যেন ঢুকে পড়লেন ভৈরবী।

বললেন— এখানে কত গতর। কিন্তু করণ গতর কই! বিন্দু ধরতে দম লাগে। এ ভৈরবও এখন পারে না। শালার দম নেই। সাধনে আসবেন। সব শেখায়ে দেবো আপনেরে। চলেন পলাই। আশ্রম বানাই।

বলেই ভৈরবী জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। ভৈরবের তাতে কোনও হেলদোল নেই। এমনই তিনি নেশাচ্ছন্ন। ছেলে-ছোকরাও তখন এদিকে ঘুরে তাকাচ্ছে না। জমির হাতায় গাছের তলায় তারা নেশায় ব্যস্ত সব। আমার অস্বস্তি হতে শুরু হল।

বললাম— প্রসাদ তো আনিনি। এদিকে কোথায় পাওয়া যায় জানি না।

বললেন— বন্ধুরে তো বলে পাঠায়েছেলাম প্রসাদ আনতি!

— হ্যাঁ। তবে এখন আনছি।

— দূর পানে যেতি হবে। ইস্টিশনের ধারে।

— তা হোক।

— যাবেন। যান। তবে কিছু ট্যাকাকড়ি দিয়ে যান কেনে, এহানে এলে দিতি হয় যে।

আমি মানিব্যাগ বের করে একটা একশো টাকার নোট দিয়ে দিলাম তার হাতে।

সুধাসুন্দরীর লোলুপ দৃষ্টি দেখে বুঝলাম যে, এ টাকা অনেকদিন তিনি চোখে দেখেননি।

বললেন— আপনের গতর শুধু ভাল লয় গো। মনও ভাল আপনের। যাক। চাল বাড়ন্ত। কিছুদিন তো চলবে। তা আসেন। প্রসাদ আনেন। তখন হবে খন। ফণা তোলা বুক দ্যাগবেন। আমি বেবুশ্যে নই তবে। যা দেখাব সব আপনের নেকানেকির লাগি।

বললাম— ঠিক আছে।

এই বলে ভৈরবীর ঘর থেকে বলা ভাল পালিয়েই এলাম। সঙ্গে আমার তখন ব্যাগে একটা বাংলা মদের বোতল। যিনি আমাকে এঁদের সন্ধান দিয়েছিলেন, বলে দিয়েছিলেন বোতল প্রসাদ করার জন্য নিয়ে গেলে এঁরা খুশি হন। বোতল না থাকার অছিলায় সেই স্থান থেকে, অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে আমার মুক্তি হল। তাই বোতলটি কীভাবে বা দিয়ে আসব এঁদের! ব্যাগে আমার প্রসাদী বোতল। আমি তখন ভ্যানে বসে শিমুরালি স্টেশনের দিকে। ভাবছি, অভাবী আর প্রায় অনাহারী মহিলা চেয়ে আছেন কেবল একটু সুখের আশায়। তাঁর শরীরের চাহিদারও যেমন, তেমনই আবার পেটের। এখানে সাধনা কোথায়! ওঁর কথা ভেবে আমার এখন ভীষণই খারাপ লাগছে।

এমনই আরেক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বনগাঁর কাছাকাছি কানসোনা বলে এক গ্রামে। সেখানকার ভৈরবী আমাকে বলেছিলেন, কী জানবার চান?

বললাম— আপনাদের সাধনভজন।

বললেন— লিঙ্গ সাকার। যোনি শক্তির তরে লিঙ্গ। এ কী বিছানায় কইরবার লাগি লিঙ্গের ওঠাপড়া! এ লিঙ্গ সাক্ষাত শিব।

কপালে জোড়হাত ঠেকালেন ভৈরবী।

বললেন— মানুষজন আসে, ভাবে তারা বিছানায় ঝা ঝা করে আমরাও তা তা করি। তা মিনসেদের বলি লিঙ্গ কী শুধু ঢোকানোর বস্তু! আপনে বুঝদার লোক। শরীলের ভিতর ঘর-জমি-বসত। সাপের হিলহিলানি। এই দেহেন শরীলজোড়া আমার সাপের বাসা।

বলেই ভৈরবী নিমেষের মধ্যে কাপড় খুলে আমার সামনে ব্লাউজ, সায়া পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলেন।

তখন আমি দরদর করে ঘামছি। কপালে আমার বিজবিজে ঘাম। জায়গাটা শুনশান। দুপুরবেলা। রোদের তাতে ধারেপাশে কেউ নেই। তাছাড়া এটা একেবারে শ্মশান লাগোয়া প্রান্তসীমা। এদিক-ওদিক অনাবাদী রুক্ষ জমি। মরা ইচ্ছামতী।

বললেন— আমার এ বুক দুটি হইল গে পদ্ম। টিপ্যে দিলে মধু ঝরে। ভৈরব তো পদ্মফুলে পুজা সারে শক্তির। তা এই শক্তির ত্যজ জানেন আপনে?

বলতে বলতে ভৈরবী আমার একেবারে শরীর ঘেঁযে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যা আমার অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে তুলল।

বললেন— শক্তির স্বভাব জানেন আপনে?

বললাম— কী?

— কামেশ্বরী স্বভাব হল গিয়ে শক্তির। শক্তির সব্বছিষ্টিরে ধইরে আছে হল এই ম্যাঁয়ামানুষের শরীল। আপনের শিব খালি এরে গ্রাস করতি পারে।

বলেই আবার এক ঝটকায় আমার শরীর থেকে যোজন দূরে সরে এলেন তিনি। তাঁর বুক দুটো তখন খুলে বেরিয়ে যাওয়ার দশা। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই।

বললেন— বীরাচারী জেবন আমাদের। শালা ধান্দায় ঘোরা মাল আমরা বুঝি রে। তো শালোর খোঁজ নেওয়ার দায়। ম্যাঁয়ামানুষের শরীলের খবর বিন্দুধারণের যোগ এসব বুঝতে তু এয়েছিস। শালো গুপ্ত ইশারা জানবে আর নজ্জায় মোলো। মরণ! পুরুষবিন্দু আটকাবার লাগি এয়েছিস। ছিষ্টির দশা জানবি আর তু কেমন মানুষ ছিষ্টিরে ডরিস?

হো হো করে হাসতে লাগলেন ভৈরবী মধুমতী।

ভাবছি, কে এঁর নাম রেখেছিলেন মধুমতী!

একটু নরম হলেন ভৈরবী।

বললেন— বোস। বাকীটা গলায় দে আসি। ভৈরবটা ঘরে লেই। তোরে আজ শরীলের দুনিয়াদারী দেখাব বুঝলি।

এই বলে ভৈরবী আপন মাহাত্ম্যে ডুবতে ডুবতে শাড়ি ঠিক করে ঘরের পেছন দরজা পেরিয়ে বোধহয় সেদিকের দাওয়ায় গেলেন। আমি তার সুযোগ নিলাম। বাইরে বেরিয়ে তড়িঘড়ি কাঁচা রাস্তায় উঠলাম।

পেছন থেকে শুনছি মধুমতী আমাকে ডাকছেন।

— শালো নেকাঝোকা তো কিছু হল না। যণ্ডাগুণ্ডা শরীলটা তো তোর নেকা শেখায়ে দিতাম। শালো বাবু আয় আয়।

আমি তখন জন এলাকায় এসে উঠেছি। বিকেল নেমে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। চারদিকে ছড়ানো গাছগাছালি। তবু তার ভেতরই আমি ঘামছি।

ভৈরবী বললেন— বাবুটি বোধহয় সেরকম নয়।

শীতের বিকেলে একবার উপস্থিত হয়েছিলাম চাঁদমারির ধারে। কল্যাণী থেকে বেশ ভেতরে। সেও এক গঙ্গার চর। পাটকাঠির ঘর। দাওয়ায় বসে ভৈরব ভৈরবী। তাঁরা আমাকে যুগল আসন দেখাবেনই। কোনওরকমে নিরস্ত করলাম। ব্যাজার হল দু'জনেরই মুখ।

ভৈরবী বললেন— বাবুটি বোধহয় সেরকম নয়।

বললাম— কীরকম!

মুখের আগল খুললেন ভৈরবী।

বললেন— হেথায় অনেকে আসেন। তাঁরা তো বুঝতে-সুঝতে আসেন। আমার কাপড় খোলেন ঠাকুর। পায়ের আধোভাগকে চুমো খেয়ে বলেন অতল। তারপরই উপরভাগে চলে আসেন ঠাকুর। বলেন সুতল। নাভিতে চুমু মেরে বলেন তল। গুহামধ্যে ঢুকে যান। বলে তলাতল। বাবুরা সব ছবি নেন টাকা দিয়ে যান।

বললাম— এভাবে সকলের সামনে আপনারা...

বলতে দিলেন না ভৈরব।

বললেন— শরীর তো বর্ণামূলক। না দেখিয়ে ধরলে বুঝবেন কীভাবে? বুঝবেন সব আমাদের কল্পনাপ্রবণ। তাই আমরা ভেঙেচুরে...

এবার আমি বলতে দিলাম না তাঁকে।

বললাম— সকলের সামনে আপনাদের বাধো বাধো ঠেকে না?

বললেন— সাধনায় আবার কীসের বাধা! লাজ। আমরা তো তখন আত্মমগ্ন! তাঁরাও ছবি তোলাতে ব্যস্ত। এ ছবি তো বিক্রী হয় বাবু। লোকে দেখেদুখে শেখে।

আমার তো তখন বাক্‌রোধ হয়ে যাবার দশা।

তবু বললাম, যাঁরা আসেন তাঁরা কি শুধু ছবিই তোলেন?

— হ্যাঁ। জেবনছবি যে আমাদের। দু'একজন সাথে শক্তিরে নিয়ে এলে মা জননী বুঝায়ে দেন সব। শক্তি শরীর খোলে মা জননীর সামনে।

— আর শিব!

— শিবরে আমি শেখায়ে দি শ্বাস। শক্তিরে জননী শেখান বিপরীত ক্রম। শিখে-পড়ে তাঁরা সব চলে যান। বুঝলেন আমরা হলাম গিয়ে শিক্ষক। আপনি লিখলে লিখবেন, নীহার ঠাকুর আর মালতী মা হলেন গিয়ে শিক্ষক। শিক্ষা পেতে এখানে সবাই আসে। ভিড় করে।

বলেই ভৈরব এক চওড়া হাসি দিলেন।

বললাম— আজ উঠব। এসব তো আমার জানা ছিল না।

বললেন— জানলেন এখন। পরে ছবি ধরার যন্ত্রটা আনবেন। শক্তি আনবেন। সব দেখিয়ে-বুঝিয়ে দেবো।

ভৈরবী বললেন— কত কত মনিষ্যি আসে, পুলিশ পর্যন্ত।

এবার আমার একেবারে স্থবির হবার উপক্রম।

চলে আসব।

ভৈরবী আমার সামনে হাতটা পেতে দিলেন।

বললেন— বাবু কিছু অল্পবিস্তর দিয় যান। আজ বউনি হয়নি। একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওঁর হাতে গুঁজে কোনওমতে বেরিয়ে এলাম। ঘেন্নায় আমার শরীর ঘিনঘিন করতে থাকল। কোনখানে গিয়ে ঠেকেছে আজ দেহসাধনার আধার! হয়ে উঠেছে লালবাতি এলাকা। সুযোগসন্ধানীরাও আজ এখানে এসে জুটেছে। প্রশাসন পর্যন্ত! জানি না এই অবক্ষয়েরর পরিণতি কী! তবে পরিস্থিতিটা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। ধর্মকে ভর করে শরীরের ছকছকানি, ব্যবসা বহু প্রাচীন আমাদের ধর্মসংস্কৃতি। এতে অবাক হওয়ার কিছুই তো নেই। সাধন উদ্দেশ্যের এগুলো সব বিপরীতক্রমের ছবি। যেখানে অর্থনীতির নড়বড়ে ভিতটিকেও কিন্তু কোনওভাবে অস্বীকারের জায়গা নেই আমাদের।

— যেদিন প্রথম আমি প্রকৃতি চর্চায় এলাম বুঝলেন, সেদিনটা ছিল ওঁর রজঃযোগ। আশ্রমের পেছনে ফাঁকা পুকুর ধারে নিয়ে গেলেন দয়াল খ্যাপা! রাত তখন প্রায় দু'প্রহর হবে। অন্ধকারকারে বলে সেদিন যদি দেখতেন! ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।। তার ওপর থেকে থেকে শেয়ালের আওয়াজ। আমি আর গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছি শুনশানে। অপেক্ষা কখন প্রকৃতি আসবেন। খ্যাপা তখন সাজিয় ফেলছেন দেখি পুকুরধারে উপকরণ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী কী ছিল সব সেখানে?

বললেন— ভাঁড়ে মদ ঢাকা। পাত্রে ফুল। মাংস। কয়েকটা মাছের পেটি। ধূপ-দীপ-গঙ্গাজন-মধু সব। তখনও তিনি আসেননি। খ্যাপা আমাকে মদটা তুলে দিলেন। আমি খেতে এমন অবস্থা হল যে ভেতর আমার চক্রের ওঠাপড়ার মত হতে লাগল। চখনই দেখি প্রকৃতি এলেন। বুঝলেন এমন মদ আমি জীবনে খাইনি। খ্যাপা ঠাকুর তো ওকে মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন। তাই আমার এমন অবস্থা। ইতিমধ্যে মা এলেন।

— তাঁকে কী আপনি আগে দেখেছেন?

— ওমা! দেখব না কেন। মা তো আশ্রমেই ছিলেন। গুরু তো আমার শক্তির জন্যই খুঁজেপেতে তাঁরে এনে রেখেছিলেন। আমি তো দেখতাম মা শ্বাস শিখত। দয়াল বাবা তাঁরে নিজে হাতে শেখাতেন।

বললাম— মা আসার পর...

বললেন— তিনি এলে গুরু তার বস্ত্র খুলে নিলেন। মা রে বললেন আমারটা খুলে দিতে। মা যখন আমার বস্ত্র খুলছেন তখনই আমি দেখলাম তার ল্যাংটোময়ী রূপ।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

— গুরু আমাকে ভাঁড় তুলে বললেন তাঁকে খাইয়ে দিতে। তিনিও আমারে আবার খাওয়ালেন। মদ। মাংস। মৎস্য। আমিও তারে। এবার গুরু বললেন যে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে নিতে। অনেকক্ষণ দেখাদেখি হল। দু'জন স্থির।

— গুরু তখন ছিলেন?

— হাঁ। তিনি তো ঠায় দাঁড়িয়ে। এক সময় দেখি দু'জনেই নড়বড় করে নড়ছি। যেন ঝড় উঠছে আমার ভেতরে।

এতক্ষণ ভৈরবী বসেছিলেন। চুপ।

এবার তিনি বলতে শুরু করলেন।

— বাবা আমার হাতে ফুল দিলেন। বললেন চন্দনে ডুবিয়ে তাকে ঠাকুরের সারা শরীরে মাখিয়ে দিতে। আমি বুকে, মুখে, কপালে, লিঙ্গে সমস্ত চন্দনচর্চিত করে দিলাম। তারপর এক এক করে সমস্ত প্রত্যঙ্গের পুজা করতে থাকলাম। গুরু এমন মন্ত্র বলতে থাকলেন আমার শরীরে যেন এবার বিদ্যুৎ খেলে গেল।

— ভৈরবীর সারা শরীরে আমিও চন্দন সাজিয়ে দিলাম। স্তনে দিতে গিয়ে দেখলাম ও দুটো পাথর হয়ে আছে। জানেন ঘষা লেগে আমার হাতে তখন রক্ত ঝরল পর্যন্ত।

বুঝলাম, এ ভৈরবের ভাবাবেগ বই কিছুই নয়। কিছুই বললাম না আমি। চুপ। ভোলানন্দই বলে চলেছেন।

— গুরু বললেন ওকে দাঁড়াতে। প্রকৃতি এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেলেন যে, দেখে মনে হল মা কালী। এক ঢাল কালো চুল তখন দেখি দু'কাঁধের সামনে ঝুলে পড়েছে। আমাকে আদেশ করলেন গুরু ওকে কোলে তুলে নিতে। মুখে, ঠোঁটে, চোখে বুলিয়ে দিতে চুম্বন। দেখলাম আমার ভেতর তখন নিষ্কাম ভাবরস আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে বুঝলেন আপনি ভাবটা ছিল নিষ্কাম?

অবাক হলেন ভৈরব।

বললেন— শোনো কথা। বুঝব না। এর আগে তো মেয়ে সঙ্গ হয়েছিল আমার। সেখানে তখন ছিল কেবল কামের বাড়াবাড়ি। এখানে তো স্পন্দন রহিত আমরা। গৃহজীবনের চাঞ্চল্য এখানে কোথায়?

বললাম— কেন নেই?

— কীভাবে থাকবে বলুন? কুম্ভক করে করে ভেতর ভেতর তখন স্থিরতা আসে। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়। মনে হয় দুই শরীর আমাদের পাথরের। তখন কত ছবি।

— কীসের ছবি?

— সব দেবদেবীর ছবি। এক সময় তা হরপার্বতীর। তারপর সব বিন্দু বিন্দু। সাদা। ফরসা। একেবারে ভোর ভোর দশা তখন শরীরের। যখন জ্ঞান এল দেখি পাখি ডাকছে। গুরু নেই। দু'জনে তখন আশ্রমে চলে এলাম। স্বপ্নের মধ্যে সেই বিতরণ অনেকদিন যে স্থায়ী ছিল।

— এখনও সেই মিলন অনুভূত হয়?

— হয় কী! প্রকৃতি-মিলনেই তো আছি। আমাদের তো ছেলেপুলে নেই। মিলনে কণ্ডোমও নেই। সব আমাদের করণ কৌশল। ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের মিলনই তো তন্ত্র। তন্ত্র কী তুক্?

— তাহলে তাবিজ-মাদুলি-পাথর দেন কেন?

— ও তে তন্ত্র আছে। শক্তিভরা। প্রকৃতি-সাধনের মূলবীজের ছায়াপাত ওতে আছে। ওভাবেই ও বানানো। যোগে বীর্যের উর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র করা তাবিজে দেবীশক্তিকে ভরে দিই আমরা। তিথিযোগে হয়। আর পাথর তো গ্রহ ধরে। সাইন্স। বিজ্ঞান। এটা তো মানবেন। না কি? শক্তিমত্তার কথা বলে বিজ্ঞান। প্রকৃতি-সাধন তো শক্তিমত্তার বিকাশ। সবই এখানে আসলে কুণ্ডলিনীর খেলা। এর বেশি তো কিছু নয়।

আজ্ঞা চক্র থেকে কুণ্ডলিনী শক্তি যখন শরীরের শেষ পদ্মচক্র সহস্রারে গিয়ে পৌঁছে যায় তখনই কোনওরকম সত্তাবোধ থাকে না। বলা হয় এক্ষেত্রে যে, ব্যক্তিসত্তা তখন অসীমে গিয়ে পৌঁছয়। ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তাতে গিয়ে উপনীত হয়। বিজ্ঞান যুক্তি দেখাচ্ছে যে, Blackhole এর মধ্যে যে Singularity , সেখানে গিয়ে পৌঁছলে কোনও দ্বৈত বলতে কিছু থাকে না। শরীরাভ্যন্তরকে বিজ্ঞানের যুক্তিকতার মধ্যে আনলে যা দাঁড়ায় তা হল, সহস্রারের কূটস্থান বলে যাকে সাধক বর্ণনা করেছেন তাই এক্ষেত্রে হবে Singularity, আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত কুণ্ডলিনীশক্তি পৌঁছলেও দ্বৈতভাব থাকে। যে ভাবকে বলা চলে মিলনাবস্থা। শিব আর শক্তির মিলিত অবস্থা। কুণ্ডলিনী আজ্ঞা পেরোলেই ঘটে নির্বিকল্প দশা। সাধক একে সমাধি মানছেন। 'সমাধি'কে ব্যাখ্যার ভেতর যদি আনা যায় তবে দাঁড়ায় : সম + অধি। অর্থাৎ কিনা সবার উপরে যে সত্য আছে তাকে খুঁজে বের করা। এই খোঁজই হল

গিয়ে অধি। এই অধির সমান হলেই হল গিয়ে সমাধি। তবে একে আরেক ভাবেও মনে করা যেতেই পারে। জীবনে দু'ধরণেরই সাধারণত স্মৃতি থেকে থাকে আমাদের। সচেতন স্মৃতি আর অচেতন স্মৃতি। সচেতন স্মৃতি স্থায়ী কিছু নয়। ঘটনাবর্তে বদলায়। এর চঞ্চলতা রয়েছে। এই স্মৃতি বলা ভাল যে, আমাদের পার্থিব জগতেরই স্মৃতি। অচেতন স্মৃতি হল গিয়ে স্মৃতি সংগৃহীত আধারে বা মনের মণিকোঠায় যে স্মৃতি সংগৃহীত আছে। যাকে কোনওভাবেই কখনও কোনওদিন আমাদের ভোলা সম্ভবই নয় একেবারে। সচেতন স্মৃতিকে মায়াবৃত্তের আধারও বলা যায়। যে মায়াকে সাধনার দ্বারাই যথার্থ অচেতন করে দেওয়া যায়। যাকে ইংরেজি তর্জমায় বললে বলা যায় Universal consciousness. তবে স্মৃতিকে অচেতন বললে ইংরেজিতে বলা ভাল Super conscious বাউল একেই পরম বলছেন। যোগশাস্ত্র সচ্চিদানন্দের স্তর হিসেবেই দেখছে। অনেকে বলছেন নির্বিকল্প অবস্থা। তন্ত্রে প্রকৃতি-মিলনে বাউলের যুগল মিলনেও এই দশারই কথা কিন্তু বলা হচ্ছে। আসল ব্যাপার হল গিয়ে বিন্দুধারণের স্থিরতা। কুম্ভক ক্রিয়াতেই এই স্থিরতা আসে। বায়ুর সাম্যতা রাখে কুম্ভক ক্রিয়া। দেহ মিলনের মূল সাধনা হল কুম্ভক ক্রিয়াই কী তন্ত্রে, কী বাউলে। প্রথমে যেটা করতে হয় শরীরের বাইরে বায়ুকে ডান নয় বাঁ নাকে নিতে হয়। প্রাণ বায়ু এতে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই জমা বায়ুকে ডান নাকে কিছু সময় রেখে তাকে আবার বাঁ নাকেই ত্যাগ করে দেন দেহসাধক। বাইরের বায়ুকে টেনে শরীরের অভ্যন্তরভাগ পূরণ করাই হল পূরক। আর বায়ু যে এভাবে শরীরে ধারণ করে রাখা; শরীরকে বায়ু ভরিয়ে পূর্ণ করে রাখা তা হল তাঁদের কুম্ভক। আবার বায়ুকে বের করে দেওয়া দেহসাধকের রেচক। মূলত দুই বায়ুর ক্রিয়া ইহা। সাধুসন্তরা বলেন প্রথমে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ডান দিকের নাকের বায়ুকে রোধ করে ওঁ বা যার যার গুরুমন্ত্র যোলো বার জপ করতে করতে বাঁ নাকের সাহায্যে বায়ুকে ভেতরে এনে কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙুল দিয়ে বাঁ নাকে রেখে বায়ুরোধে ওঁ বা গুরুমন্ত্র চৌষট্টিবার জপ করতে করতে কুম্ভক করতে হবে। তারপর আঙুল ডান নাক থেকে তুলে বত্রিশবার জপ করতে করতে ডান নাকে এনে বায়ু রেচক করতে হবে। আবার প্রথমবারের মতো দু'নাকের সাহায্যে পূরক, কুম্ভক, রেচক করতে হবে। মূলত কুম্ভক শক্তির উপরই বাউলের বাণক্রিয়া— মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভোন, সম্মোহন নির্ভর করে। তন্ত্রে পার্থক্য কিছু নয়। প্রত্যঙ্গ পুজোর যে গন্ধ, চন্দনচর্চিত সাজ এসব হল গিয়ে বাউলের বাণক্রিয়ার মতোই কিছু অঙ্গচর্চা। যাকে সঞ্চালনও বলতেই পারি আমরা।

'কুলার্ণব তন্ত্রে' আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দন, দর্শন, স্পর্শন, যোনিবিকাশ, লিঙ্গঘর্ষণ, প্রবেশ ও স্থাপনের কথা তো একেবারে সরাসরি উল্লেখ আছে। যেগুলো তন্ত্রমতে বলা হচ্ছে এখানে পুষ্প। নয়টি পুষ্প। বাউল তো এগুলোকেই কিছু রকমফেরে চন্দ্রস্পর্শ নাম দিয়েছিলেন। আলিঙ্গনকে কস্তুরী, চুম্বনকে কর্পূর করে নেওয়ার কথা বলছে আবার 'জ্ঞানার্ণব তন্ত্র'। কস্তুরী তো মিলনে দুই শরীরের চন্দনচর্চিত দশা। যা থেকে গন্ধ ওঠে ভুরভুর। ভৈরবীকে স্থূল মদ-মাংস-মৎস্য দানের পর তাম্বুল বা পান খাওয়ানোর রীতি আছে তান্ত্রিক মিলনে। এ আর কিছুই নয়। ভৈরবী চুম্বনের কারণেই তাঁকে সুগন্ধী পান খাইয়ে তাঁর ঠোঁট থেকে সুবাস কেড়ে নিতে থাকেন ভৈরব। চক্ষু, ললাট আর কিছু স্থানে ত্রিকোণমণ্ডল করে শক্তিপুজোর কথা বলছে 'উত্তর তন্ত্র'। এগুলো সবই হল গিয়ে উত্তেজিত স্পর্শচর্চা। যা কুম্ভক যোগেই মূলত হয়ে থাকে। 'জ্ঞানার্ণবে' সুগন্ধি কুসুম ও সুগন্ধ অক্ষত শুক্র অর্ঘ্যজলে মিশিয়ে কুলাগারে দেবীর অর্চনার কথা বলা হয়েছে। যোনিপুজোর যে চর্চা প্রকৃতি মিলনে সেখানে তো যোনিকে এবং লিঙ্গকে সাধক-সাধিকা বিপরীতক্রমে পুজোই করেন। তারপর কুলাগার বা যোনিতে লিঙ্গর প্রবেশ ঘটে। তারপরই কুম্ভক ক্রিয়াতেই মূলত 'শিবশক্তিময় জীবাবৃত', 'পরব্রহ্মস্বরূপ' বীর্যকেই মস্তিষ্কের ব্রহ্মদ্বারে ঠেলে দেওয়া হয় আর কী। এ অভিজ্ঞান তান্ত্রিকেরই। বাউলের তা 'গুরুবস্তু', 'কৃষ্ণবস্তু'। তন্ত্রে বলা হচ্ছে যে যিনি পঞ্চ ম-কারের সাধনা করবেন তিনি 'বীর' সাধক। বলা হচ্ছে যে তন্ত্র 'ভোগ-মোক্ষ' সাধনা। প্রকৃতি-মিলনাত্মক সাধনা।

এই প্রকৃতির মিলন না কি সাধারণত তিনভাবে হয়ে থাকে।

— কী কী?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মাজদিয়ার ভৈরব শীতল ঠাকুরকেই। তিনি তখন আমাকে আমাদের শরীরের হিসহিসানির কথা কতটা আমি জানি, করণক্রিয়ায় করি কিনা ইত্যাদি প্রতিপ্রশ্নে ব্যস্ত ছিলেন।

বললেন— মূলাধার খোলা গেছে না হয় বুঝলাম।

বললাম— কী করে বুঝলেন যে আমার মূলাধার খোলা?

— শুধু মূলাধার কেন, স্বাধিষ্ঠান ছাড়িয়ে এতদিনে মণিপুর পর্যন্ত যে চলে এসেছে আপনের শক্তি।

— কেমন করে দেখতে পাচ্ছেন আপনি তা?

— আপনের শরীরের ভাষা পড়ে।

— কীভাবে তা পড়া যায়? তাছাড়া আমি তো যোগ করি না।

— শরীরের ভাষা পড়া যায় চোখে। ত্বকে। চোখে আপনের শক্তির ছলছলানি আছে। ত্বক লালচে। এগুলো সব হল গিয়ে যোগশক্তির আধার।

বললাম— কোনওদিন আমি তো এর চর্চাও করিনি!

আমাকে অবাক করে শীতল ঠাকুর বললেন, এত মিথ্যে কথা বলছেন কেন আপনে! আপনের শরীর বলছে এক সময় রীতিমতো চর্চা ছিল আপনের। ছিল না। বলেন?

বললাম— সে তো বেশ আগে বাড়িতে মাস্টার রেখে আমাকে যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম শেখানো হয়েছিল। তাও অনেককাল আগের কথা।

বললেন— তখন আপনের বয়ঃসন্ধি পেরোয়নি। বীর্য পাকা হয়নি।

মনে মনে হিসেব করে দেখলাম ঠিক তাই। কিন্তু শীতল ঠাকুর তা কী করে বুঝছেন! Skeleton.

বললাম— তা ঠিকই বলেছেন এক অর্থে। কিন্তু আপনি তা ধরলেন কীভাবে একেবারে নির্ধারিত বয়সসীমা?

— আপনের জিজ্ঞাসার স্তর বলে দিচ্ছে যে দেহ স্থূল অহংবোধ আর ধরে নেই আপনের।

— কীভাবে বলছেন আপনি একথা?

— এ কোনও রহস্য নয় বুঝলেন। এ চর্চা আপনের মস্তিষ্কের।

— আমার মস্তিকের বাইরের রূপে আপনি কী এমন দেখলেন!

— মস্তিষ্ক চিন্তা ধরে। মস্তিকের চিন্তাধারা শরীরে ছড়ায় মস্তিক পরিবেশ তৈরি করে বুজলেন।

বললাম— কীসের পরিবেশ?

বললেন— আধ্যাত্ম সাধনার পরিবেশ। আপনের চিন্তার সূক্ষ্মতরঙ্গ যখন গিয়ে সুপ্ত কুণ্ডলিনীতে লাগছে, যা একদিন খুলেছিল আপনের, সেই ধাক্কা সারা শরীরময় হয়ে যাচ্ছে যখন আপনে প্রশ্ন রাখছেন।

— এসব তো আপনি আমার আগ্রহ ধরে বলছেন।

— তা কেন? আমিই বলছি আপনের কুণ্ডলিনী ধরে। কুণ্ডলিনী কী মানেন আপনে?

বললাম— আপনিই বলুন। আপনার কথা শুনতে চাইছি।

— কুণ্ডলিনী হলেন রস।

— রস। বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

— হাঁ রস। রস তো দু'প্রকারের।

বললাম— স্থূল। সূক্ষ্ম। এই তো বলবেন আপনি?

— হ্যাঁ এক অর্থে ঠিকই। তবে রস হল আসলে দৈহিক আর মানসিক। দৈহিকই হল স্থূল রস। মানসিক রসের সূক্ষ্ম পর্যায়।

— তা আমার শরীরের গড়নে সেই ছায়াপাতের কী হল?

— হল না মানে। এ আপনে কী বলেন। দৈহিক রস তো আপনার সারাদেহে ছড়িয়ে গিয়েছিল একদা শক্তি জাগর হয়েছিল। এখন আপনে জং ধরা লোহা। চাকচিক্যটা ধরা পড়ে যখন আপনের মধ্যে সেই পুরনো শক্তি ধাক্কা মারে জোরে। তখনই চোখে মুখে শরীরে আলো ছড়ায়। বোঝা যায় চক্র খোলার ক্রিয়া ছিল আপনের। শক্তিসাধনা, কুলকুণ্ডলিনীর সাধনা কী জানেন আপনে?

বললাম— কী?

— শক্তির সাধনা হল ভারসাম্যের সাধনা। কুণ্ডলিনী দেহের ভারসাম্যকে ঠিকমতো বজায় রাখে যে। শরীর তো জগৎ। জগতের উৎস শক্তি। শক্তিই হলেন কুণ্ডলিনী দেবী। বুঝলেন।

এক অর্থে কিন্তু শীতল ঠাকুরের কথা ঠিক। বিজ্ঞান বলছে যে শক্তির উৎস সন্ধানে গিয়ে, যে, সেখানে চারটি শক্তি আছে। আইনস্টাইন তাঁর 'Unified Field Theory' দিয়ে এর স্বরূপ পর্যন্ত বিচার করেছেন। বলেছেন চারটি শক্তির কথা— স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স, উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ও গ্র্যাভিটি। এর চারটি উৎসের একত্রীকরণের কথা। আইনস্টাইন কিন্তু বলেছিলেন যে ক্ষেত্র বা Field আবিষ্কার হলেই শক্তি ধরা পড়বে। এগুলো অবশ্যই সবই বস্তুজগতের শক্তি। সাধক অবশ্য বলেছেন যে, কুণ্ডলিনীকে বা কুণ্ডলিনী শক্তিকে বুঝতে বস্তুজগতের বাইরে আসতে হবে। কুণ্ডলিনীকে সর্প প্রতীকে পৃথিবীর প্রায় নানা দেশেই কিন্তু দেখানো হয়েছে। প্রাচীন সুমেরিয়, চৈনিক, আইরিশ, অ্যাজটেক, গ্রীস প্রভৃতি দেশে সাপ দিয়েই কুণ্ডলিনীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুণ্ডলিনীশক্তিকে সাপ দিয়ে বোঝানোর সদার্থক যুক্তি হল সাধকের, শক্তি হল মায়াপূর্ণ। তাই সব সময়ে বন্ধনে আবদ্ধ। সাপ যেমন নিদ্রিত থাকে যখন সে জাগে তখন তার চলনশক্তি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। শক্তিও তাই। আচ্ছন্ন, ঘুমন্ত অবস্থাতেই থাকে কুণ্ডলিনী। তাপ পেলে, চাপ পেলে তা খুলতে থাকে একটু একটু করেই। আমাদের শাস্ত্রেও ভগবান বিষ্ণুর শেষ নাগ শয্যার কল্পনা বোধহয় এ কারণেই যে, সৃষ্টি জগতের সবকিছু যখন প্রসারিত হয় তখন কুণ্ডলিনীর প্যাঁচ খোলার মতোই কিন্তু আসলে অবস্থা হয়। বিষ্ণু সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ শক্তি ধরছেন বিষ্ণু। এই বিষ্ণু আর কেউই নন। সাধক নিজে। নিজে তিনি তাঁর ঘুমন্ত কুণ্ডলিনীকে জাগাচ্ছেন। সাধক এক্ষেত্রে বিষ্ণু হয়ে উঠছেন। বিষ্ণু হয়েই তিনি শরীরে শক্তির আখরকে ধরে

রাখছেন। তবে কুণ্ডলিনীর সর্প প্রতীক কিন্তু সাধক দেহে সব সময় খাটে না। এটা দয়াল বাবা একবার বলেছিলেন আমাকে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁকে, তাহলে কুণ্ডলিনী কতক্ষণ সাপ মানুষের শরীরে?

বললেন— শরীর যখন শিব হয় তখনই সাপ জাগে।

বললাম— এ তো স্বাবাবিকই। শূন্যতার মধ্যেই শক্তি রূপ পায়।

— যে-সে শূন্যতায় কি শরীর রূপ পায় বাবা; সাধকের শূন্য শরীরে প্রথমে সাপ নড়ে। যে সাপ বিষাক্ত। এই সাপ ততক্ষণই বিষ ধারণ করে, যতক্ষণ শরীরে অহং থাকে। দেহবোধ থাকে। ব্যক্তিসত্তা থাকে। সাপ মরে না কখনও। বিষ মরে। বিষ মরে অমৃত হয় সাধকের ব্যক্তিশূন্যতায়। শিবের মাথায় যে সাপ অমন ফণা তুলে আছে তা কী?

বললাম— কী?

— সাপ হল এখানে শিবের ব্যক্তিশূন্যতা। সাধককেও শিব হয়ে অমন দশায় পৌঁছতে হবে। সাপ তখন ছাতা থাকবে ধরে। যেমন বুদ্ধের মাথাতেও ধরেছিল। বুদ্ধ কী?

— কী? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— বুদ্ধ হলেন সাধকের বিলীন বোধ।

— কীসের সেই বিলীনতা?

— ব্যক্তিশক্তির। তা মুছলেই সাপ ওঠে। যখন শরীরে বিশ্বশক্তি জাগে তখনই সাপ ছাতা ধরে। সাপ বন্ধু হয়। বুদ্ধ, শিবের যেমন হয়েছিল।

বললাম— বুদ্ধের তো একটা রক্তমাংসের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু শিবের?

— শিবের নেই। একথা বলল কে?

— তন্ত্র তো শিববাহিত ধর্ম। কোনও মনুষ্য শিবই ও ধর্ম তৈরি করেছেন। শিব নামে অবশই কোথাও কোনও তান্ত্রিকপুরুষ ছিলেনই। শিব অনার্য পুরুষ। কৈলাসে থাকতেন। তন্ত্রক্রিয়া করতেন শিব।

বললাম— তাহলে তো পার্বতীরও রূপ দিতে হবে আপনাকে রক্তমাংসের।

বাবা অবলীলায় বললেন এবারে, অবশ্যই। হিমালয়ে আর্যদের বাস। সেখানে পার্বতী থাকতেন।

— শিব-পার্বতীর মিলনে আর্য-অনার্য একাকার হল।

— একেবারে ঠিক। বেশ প্রফুল্ল মুখে দয়াল বাবা বললেন।

বললাম— তাহলে শিব-পার্বতীর বিবাহ হল?

এবার রেগে উঠলেন বাবা।

বললেন— সংসারী জীবের এই দোষ। সবক্ষেত্রে বিবাহ খোঁজে। পার্বতী জুটলেন শিবের সঙ্গে। তন্ত্র করার জন্য। ভৈরবী হলেন পার্বতী। তন্ত্র তো উন্মুক্ত সাধনা। এখানে জাতপাত নেই। ভেদাভেদ নেই। পার্বতীকে শিব নিয়ে আসার ফলে তাঁর পিতৃদেব দক্ষরাজ গেলেন খেপে! শিবের শক্তি পরীক্ষার জন্য দক্ষযজ্ঞের আয়োজন হল। দক্ষ তো আসলে হল গিয়ে তন্ত্র-পুরাণ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীরকম!

— দক্ষ হলেন সাধকের কর্মশক্তিবোধ। যে শক্তিতে ব্যক্তিত্ব থাকে। আমি থাকে। ঈশ্বরী থাকে না। ঈশ্বর ছাড়া ঈশ্বরী অসম্পূর্ণ আবার ঈশ্বরী ছাড়া ঈশ্বর। তন্ত্র তাই দু'জনের মিলিত প্রক্রিয়া।

বললাম— সে তো বাহ্যিক ব্যাপার হল।

— ভেতরেও তো তাই। পুরুষ শরীরে যেমন প্রথমে শিব জাগে। তেমনই নারী সাধিকা শরীরেও শিব জাগে।

— সে তো আপনাদের মতে, আমিত্বের বোধনাশের শূন্যতা।

— হ্যাঁ। শূন্যতা না এলে শিব হবে কীভাবে? কুণ্ডলিনীর শক্তি তবে জাগবে কীভাবে শুনি!

দয়াল বাবার মতাদর্শকে কিন্তু একান্ন পীঠের মিথোলজির সামনে অবশ্যই দাঁড় করানো যেতে পারে। যেটা একেবারে অযৌক্তিক কিছু কিন্তু হবে না। তিব্বতে কোনও অবতার-মানুষের মৃত্যু ঘটলে সেই দেহের সৎকার নানাভাবে হয়ে থাকে। মৃতদেহের নানা প্রত্যঙ্গের অংশ নিয়ে স্তূপ বা সমাধি পীঠ করার একটা রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে অদ্যাবধি। ভারতেও বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর নখ, চুল ইত্যাদি নিয়ে নানা পীঠ হয়েছে। এই প্রথা ভারত বাহিত আচরিত ধর্মমতে কবে সামিল হয়েছে বলা শক্ত। শিবের যে কৈলাস প্রিয়স্থান, তাও কিন্তু তিব্বতেই। শিবকে বুদ্ধের থেকেও প্রাচীন মানুষ ধরা যেতেই পারে প্রামাণ্য সন্দর্ভ নিরিখে। শিবাংশ দিয়ে ভারতে ছড়ানো মহাপীঠের একটা ইতিহাস তো আছেই। তাহলে পার্বতী বা সতী দেহাংশ নিয়ে পীঠস্থানকে শুধু মিথোলজিক্যাল না দেখেও এই বোধসীমায় আনতে পারি, যে বোধে দয়াল বাবা শিবকে জ্যান্ত করেছেন। তন্ত্র তো মানাও হচ্ছে শিব প্রবর্তিত ধর্ম। এখানেও তিনি জীবন্ত। তাহলে এভাবেও পার্বতী বা সতী সাধিকার অস্তিত্ব পীঠের ব্যাখ্যা আনা যেতে পারে। বিজ্ঞান আবার বিশ্বসৃষ্টির মূলে একান্নটি ধাপের কথা বলছে। Big Bang-এ প্রথমে ছয়টি সূক্ষ্ম তারপর সাতটি সূক্ষ্ম স্তরের সমষ্টি হচ্ছে গিয়ে একেবারে ৪২। তার উপর আরও সাতটি অতি সূক্ষ্ম স্তরও আছে মানা হচ্ছে। তাহলে হচ্ছে ৪৯। তারপরও বলা

হচ্ছে যে অতি শূন্যতার একটা পর্যায় আর নিশ্চল বিস্ফোরণের বেগের একটা পর্যায়। এই নিয়ে একান্নই দাঁড়াল। যেগুলো সবই হল গিয়ে তরঙ্গ পর্যায়। যেখানে শক্তিমত্তার প্রকাশ আছে সুতরাং মিথোলজির সঙ্গে বিজ্ঞান যুক্তিকতার একান্নতে একটিতেই মিল শক্তি অর্থে। যাকে সাধক কুণ্ডলিনী হিসেবে দেখছেন। শক্তির সঙ্গেই স্থূল প্রকৃতি-মিলনও বাহ্যিক হিসেবে তাই বোধহয় জড়িয়ে রয়েছে তন্ত্রে।

শীতল ঠাকুর বলেছিলেন আমাকে প্রকৃতি-মিলনের ত্রিধাবিভক্তির কথা। আমার কী কী জানার জিজ্ঞাসাকে আমল দিয়ে তিনি বললেন, প্রকৃতি হলেন গিয়ে নিত্যস্বরূপা। যিনি রোজই স্বরূপ বিস্তার করেন।

বললাম— কোথায় কোথায় প্রকৃতির স্বরূপ?

বললেন— আমাদের শরীরে সূক্ষ্মরূপে আছেন প্রকৃতি। যাকে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে মিলন করানো হয়। এই হল এক নম্বর প্রকৃতি মিলন।

— শরীরের চক্রে চক্রে যে জ্যোতিরূপ, বোধ—সেখানেও তো নিরন্তর চলে প্রকৃতির উপাসনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিন নম্বর?

— পঞ্চ ম কারে প্রকৃতির স্থূল যে রূপ নারী, তাকে যে উপাসনা সেও তো এক অর্থে শক্তিরই ভাগ।

— তাহলে শরীর মিলন স্থূল?

— অবশ্যই। স্থূল শরীরকে সূক্ষ্মে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আসলে মিলন।

— সেই মিলন তো যোগসাধনাতেই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে নারী সাহচর্যের দরকার কী?

বললেন— দরকার এই কারণেই, তন্ত্র স্থূল থেকে সূক্ষ্ম পথ পোষণ করে যে, আপনে প্রাইমারী না পড়ে হাইতে যাবেন শুনি কীভাবে? তন্ত্র তাই প্রথমে স্থূল পথ বলে।

— মদ খেতে বলে তন্ত্র।

— মদমত্ততা তো সূক্ষ্ম ব্রহ্মরন্ধ্রের। স্থূল বোধে তা শুধু ভোগ। ভোগ থেকে যোগে যাওয়ার এ পথ।

— তার জন্য নারী-শরীরে ভ্রমণ? সম্ভোগ? কেবল স্থূলতার জন্য।

— তাই তো মানি আমরা। তবে ও তো সম্ভোগ নয়।

— তাহলে?

— ও হল গিয়ে জাগরণ। কুণ্ডলিনীর জাগরণ। তন্ত্র বলে চৈতন্যের কথা। বলে চৈতন্য থাকে কুণ্ডলিনীতে।

— সে তো বাউলও একই কথা বলে। 'চেতনে চৈতন্য যিনি, /কুণ্ডলিনীতে আছেন তিনি।'

— তাঁর কুণ্ডলিনীতে সাধিকা শক্তি নেই যে কোনও।

— এটি কোনও শক্তি?

— আমরা বলি দেবীশক্তি। বাউলের দেবী কই!

— বাউল তো বলে রাধিকা শক্তির কথা।

— সে তো তারা নিজে সাজেন।

— আপনাদের সাজ নেই কোনও। সজ্জা আছে।

— কীসের সজ্জা?

— কুণ্ডলিনীর সজ্জা আমাদের। একটু একটু করে সেজে ওঠেন কুণ্ডলিনীর দেবী।

— কীভাবে?

— মায়া দুল খোলেন। অহং হার ছোঁড়েন। স্থূলবস্ত্রকে পরিহার করে দেন একেবারে। তারপরই শুরু হয়ে যায় দেবীর সূক্ষ্মতা।

— বোঝেন কীভাবে?

— পুরুষসংযোগে শক্তি সাজে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এবারে কেমন তাঁর সাজ?

বললেন— তিনি সাজেন সর্বতেজোরূপিণী মহামায়া হয়ে। মূলাধার-বিহারিণী দেবীর তখন সগুণ ব্রহ্মের দশা। মা আমার ব্রহ্মময়ী।

— সগুণ ব্রহ্ম বলতে কী বোঝাচ্ছেন আপনি?

— প্রকৃতি-পুরুষরূপী অবয়ব হল সগুণ ব্রহ্ম। স্থূল শরীরেও যা আছে।

— কেমন করে?

— পুরুষ-নারীর মিলন-সংযোগে নারীকে ধরে থাকেন পুরুষ। নারীর অবস্থান তাই নীচে। পুরুষের উপরে। তন্ত্রে বিপরীত বিহার চলে। স্থিতাবস্থা থাকে তাতে।

— কীসের?

— কুণ্ডলিনীশক্তির। যা এলে অজ্ঞানতা তখন কেটে যায়। প্রকৃতিমিলন এই বোধশক্তি এনে দেয় যে, সাধন নারী আর শরীরের নাড়ি এক ও অভিন্ন। দু'জনেই আসলে কুণ্ডলিনীশক্তিকে চালনা করেন।

সেই অভিন্নতা নিয়েই এখন আমি পথ হাঁটছি। শীতল ঠাকুরের ডেরা ছেড়ে একেবারে একা। অন্ধকার হয়ে আসছে। পেছনে আমার ভৈরব ভৈরবী শিব আর শক্তির ভিন্নতা নিয়ে বেশ হাসিমুখেই বিদায় দিয়ে দিয়েছেন আমায়।

মা থেকেই মায়া

কৌশিকী অমাবস্যা। তারাপীঠে আজ তিল ধারণের জায়গা নেই। বিকেল গড়াতেই অজস্র মানুষ। সাধু-সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক, ভৈরবী, সাধারণ মানুষ। মন্দির রোডের উপর একটা চায়ের দোকানে বসে আছি। গতকালই এসে পৌঁছেছি। দোকানদার চা দিতে দিতে বললেন, এখনই যা অবস্থা। মহা-শ্মশানের যজ্ঞে আজ মানুষের সমাবেশ দেড়-দু লাখে চলে যাবে।

চারধারে থিক থিক করছে লোক। এর মাঝেই বসে আছি আমি আর সাধনা ভৈরবী। বেশ কিছু ভক্ত-শিষ্যের জমায়েত হয়েছে এখানে ভৈরবীর কারণে। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ভৈরবীর কথা শুনছিলেন। তাঁর বলবার ধরনটিও সুন্দর। অদ্ভুত এক আকর্ষণশক্তি মিশে আছে কথার ভেতরে। থেমে থেমে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে যেন কিছু চিন্তা করে কথা বলছেন ভৈরবী। চেহারাতে যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্যের ভাব আজ আর নেই। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে এক সময় তিনি গৌরবর্ণা ছিলেন। অযত্নে সেই রং এখন অনেকটাই তামাটে হয়ে এসেছে। এক ভক্তের অনুরোধেই ভৈরবী কৌশিকী অমাবস্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছিলেন। হাতে তখনও তাঁর চায়ের গ্লাস।

বললেন— কৌশিকী দেবী ভাদ্রমাসের অমানিশাতেই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই এই অমানিশা কৌশিকী অমাবস্যা নামে খ্যাত। এই দিনে মা তারার পুজো করাও পুণ্যের কাজ। মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলে, ভক্তিভরে ডাকলে জীবনে প্রাচুর্যের উদ্‌বেলিত হাওয়া এসে লাগে। এরই সঙ্গে মহাশ্মশানে যজ্ঞ ও দ্বারকাতে স্নান করলে কুম্ভে স্নানের ফল লাভ হয়। মৃত্যুভয়, দুঃশ্চিন্তা, নৈরাশ্য, অশান্তি, সমস্যা— এসবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কথাগুলো বলেই চোখদুটি বন্ধ করলেন ভৈরবী। মনে হল যেন কিছু চিন্তা করছেন। শ্রোতারা তখন সব অধীর অপেক্ষায় বসে। ধীরে ধীরে চোখ খুললেন ভৈরবী। পথ চলতি মানুষের আওয়াজ গাঢ় হচ্ছে। ভিড় বাড়ছে তারাপীঠে।

দু'একজন দাঁড়িয়েও পড়ছে ভৈরবীর আকর্ষণে। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। নিমগ্না হয়ে রয়েছেন তিনি মায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনায়। চিন্তা-স্রোতকে খুলে নিয়ে আবারও বলতে থাকলেন ভৈরবী।

— দেবী কৌশিকীর নাম 'চণ্ডী'তে আছে। মহিষাসুরকে বধ করলেন দেবী দুর্গা। দেবতারা সব নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু সেটাও বা ক'দিনের জন্য। শুরু হয়ে গেল শুম্ভ আর নিশুম্ভের অত্যাচার। দেবতারা তখন সব স্বর্গ ছাড়তে বাধ্য হলেন। স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্য দেবদেবীরা সবাই দেবভূমি হিমালয়ের দেবী মহামায়ার স্তব করতে লাগলেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধনে নিজের দেহকোষ থেকে এক পরমাসুন্দরী দেবীমূর্তির জন্ম দিলেন। এক উজ্জ্বল জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। নিজের শরীর থেকে জন্ম হল বলে দেবীর নাম কৌশিকী। গায়ের রং তপ্ত কাঞ্চনের মতো। কৌশিকী দেবীর শরীর থেকে বের হওয়ার পর দেবী মহামায়া বা পার্বতীর গায়ের রং হয়ে উঠল কালো। তাই তিনি কালিকা নামে হিমালয়ে রয়ে গেলেন।

কথার ফাঁকেই আস্তে আস্তে চুপিসাড়ে দেখছি সন্ধ্যা নামছে। ভৈরবীর কাছে গল্পকথা শুনে মানুষজন সব একে একে আলগা হচ্ছে। রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক। কারও কারও হাতে প্যাঁড়া, ফুল, আলতা-সিঁদুরের ডালা। সন্ধ্যাপূজায় মা-কে নিবেদনের জন্য। আমি তখনও বসে ভৈরবীর পাশে। দোকানদারকে আরও একপ্রস্থ চা দিতে বললাম। সঙ্গে বিস্কুট।

ভৈরবী বললেন, আমি কিন্তু শুধু চা। চিতাহোমে বসব আজ। তার আগে কোনও খাদ্যবস্তু কখনও আমি গ্রহণ করি না।

বললাম, তন্ত্রসাধনার উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে কেনই কেবল শ্মশানকে বাছা হয়?

চুপ করে গেলেন সাধনা ভৈরবী। কিছুপর চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, শ্মশান কিসের প্রতীক বলে মনে হয়?

ভৈরবীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিনিবদ্ধ চোখের তারা তখন আমার চোখেই যেন থমকে আছে। এমনই তাঁর চাহনির মাদকতা।

চোখ সরিয়ে নিয়ে বললাম, মৃত্যুর।

পুনরায় প্রশ্ন ছুঁড়লেন ভৈরবী।

— কিসের মৃত্যু?

উত্তর দিলাম আমি— শরীরের।

বোধহয় খুশি হলেন ভৈরবী। তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের আলোর এক সঞ্চার আমি যেন দেখলাম তারাপীঠের সন্ধ্যায়। সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গেছে। মায়ের

কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ মাইকে বেরিয়ে আসছে সজোরে। ভৈরবীও একবার 'জয় মা জয় মা' বলে লাফিয়ে উঠলেন। দোকানীও বুকের কাছে দু'হাত জোড় করে দোকানে ঝোলানো তারা মায়ের ছবির দিকে তাকালেন। দু'একজন পরিব্রাজের একান্তে গল্পগুজবের মুহূর্তটিকেও নিজে হাতে নিয়ে নিলেন ভৈরবী। সবাই তখন মায়ের দিকে ফিরে কিছু শুনবার অপেক্ষায়। এমনই তাঁর সম্মোহনীশক্তি।

বললেন— শরীর যেখানে চিরতরে শুয়ে থাকে, শয়ন করে তাই হল গিয়ে শ্মশান। তন্ত্রে শ্মশান হল গিয়ে বিনষ্ট করে ফেলা শরীরকে। শরীর যোগে বিনষ্ট করতে পারলে, স্থূলতা নষ্ট করে নিতে পারলে তবেই শরীরের মৃত্যু। এই যে শ্মশানে শ্মশানকালী পূজিতা হন কী কারণে তিনি পূজিতা হন?

বললাম— মায়ের ধ্বংসময়ী রূপ শরীরের স্থূলতাকে বিনাশের জন্যই।

— একেবারে ঠিক। শ্মশানকালীর দুই হাত কেন?

— কেন?

— এক হাতে তিনি শরীরের স্থূলতাকে ধ্বংস করেন আর আরেক হাতে সূক্ষ্ম শরীরের প্রাপ্যযোগকে সাধকের হাতে তুলে দেওয়ার ইশারা করেন।

বললাম— সে তো প্রতীকময়তার ইশারা।

ভৈরবী বললেন, তন্ত্র তো প্রতীক অধ্যায়। তাকে পড়তে-জানতে-শিখতে হয়। তন্ত্র তো বইতে লেখাজোকা কোনও কিছু আসলে নয়। তন্ত্র শরীর লেখে। শরীরের শক্তিকে তুলে ধরে। গুরু সেই শক্তির আলোকে নিয়ে আসেন। চিত্তকে কামনা শূন্য করতে শেখান গুরু। চিত্তের এই নাশকতা তো শ্মশানস্বরূপ। শরীরকে শ্মশান করে নেওয়ার জন্যই তো তান্ত্রিক বসেন গিয়ে শ্মশান সাধনায়। চিতাহোমে।

জিজ্ঞাসা করলাম, চিতায় বসে হোম করার অর্থ কী একটু যদি বুঝিয়ে বলেন?

বললেন— চিতা তো ধ্বংসময়তার প্রতীক। শরীরকে নাশ হতে সাহায্য করে চিতা। তন্ত্রে নাশ শরীরের স্থূলতার বিনাশ। তাই সেই বিনাশশক্তির মাঝে বসেই আমাদের যাবতীয় স্থূল কায়াকল্পকে নষ্ট করতে হয়। ধ্বংস করতে হয়। ধ্বংস আগুনকে ইশারা করে। আগুন হোমকে। অগ্নি প্রজ্জ্বলন হল শরীরের ভূতাগ্নিকে সক্ষম করার জন্য বাহ্য আগুনের অবয়ব। হোমে যে শক্তি প্রয়োগের কথা বলা হয় তা আমাদের চেতনার শক্তিকেই জ্যান্ত করবার জন্য বিশ্বাস। যে বিশ্বাসে মানুষের ছুটে আসা তারাপীঠে। পুণ্যতিথিতে শক্তিস্থানে। আসলে আমরা তো কোনও না কোনওভাবে শক্তিমত্তার বিকাশ চাই। এই যে আজ তারাপীঠে গিজগিজ করছে জনতা-জনার্দনের শক্তি।

চোখ বুজলেন ভৈরবী। অদ্ভুত একটা শান্ত ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রায় সকলের দিকে একবার চোখ মেলালেন। একটু স্মিত হাসি হাসলেন। বললেন, এবার আমায় উঠতে হবে। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে একবার যাব। সেখানে গিরি মহারাজ এসেছেন।

তারপরই আমার দিকে ফিরে তাকালেন ভৈরবী। জনতা-জনার্দন আস্তে আস্তে ভৈরবীর সম্মোহনী শক্তির বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আরও বিপুল জনস্রোতে মিশে গেলেন সবাই। আমিও তখন উঠবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। ভাবছি এইবার মহাশ্মশানের দিকেই যাব। অজস্র সাধু-তান্ত্রিক-ভৈরব এসেছেন। তাঁদের মধ্যেই এক-আধজনকে খুঁজে নিয়ে একটু সঙ্গ করবার ইচ্ছে জাগছে মনে। যদিও গতকাল রাতে ভৈরবী আমাকে বলেছিলেন, বুঝলেন তারাপীঠ এমনই জায়গা যেখানে ভাল-মন্দ দু'রকমই আছে, আবার এমন বয়স্ক তান্ত্রিকও রয়েছেন যাঁর সঙ্গ করলে শান্তি আসে মনে। তবে সঠিক মানুষটিকে চিনে বের করে নিতে হবে। না হলে আপনার জিজ্ঞাসার আধার সব বৃথা যাবে।

উঠতে উঠতে এই কথাগুলো যখন ভাবছি তখন দেখি ভৈরবী মন্দির রোডের উপর গিজগিজ ভিড়ের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে। হাতে তাঁর ত্রিশূলের চকমকি অনেক মানুষই দেখে প্রণাম সারতে সারতে এগিয়ে যাচ্ছেন। দু'একজন কুশল বিনিময়ও করছেন।

উঠবার সময়ই দোকানদার বললেন, মায়ের পেছন সেটে থাকুন একেবারে। ঠিক লোকের সঙ্গ নিয়েছেন। তারাপীঠের মহাসাধক শংকর খ্যাপার শিষ্যা। বহু সাধকসঙ্গের অধিকারী।

বললাম— সঙ্গে না নিতে চাইলে কি শুধু শুধু অনুসরণ করা যায়? যাই দেখি...

এই বলে এগোতেই একজন বললেন, মা আপনাকে ডাকছেন।

এগিয়ে গেলাম।

বললেন— কোথায় আর যাবেন! চলুন আমার সঙ্গে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে। গিরি মহারাজের সঙ্গে কথা বললে আপনার অনেক জিজ্ঞাসারই নিরসন হয়ে যাবে।

মন্দির রোড তখন লোকে লোকারণ্য। তারই ধার ঘেষে ঘেষে আমি আর সাধনা ভৈরবী তখন আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমের দিকেই রওনা হচ্ছি। রোডের উপরই সামান্য পথ। তবু জানি এটুকু পেরোতেই অনেক সময় লেগে যাবে আজ।

হাঁটছি আর ভাবছি, লোকে বলেন তারাপীঠের শেষ সাধক শংকর খ্যাপা। অলৌকিক সব গল্প আছে তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি ভক্ত-শিষ্যদেরই মুখে। সেই সাধকেরই

সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যা এখন আমার সঙ্গে! রীতিমতো শিহরণ হচ্ছে আমার শরীরে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সেই অনুভূতিকে সঙ্গে নিয়েই আমি চলেছি সাধনা ভৈরবীর সঙ্গে। আমার চোখে-মুখে তখন যোগযুক্ত অস্তিত্বের নির্ধারক জিজ্ঞাসু প্রবণতা।

ভাবছি, গিরি মহারাজ কি পারবেন আমার ঔৎসুক্যের চিহ্নায়নকে স্পষ্ট করতে; না কি সেখানেও বর্তমান সাধন পথের ভালরকম ভ্রষ্টতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যাবে আমার!

তন্ত্র বলতে আমরা বুঝি যন্ত্র সাধনা, মন্ত্র সাধনা, ভৈরবী সাধনা ইত্যাদি-কেই, কিন্তু এগুলো হল গিয়ে সব বাহ্যিক তন্ত্র। ভেতরের একটা তন্ত্র আছে। যার কথা সাধনা ভৈরবীও বলেছেন। যেটা হল গিয়ে যোগ। আরও সদার্থক অর্থে বললে কুণ্ডলিনীযোগ। সেই আন্তর তন্ত্র বা ভেতরের তন্ত্র দিয়েই কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করা হয়ে থাকে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে: 'তন্যতে বিস্তারিয়তে জ্ঞানম, অনেম ইতি তন্ত্রম।' অর্থাৎ কি না, যে জ্ঞান বিস্তারিত হয়ে তারণ (ত্র) করে তাকেই তন্ত্র বলা হয়। তন্ত্রে যে পঞ্চ ম-কারের সাধনার কথা বলা হয় তা তো আসলে যথার্থ অর্থে ইন্দ্রিয়েরই সাধনা। ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করবার সাধনা। তান্ত্রিক পঞ্চ ম-কারের সাধনায় ইন্দ্রিয়কে জয় করতে শেখেন, সত্যকে জানতে শেখেন, যথার্থ জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে শেখেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, প্রকাশিত বিশ্বের তিনি একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বিশ্বপ্রকৃতির সেই অংশবিশ্ব রয়েছে তাঁর শরীরে। যার অন্তরের শক্তিকে জাগরিত করে নিতে পারলেই নিজেকে তিনি স্ব-তন্ত্র করতে পারবেন। অর্থাৎ নিজেকে তিনি অতিক্রম করে যেতে পারবেন। নিজের স্থূল শরীরকে সূক্ষ্ম শক্তিমত্তায় নিয়ে আসাই হল তাঁর স্ব-তন্ত্র। আপন সত্তাকে অতিক্রম। অহং থেকে বাইরে এসে দাঁড়ানো। তন্ত্রের একটি ভাগে রয়েছে শব সাধনা, চিতাহোম ইত্যাদি। যার জন্য শ্মশানে যাওয়া। তবে তন্ত্র করবার জন্য যে সব সময় শ্মশানে বসতে হবে তার কোনও মানে নেই। অঘোরী সাধুরা শ্মশান সাধনার অর্থ বলতে গিয়ে যা বলে থাকেন তা অনেকটা সাধনা ভৈরবীর বলা প্রতীক কল্পকেই বাস্তব করে।

দুবরাজপুরের শ্মশানে একবার অঘোরী সাধু সদানন্দের সঙ্গে কথা হয়েছিল। শুনেছি অঘোরীরা আচরণে একটু মেজাজী প্রকৃতির হয়ে থাকে। প্রথম যেদিন সদানন্দের কাছে গিয়েছিলাম, ধুর্ ধুর্ করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলেছিলাম, একটু কথা বলতে চাই।

বললেন— শালা, রিপুধারী পশু সব। খুব অহংকার না তোর শিক্ষিত বলে। যা বলব সবই তো খাতাবন্দী করবি। পাঁচজনকে জানাবি। চিনি না তোদের। ওরে

আকাট মুখ্যু, তুই যে নিজে কিছু না জেনে জানোয়ারের বাচ্চা হয়ে রইলি তা তো বুঝলি নি। অপরকে জানাতে চলে এল। যা যা ভাগ। মদ, মেয়েমানুষ জান গে। কাজে দেবে।

সেদিন আর ধারে ঘেষতে দেননি সদানন্দ।

পরদিন যাওয়ার আগে শ্মশান লাগোয়া চা আর তেলেভাজার দোকানে গিয়ে বসলাম। উদ্দেশ্য সদানন্দের মর্জি-মেজাজকে একটু জেনে-বুঝে নেওয়া।

দোকানী বললেন, এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে যান। বাবা বিড়িতে খুশি হন খুব।

কথামত এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে সকাল-সকাল হাজির হলাম তাঁর ডেরায়।

দেখা মাত্রই বললেন, এত অপমান করলাম তারপরও আবার এসেছিস যখন মনে হচ্ছে তোর অহং মাত্রা কম আছে।

বিড়ির বাণ্ডিলটা দিলাম সদানন্দ বাবার হাতে।

খুশিতে তাঁর চোখ চক চক করে উটল।

বললেন— এত কীসের উৎসুক্য তোর?

বললাম— জানার, বোঝার।

— কী আর জানবি বাবা। এ পথে ব্যক্তিত্বের সীমা লঙ্ঘন না করতে পারলে কিছুই জানা যায় না বাবা।

— মানুষের তো ব্যক্তিত্বই সব বলা হয়ে থাকে বাবা।

— সেটা তো ভুল বলা রে। ব্যক্তিত্বই তো তোর সত্তাকে ঢেকেঢুকে রাখে। আর সত্তা ঢাকা পড়লে তুই নিজে কী, জানবি কীভাবে শুনি?

আমি চুপ।

বাবাজি বলে চলছেন।

— শ্মশান বাস কেন জানিস আমাদের? কেন মড়ার কাঁথা টেনে গায়ে দিয়ে শুই আমরা?

বললাম— কেন বাবা?

— শ্মশান বৃত্তি নাশের জায়গা। শ্মশান সাধনায় শরীর শব হয়ে যায়। তোরা বলবি শব যখন হল শরীর তখন আর কাজ কী তার? তখনই তো শ্মশানে যাওয়া। পোড়ানো। আমরা বলি শরীর শব করা মানে রিপু, ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বে ওঠা। শবের উপর বসে ধ্যানযোগ সারার অর্থ মনের উপর হতে নীচ অবধি একেবারে সর্বস্তরের কামনাকে আগাছার মতো করে টেনে তোলা। তা তুলতে পারলে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ। তা এলে কোথায় আর তোর ব্যক্তিত্ব। কিছু নেই রে। সবই শ্মশান।

বলতে বলতে উচ্চস্বরে হাসতে থাকলেন বাবা। প্যাকেট খুলে একটা বিড়ি মুখে দিয়ে বললেন, নানা যোগে শরীর শব হয় রে। শরীর শব হয়। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তো হল গিয়ে শ্মশানভূমি। চির বিরাজমান মৃত্যু সেখানে।

বললাম— আপনি তো শরীরের মৃত্যুর কথা বললেন।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সদানন্দ। বিড়ির শেষাংশটা টেনে পেটের কাছে এনে সেখানেই ঠুসে ধরলেন আগুনটা।

তাঁর এই শরীরী নির্যাতনে আমি অবাক হলাম।

বললেন— অবাকের কিছু নেই রে ছোঁড়া। শরীর মারতে শব করতে শরীরকে যোগে ব্যথা দিতেই হবে। যাতনা না এলে যতন হবে কী করে?

জিজ্ঞাসা করলাম, কীসের যতন?

— কিসের আবার শরীরের!

বিস্ময় প্রকাশ করলেন বাবা।

বললাম— সূক্ষ্ম শরীরের।

আমার এই কথায় খুশি হলেন বাবা।

বললেন— যাক তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। বয়স কম তো। তাই মাথাটা মোটা হয়ে যায়নি। না'হলে জানতে বুঝতে যারা আসে সব ব্যাটা মাথা-মোটা। শিক্ষার অহংকারে অশিক্ষা জড়িয়ে মরে। নির্ভেজাল বোধটাই নষ্ট হয়। দেখছি তোর বোধটা আছে। তা বাবা একটু যোগ শিখে নে না। তাহলে পথটা লিপিবদ্ধ করতে সুবিধে হবে। জেনে বুঝে অনুভব করে বলা ভাল না? জ্ঞান না হলে জ্ঞান বিতরণ করবি কীভাবে? শুধু বই পড়ে কী যোগ বোঝা যায়? যোগ করতে করতে যোগাচারের স্বরূপ জানা যায়। না হলে তো তোর জানা-বোঝা সব বীজগণিতের X Y Z হয়ে যাবে। সবই মনে করার ব্যাপার।

বললাম— শেখাবেন আপনি?

হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

বললেন— মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারবি? বিদ্যা নষ্ট করতে পারবি? এসব না করতে পারলে কুণ্ডলিনী জাগরিত হবে না। এ পথ আলাদা রে। তোর নয়। শক্তি তরঙ্গে অনুভব তোর হবে সাধকসঙ্গে এসে, কিন্তু বশীভূত হবে না কখনও শক্তি। এসব তোর দরকার নেই। শুধু বোধটাকে একটু নির্ভেজাল কর তাহলেই অনেকখানি হয়ে যাবে তোর। সাধু হওয়া তো সবার কম্ম নয়। আর এ পথ বড় ভয়ঙ্কর। জ্ঞানীলোক থেকে যোগীলোকে আসতে না পারলে কিছুই হবে না।

অঘোরীদের মূল সাধনা শব সাধনাই। শব এখানে আসলে সদানন্দ কথিত সেই ব্যক্তিত্বের সীমাকেই কাটিয়ে ফেলা। তন্ত্র তো পাশ ছেঁড়ার কথা বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের মতোই তো ব্যক্তিত্বও একটি পাশ। অঘোরী সাধু সেই ব্যক্তিত্বকেই নষ্ট করেন প্রথমে। তার জন্যই সাধনা। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ সব সময়ই অহং অতিক্রম করার কথাই কিন্তু বলে এসেছে। এখানে personality হল অহং। তার নাশের জন্যই শরীরকে শব করে তোলা। শবের উপর বসে মনের বৃত্তিসমূহকে নষ্ট করে ফেলা। শাস্ত্রে শব সাধনার দিনও ধার্য করা আছে। বলা হয়েছে: 'অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।/ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥' কৃষ্ণ বা শুক্ল পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে মঙ্গলবারের রাতে শব সাধনা করলে বলা হয়েছে সাধকের উত্তম সিদ্ধি আসবে। তবে যে কোনও শবের উপর বসেই সাধনক্রিয়া করা কিন্তু যাবে না। শবেরও রকমফের আছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি যষ্টি (লাঠি) শূল (সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র) ও খড়্গাঘাতে প্রাণ হারিয়েছে, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে, বাজ পড়ে বা সাপের কামড়ে যার মৃত্যু হয়েছে এমনই চণ্ডাল জাতীয় শবকে ব্যবহার করার কথা— 'যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং জলে মৃতম/বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্ ॥' তবে ব্রাহ্মণের শব পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি পালিয়ে না গিয়ে সামনাসামনি লড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তার দেহও শবসাধনার কাজে উত্তম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এইসব শব অল্প বয়স্ক ও সুন্দর হওয়া আবশ্যক— 'তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জলম্।/পলায়ন বিশূন্যন্ত সম্মুখরণবর্তিনম্॥' শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে কোন কোন শব সাধনার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃশ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত,শ্মশ্রুবিহীন, ক্লীব, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, বৃদ্ধ, সেইসব শব বর্জন করার কথাও বলা হয়েছে। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির দেহও শব সাধনার কাজে বর্জনীয়। সদ্যমৃত শব ছাড়া বাসী বা গলিত শবও সাধনার আধার হিসেবে কখনওই নেওয়া যাবে না, শাস্ত্র সেই নির্দেশিকাও দিয়ে রেখেছে— 'স্ত্রীবশ্যং পতিতস্পৃশ্যং নয়বর্জং হি তূবরং।/অব্যক্তলিঙ্গং কুষ্ঠীং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥ / ন দুর্ভিক্ষমৃতঞ্চাপি ন পর্যুষিতমেব বা। /স্ত্রীজনঞ্চেদশং রূপং সর্বথা পরিবর্জয়েৎ।'

শব সাধনার মূল অর্থ হল নিজের শরীরের স্থূলতাকে নাশ করে দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীর সাহায্যে শক্তি জাগরণ। তার জন্যই যোগক্রিয়া। শরীরকে যেহেতু সদার্থক শক্তিমত্তায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাই প্রতীক শবদেহে যে সাধক বসে নিজ শরীরের এবং সর্বোপরি মনের বৃত্তিগুলোকেই নাশের প্রচেষ্টায় রত হচ্ছেন শরীরের স্থূলতার মৃত্যুর কারণে সেই প্রতীকময়তা যাতে সুন্দর অতীন্দ্রিয় বোধস্পর্শে দিশা

পায় তাই শব সাধনের ক্ষেত্রে শব গ্রহণের নির্দেশিকা। যে সব শবদেহ গ্রহণ করতে নিষেধ রয়েছে শাস্ত্রে খেয়াল করলেই দেখা যাবে সেগুলো সবই আসলে ইন্দ্রিয়দোষে পুরোপুরি দুষ্ট। সাধক যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলোকে সাধনায় বশীভূত করে নিতে চাইছেন, সেহেতু প্রতীক ইন্দ্রিয়বৃত্তিনাশক শবদেহই তাঁর হতে পারে সাধনার আধার। তরুণ ও সুন্দর শবদেহ গ্রহণের কথাও এই জন্যই বলা হয়েছে যে, সেই শরীরগুলোতে বৃত্তির প্রকোপ কিছুটা হলেও কম। অল্প বয়স্ক শরীর কতখানি বেশি বা ব্যভিচারী হতে পারে। তবে ব্যতিক্রম আছে ঠিকই। আর সুন্দরতার সঙ্গে মনের প্রফুল্লতাও সংযুক্ত। সাধক যে শবদেহের উপর বসে সাধনা করবেন, তার আগে শবকে প্রণাম করে, সুগন্ধি জল দিয়ে তাকে স্নান করিয়ে বস্ত্র পরিয়ে শবদেহকে মার্জনা করে চন্দন দিয়ে অনুলিপ্ত করে নিয়ে তার উপর উপবেশন করে নিজের গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রকে উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে চক্রস্থ শক্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে শক্তিকে জাগানোর বিহ্বলতায় নিজেকে সকল ইহজাগতিক পথ ও পন্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন, সেই শবদেহের বহিঃসৌন্দর্য তো কিছুটা হলেও সাধককে সম্মোহিত করতে বাধ্য থাকবে। দৃষ্টির এমন গুণাগুণকে সাধক অস্বীকার করবেন কীভাবে? কেন না তখনও পর্যন্ত তো তাঁর দৃষ্টির স্থূলতাই জারি থাকবে; শব সাধনে সূক্ষ্মতার মনোরম্য শক্তির অট্টালিকাতে তিনি প্রবেশ করবেন, তার আগে তো নয়। তাই শবদেহও প্রতীকী নান্দনিক যুক্তিপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সদানন্দ সাধনযোগের কথা বলেছেন। শরীরকে নির্যাতনের প্রশ্নে ঠেলে দিয়েছেন জ্বলন্ত অগ্নিকে নিজের শরীরে নির্বাপণ করে নিয়ে। অঘোরী সাধনার এই যোগক্রিয়া ভয়ঙ্কর কঠিন সাধনাই আসলে যার কথা তিনি উল্লেখও পর্যন্ত করেছেন। তবে জনশ্রুতি যেরকম আছে তা আসলে রূপক পরিসরেই মোড়া। শরীরী নির্যাতন যেটা, সেটা যোগের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির চৌহদ্দিকে টপকানো। যেটা কঠিনক্রিয়াই। নির্যাতন যেজন্য, তা শরীরের জাগতিক অভিক্ষেপকে পরিচিত গতানুগতিক থেকে বের করে নেওয়া। যার জন্যই গুরু নির্দেশিত পথ। সাধনক্রিয়ার কষ্টসাধ্যতা। সেটাই আসল নির্যাতন।

তন্ত্রক্রিয়া গুরুর আদিগন্ত কারায়তনে বন্দী। গুরু ছাড়া একমুহূর্ত এগোনোর পথ নেই। শুধু তন্ত্র কেন? যে কোনও শরীর সাধনার ক্ষেত্রেই গুরু নির্দেশিকা অগ্রগণ্য। বাংলার বাউলও গুরু-শিষ্যের মেলবন্ধনে সহজাত সাধনা। গুরুই সেখানে শিষ্যের শরীরী যোগসাজশে প্রধান সহায়ককারী মানুষ। তন্ত্রও তাই। এগুলো সবই তো করণক্রিয়া। গুরুর শেখানো পদ্ধতির তাই অস্বীকারের কোনও জায়গা নেই সহজিয়া সাধনক্রিয়ায়। গুরুই সাধকের সিদ্ধিযোগ সহায়ক হন। গুরু কথার অর্থও

তো তাই। 'গু' কে যদি অন্ধকার ধরি আর 'রু' কে আলো হিসেবে দেখি, তবে দেখব যিনি অজ্ঞানতার তিমির থেকে শিষ্যকে আলোকবৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসেন তিনিই গুরু। আলোক এখানে জ্ঞানপ্রাপ্ততা। শরীর সাধনায় মন্ত্রজ্ঞানের থেকেও বড় শরীরজ্ঞান। চক্রজ্ঞান। নাড়িজ্ঞান। গুরুই তা কেবল প্রদান করতে পারেন। রপ্তকৌশল শেখাতে পারেন। যার জন্যই বলা হচ্ছে কিন্তু করণ-ক্রিয়ার কথা।

অঘোরী সাধনার ভয়ঙ্করতার সম্পর্কে বলা হয় যে, সাধক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর হাত পা কেটে জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলে দেন। বারো ঘন্টা পর আবার সেগুলো আপনাআপনি বেরিয়ে এসে তাঁর শরীরে সংস্থাপিত হয়। এটা আর কিছুই নয়। শব সাধনার মতোই পুরোপুরি রূপকযোগ। যাকে প্রতীকক্রিয়া হিসেবেও অনায়াসে আমরা দেখতে পারি। অঘোরী সাধনে এই যোগকে বলা হয় খন্ডমন্ড যোগ। এখানে হাত পা কেটে অগ্নিতে সমর্পণ করার অর্থ হল সাধকের কূর্মাসনে বসে কূর্মের মতোই অর্থাৎ কচ্ছপের মতো হাত পা গুটিয়ে নিয়ে বসা। এই হাত আর পা হল গিয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রতীক। খন্ডমন্ডযোগে সাধক ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলোকেই টুকরো টুকরো কাটার মতো করে একেকটি বিনষ্ট করে ফেলেন। যেটাকে বলা হচ্ছে আগুনে পোড়ানো। কাম, ক্রোধ, লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলোকে সাধক বশীভূত করে রাখার জন্যই কূর্মাসনে গিয়ে বসেন। অনেকে আবার অঘোরী সাধনাতে শরীরের একটি প্রত্যঙ্গকেও কেটে ফেলার কথা বলেন। এই ভয়ঙ্করতাও প্রতীকে সামিল। এক্ষেত্রে কেউ বলেন পায়ের একটি অংশ কেটে বাদ দেওয়ার কথা। কেউ বলেন পুরোপুরি এক পা বাদে দিয়ে একপায়ে দাঁড়ানোর কথা। এটি আসলে একখন্ডযোগ অঘোরীর। শরীরের একটি বিশেষ উত্তেজক ইন্দ্রিয়কে আগেভাগে অসাড়, অবশ করা। যা বাদেরই সামিল। মাথা কেটে ফেলার কথাও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলা হয় ভয়াবহতা প্রদর্শনের কারণে। যা একেবারে অবাস্তব। এটি অঘোরী সাধকের হেঁটমুন্ডযোগ। বলা হয়, হেঁট-মুন্ড হয়ে সাধনক্রিয়া করলে দ্রুত জ্যোতি দর্শন হয়। কিংবদন্তি, অসুররা নাকি হেঁটমুন্ড হয়ে সাধনা করত তাই তাদের উদ্দেশ্য দ্রুত সিদ্ধি অর্জন করত। নবখন্ডযোগের কথাও বলা হয় অঘোরী সাধনে। ভয়ঙ্করতায়, ভয়াবহতায় যা, শরীরের মূল অংশকে কেটে বাদ দেওয়া। অর্থাৎ মূল ইন্দ্রিয়শক্তিকে একেবারেই নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। অগ্নিখন্ড যোগের ভয়ঙ্করতায় গল্প ফাঁদা হয় যে, গুরু শিষ্যের ঘাড়ের পেছন দিক দিয়ে একটি জ্বলন্ত লোহার শিক মেরুদন্ড বরাবর ঢুকিয়ে দেন। অথচ তাতে শিষ্যের নাকি কোনও ব্যাথাভাবের প্রকাশ দেখা যায় না। অগ্নিযোগ এখানে গুরুর শেখানো পথ ও পন্থাতে কুন্ডলিনী জাগরণ। যা অনেকাংশেই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো মনে

করে থাকেন সাধক। তবে চড়ক মেলায় জিভ ফুটো করা, পিঠে বর্শী বেঁধানো ইত্যাদি শারীরিক নিদর্শনের ছবি আমরা দেখে আসছি অদ্যাবধি বিশেষত গ্রাম বাংলায়। যেগুলোর ক্ষেত্রে যোগক্রিয়াতে শরীরকে নিষ্ক্রিয় করে নেওয়া হয়। যাতে ব্যথা তখনকার সময় বেশ কম লাগে। শ্বাসশক্তির একটা গুণাগুণ তো আছেই। গাজনের সন্ন্যাসীর এই শারীরিক নির্যাতন মহাদেব বা ভোলানাথের আর্শীবাদীস্বরূপ অলৌকি-কতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হলেও তা যে শরীরক্রিয়া, অনেকাংশেই হট-যোগেরই পদ্ধতিরূপ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শরীরস্থ প্রাণ আর অপান বায়ুকে একত্র সংযোগ করে হটযোগে বর্শী বা লোহার শলাকা বেঁধানো হয় শরীরের নরম স্থানগুলোতে। যার জন্য জিভ বা পিঠের দিকের চামড়াকে বেছে নেওয়া হয়। যদিও পিঠের চামড়া তুলনায় পুরু। সেখানে বর্শী বেঁধানো হয় চক্রস্থ দন্ড-আধারে শরীরকে ঘোরানোর জন্যই। তবে এসব ক্রিয়াযোগে ভগবান কতখানি লাভ হয় বলা দুষ্কর। যেটা হয় লক্ষ্মীলাভ। ভগবানের নামে সন্ন্যাসযোগে গাজনের সাধুর হাতে তো কিছু টাকাপয়সার আমদানি হয়। ভগবান কথার এক অর্থ তো শূন্যতা। 'ভগ' অর্থ শক্তি। একে স্ত্রীযোনি হিসেবেও দেখতে পারি। 'বান' অর্থ অধীশ্বর। লিঙ্গ কল্পনা করে নেওয়া অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার নয়। তাহলে 'ভগবান' কথার যথার্থ অর্থ দাঁড়ালো:শক্তির যিনি অধীশ্বর তিনি ভগবান। দেহসাধক, যোগী, অঘোরী— সবাই শরীরে শক্তির অধিকারকে ধরে রাখতে সক্ষম। যা সৃষ্টি হচ্ছে শূন্যতা থেকেই। শরীর শূন্য হচ্ছে বায়ুর ক্রিয়ায়। শক্তির ঘনীভূত রূপকে বলা হচ্ছে যে স্থূল জগৎ। সাধক সেই শরীরের স্থূলতার মৃত্যু ঘটাচ্ছে বায়ুর ক্রিয়াতেই। ফলে তাঁর শরীরে ভগবানের সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানও বলছে শূন্যতা থেকেই শক্তির উদ্ভাবনের কথা। সাধক শরীরে শক্তি জাগছে শূন্যতার মধ্য দিয়ে। আর শূন্যতা জাগছে যোগে। কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যা যোগে রপ্ত করে নিতে হয়। যথেষ্টই গুহ্য কাজ। তা গুরু শেখান। আর এইসব সহজিয়া সাধনকর্ম যেহেতু বাইরে প্রকাশের ব্যাপরই নয় কোনও তাই সাধক দেওয়াল তোলেন। বাউল বলেন: 'আপন সাধন কথা না কহিও যথাতথা।' তান্ত্রিকেরও তাই মত। দেহসাধনার মুখ্য উপজীব্য বস্তুই গুহ্যতা। রহস্যময়তা। তার কারণ সেখানে তো শুধু দেহযোগ নয় দেহমিলনযোগও বর্তমান। সাধক আর সাধন সঙ্গিনীর শরীর মিলছে। ধ্যানে, যোগে, নিয়মকানুনে। যোনি- লিঙ্গ এক হচ্ছে। এভাবেও নাকি ভগবান লাভ হচ্ছে! তাঁদের অনুভূত ভগবান। চক্রস্থ শক্তিতে মিলনে বীর্যগতি সাধকের মস্তিকে উঠে যাচ্ছে। সাধিকার যোনিতে পতন হচ্ছে না। দুইজনেই শ্বাসযোগে বীর্যপাতকে ঠেকিয়ে দিচ্ছেন। তার কারণেই শরীরস্থ

শূন্যতার জন্ম। তার ভেতর পরম লাভ। বাউল বীর্যরক্ষা বা বস্তুরক্ষাকে আবার পরম বলে মানলেও তান্ত্রিক তাকে কখনও মুখ্য বা পরম বলে মানেন না। তবে অঘোরী সাধনে যে ভয়ঙ্করতার আড়াল তা কিন্তু সেই গুহ্যতা রাখবার কারণেই সৃষ্ট পথ। যাতে টপ করে সেখানে সাধারণের প্রবেশ কখনও না ঘটে। এছাড়া এই অতিরঞ্জন ভয়ঙ্করের কোনও মানেই নেই। আর একে সমীহ আদায়ও বলা যায় না। কারণ, একে তো এটি প্রান্তিক সাধন তার ওপর এইসব গালগল্প বিশ্বাসযোগ্যতার পর্যায়েও যাবে না যা দিয়ে অঘোরীর রোজগার হবে কিছু। কেন না প্রান্তিক সাধনা এখন নিচু স্তরেই চলে গেছে সাধনকারীর নানা সব ভ্রষ্টাচারে আর ব্যভিচারে। তবে প্রকৃত সাধক বা সাধন-কাঙ্খিত মানুষের এখন অভাব আছে তা কিন্তু বলা যাবে না। কেন না আধ্যাত্মবাদের কালক্রমে অনুমেয় শক্তি বা ভগবানের যোগকে অস্বীকার ভারত কেন সারা পৃথিবীরই সংস্কৃতি নয় কখনও। অঘোরী সাধনে কায়াকল্প যোগের নামে আরেক গল্পও ফাঁদা হয়ে থাকে। বলা হয় অঘোরী সাধক সাপের খোলসের মতো পুরনো শরীরটা অগ্নিচুল্লিতে পুড়িয়ে একেবারে নতুন দেহ ধারণ করেন। এখানে যেটা হয়, কুলকুন্ডলিনীশক্তির জাগরণে দেহের কোষগুলোর গতিবেগ এত বেশি মাত্রাতে চলে যায় যে তার অবক্ষয় ভয়ানকভাবে কমে আসে। ফলে সাধন শরীরে জরা গ্রাস করতে পারে না সচরাচর। এটাই হল পুরোনো দেহ পুড়িয়ে নতুন দেহ ধারণের গল্প।

শরীরকে শ্মশান করে নেওয়া বা শব সাধনায় বসা এই দুই ক্রিয়াকল্পই করণক্রিয়া। কী সেই ক্রিয়া? এই ক্রিয়া হল যোগক্রিয়া। তার জন্য প্রয়োজন চক্রক্রিয়া পদ্ধতির। গুরু সেই চক্রকেই আগে সম্যকজ্ঞানে শিষ্যকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যান তারপরই শুরু হয়ে যায় শিষ্যের চক্রস্থ শক্তির জাগরণ। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে, কীরূপে তা সুসম্পন্ন হয়?

যোগশাস্ত্র বলছে: 'অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্ন/ধ্বজধো গুদোর্দ্ধং চতুঃশেনপত্রম্। /অধোবক্তমুদ্যৎ সুবর্ণভভর্ণৈ/বকরাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ॥' এটি হল মূলাধার পদ্মের বর্ণনা। লিঙ্গের অধোদেশে এবং গুহ্যদ্বারের ঊর্ধ্বদেশে মূলাধার নামক পদ্ম রয়েছে। এই পদ্ম সুষুম্না নাড়ির মুখে সংলগ্ন রয়েছে। এর চারটি পত্র বা দল রয়েছে। পত্রের মধ্যে সোনার মতো রক্তযুক্ত ব, শ, ষ, স— এই চারটি বর্ণ দক্ষিণাবর্তে অবস্থান করছে। এ হল অধোমুখ। আরও বলা হয়েছে: 'অমুস্মিন্ ধরায়া শ্চতুষ্কোণচক্রং/সমুদ্ভা-সিশূলাষ্টকৈ রাবৃতং তৎ। /লসৎপীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং/তদঙ্কে সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজম্॥' পদ্মের কর্ণিকাতে চতুষ্কোণ পৃথিবীমণ্ডল আছে। এর আট দিকে আটটি প্রকাশমান শূলচিহ্নের দ্বারা আবৃত এই

মণ্ডল কান্তিশালী ও পীতবর্ণ। এর অবয়ব বিদ্যুতের মতোই কোমল। এই ধরামণ্ডলের মধ্যে পৃথ্বীবীজ (লং) অবস্থিত। এর বীজও পীতবর্ণ। বীজ সম্পর্কে শাস্ত্র জানাচ্ছে: 'চতুর্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং/তদঙ্কে নবীনার্কতুল্য প্রকাশঃ। /শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেবাহু— /র্মুখাম্ভোজললক্ষ্মীশ্চ-তুর্ভাগভেদ॥' বীজটি চারটি বাহু দ্বারা ভূষিত এবং ঐরাবতে উপবিষ্ট। ধরাবীজের কোলে শিশুরূপী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা রয়েছেন। তাঁর শরীরের আভা বালসূর্যের আলোর মতো। ব্রহ্মার চার হাত। হাতগুলো শোভাসম্পন্ন। মুখও চারটি। মুখগুলোও পদ্মের মতো শোভাবিশিষ্ট। অনেকে বলে থাকেন যে, চারভাগে বিভক্ত চার বেদই তাঁর মুখপদ্মের শোভাস্বরূপ। তখন শ্লোকটি 'চতুর্ভাগভেদঃ' না বলে বলা হয় 'চতুর্ভাগবেদঃ'। শ্লোকে মূলাধার পদ্মচক্র সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে: 'বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যা-ভিখ্যা/লসদ্বেদবাহুজ্জ্বলা রক্তানেত্রা। /সমানোদিতানেকসূর্য্যপ্রকাশা/প্রকাশং বহন্তী সদাশুদ্ধবুদ্ধেঃ॥' এই পদ্মেই ডাকিনী নাম্নী দেবীও বাস করেন। তাঁরও চার বাহু। উজ্জ্বল রং। চক্ষু রক্তবর্ণ। শরীরের আভা এককালীন সমুদিত বহু সূর্যের কিরণের মতো। তিনি সর্বদা তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ বহন করে চলেছেন। তারপর বলা হয়েছে: 'বজ্রাখ্যাবক্ত-দেশে বিলসিত সসতং কর্ণিকা-মধ্যসংস্থং/কোণং তৎ ত্রৈপুরাখ্যাং তড়িদিববিলসৎ কোমলং কামরূপম্। /কন্দর্পো নাম বায়ুনির্বসিত সততং তস্য মধ্যে সমন্তাৎ/জীবেশো বন্ধু জীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্য প্রকাশঃ॥' সুষুম্না নাড়ির মূল থেকে দু'আঙুল উর্ধ্বে ও লিঙ্গমূলের অধোদেশে বজ্রানাড়ির মুখ। এই নাড়ি মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অবস্থিত গহ্বরের মধ্যবর্তী। এখানেই ত্রৈপুর নামক প্রসিদ্ধ ত্রিকোণ সর্বদা অবস্থান করছে। এই ত্রিকোণ বিদ্যুতের মতো সমুজ্জ্বল ও কোমল। একে কামের অধিষ্ঠিত প্রদেশ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ত্রিকোণটি ঠিক ধরাবীজের উপরে অবস্থিত। ত্রিকোণের মধ্যেই সর্বত্র কন্দর্প নামে বায়ু সর্বদা বাস করে। এই বায়ু কোটি সূর্যের প্রকাশের মতো দীপ্তিমান। এই বায়ুকেই দেহের মধ্যে অবিস্থিত জীবের ধারক বলে বিবেচনা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে: 'তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনক-কলাকোমল পশ্চিমাস্যো/জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকার রূপ স্বয়ম্ভুঃ/বিদ্যুৎপূর্ণেন্দুবিম্বপ্রকরকরচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী/কাশীবাসী বিলাসী বিলসিত সরিদাবর্ত্তরূপপ্রকারঃ॥' অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিকোণটির মধ্যে কিছুটা উপরের দিকে লিঙ্গাকার পশ্চিমাস্য বা অধোমুখ স্বয়ম্ভু নামক শিবলিঙ্গ আছেন। তিনি গলিত স্বর্ণাবয়ব সদৃশ কোমল। তাঁর আকার অচিরোৎপন্ন পত্রাঙ্কুরের মতো। মূলভাগ স্থূল ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং শ্যামবর্ণ। তিনি বিদ্যুৎ ও পূর্ণচন্দ্রবিম্ব এই দুইয়েরই প্রকৃষ্ট কিরণসমূহকে উপহাস করেন। অর্থাৎ কিনা তিনি এদের তুল্য বিকাশশালী। তিনি

কাশীবাসী শিবের মতো বিলাসশালী হয়ে শোভা পাচ্ছেন। তাঁর আকার নদীর আর্বতের মতো। জ্ঞান ও ধ্যান এই দুয়ের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হন। মূলাধারের শ্লোকে আরও বলা হয়েছে: 'তন্মধ্যে বিসতন্তু সোদরলসৎ সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী/ব্রহ্মদ্বারামুখং মুখেন মধুরং সংদাদয়ন্তী স্বয়ম্। /শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীনপেলামালাবিলাসসাম্পদা/সপ্তা সর্পসমা শিরোপরিলসৎসার্দ্ধত্রিবৃত্তা কৃতিঃ। /কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং/বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনা ভেদাতি ভেদক্রমৈঃ। /শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবো যয়া ধার্য্যতে/সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসিত প্রোদ্দামদীপ্তাবলিঃ ॥' শিবলিঙ্গের ঊর্ধ্বদেশে মৃণালসূত্রের মতো সূক্ষ্মতমা কুন্ডলিনী দেবী শোভা পাচ্ছেন। তিনি জগতের মোহকাহিনী বা মায়াময়ী। তাঁর প্রভাবেই জন্তুগণ সংসারসাগরে নিমগ্ন থাকে। জন্তুরূপে এখানে কিন্তু মানুষের পশুত্বেরই ইঙ্গিত রাখছে আসলে শাস্ত্র। স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ছিদ্র নিজের মুখের দ্বারা মৃদুভাবে আচ্ছাদন করে তিনি শঙ্খের আবর্তের মতোই অবস্থান করছেন। তাঁর জ্যোতি অভিনব বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো। তিনি প্রসুপ্ত সর্পের মতো। শোভামান অর্ধত্রিবৃত্তাকারে অর্থাৎ সাড়ে তিন প্যাঁচে নিজেকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি মত্তভৃঙ্গ শ্রেণীর মতো অস্পষ্টভাবে মধুর শব্দ করে সুকুমার কাব্য ও পদ্য প্রভৃতি বন্ধ এবং এদের নানারকম সূক্ষ্মতম ভেদবিশিষ্ট বাক্য উৎপাদন করে মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অবস্থিত ত্রিকোণ গহ্বরে বাস করেন। এ জগতের সকল জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস বিভাগ করে দেহের অবস্থান ক্রিয়া তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যার দীপ্তি অত্যন্ত সুমজ্জ্বল। এরপরও বলা হচ্ছে যে— 'তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা/নিত্যানন্দ পরম্প-রাতিবিগলৎ পীযুষধারাধরা।/ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমের সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে/সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া॥' এর অর্থ হল, স্বয়ম্ভু-লিঙ্গে কুন্ডলিনী বেষ্টনীর ঊর্ধ্বস্থানে, কারও কারও মতে আবার কুন্ডলিনীর মধ্যেই, অনেকে বলেন স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মধ্যে, পরমা— যাকে বলা হচ্ছে অঘটনপটীয়সী কলানাদশক্তিরূপা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা অতি-কুশলা বলা চলে সৃষ্টি সম্পাদনযোগ্য নৈপুণ্যবতী পরা বা উৎকৃষ্টা কলা কিংবা শক্তি অবস্থান করছেন। তাঁর দীপ্তিতে ব্রহ্মাদি কটাহ পর্যন্ত সমগ্র জগত প্রকাশিত হয়। তিনি নিত্যানিন্দ থেকে পরম্পরারূপে আবির্ভূত সুধাধারা ধারণ করেন। যার থেকে নিত্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের আর্বিভাব ঘটে। আর তত্ত্বজ্ঞান এলেই তা দেহসাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। এই পরমেশ্বরী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা রূপে আছেন। একেবারে পরিশেষে মূলাধার সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'ধ্যাত্বৈ-তন্মুলচক্রান্তর বিবরল-সৎকোটিসূর্য্যপ্রকাশং/বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা সর্ববিদ্যাবিনোদী।

/আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দ চিন্তা-ন্তরাত্মা/বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুরগুরন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ ॥' মূলাধার চক্রের অভ্যন্তরিত ত্রিকোণের মধ্যে অবস্থিত গহ্বরে বর্তমান কোটি সূর্যের প্রকাশতুল্য প্রকাশশালিনী কুণ্ডলিনী দেবীকে চিন্তা করে সাধক মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। এবং শীঘ্রই তিনি সমগ্র বিদ্যানুশীলনজনিত আনন্দ অনুভব করতে পারেন। তিনি নীরোগ থাকেন এবং অন্তরাত্মা সর্বদা মহানন্দ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন। এই ধরনের শুদ্ধভাব সাধক কাব্যঘটক বাক্যের মাধ্যমে দেবগণকে ও গুরুজনকে সেবা করেন।

হালিশহর শ্মশানঘাটে বসে মূলাধার চক্রের ব্যাখ্যা এভাবেই আমাকে শোনাচ্ছিলেন তান্ত্রিক আলো সাধু। শ্মশানঘাটে মা ছিন্নমস্তার মন্দির বহুদিন ধরে সামলাচ্ছিলেন তিনি। প্রাজ্ঞ মানুষ তিনি। শাস্ত্রজ্ঞ। আমার সঙ্গে অনেকদিনেরই পরিচয়। আমার কৌতুহলকে তিনি মাঝে মাঝেই নিশ্চিহ্ন করতে সহায়ক হয়ে ওঠেন। আসতে বলেন। বিশেষত অমাবস্যায়। নিজে হাতে ভোগ রান্না করে তিনি তিনি প্রতি অমাবশ্যাতে মা-কে দেন। আমাকে বলেন প্রসাদ নেওয়ার জন্য। আমাকে তিনি তন্ত্রের নানা আয়োজন সম্পর্কে মাঝেসাজেই পাঠ দেন। তবে আমি জিজ্ঞাসা করলেই। না হলে তিনি সদাই ভাবমগ্ন। চুপ করে থাকেন। ভক্ত-শিষ্য আসেন। মদ-গাঁজা আনলে জোরাজুরিতে তিনি একটু প্রসাদ করে দেন। তাঁর সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে নানারকম। অভিযোগও আছে গুরুতর। তিনি নাকি দাগী আসামী। খুনও করেছেন একটা-দুটো। এখন নাকি পুলিশের চোখে ধোকা দেওয়ার জন্য ভেক নিয়েছেন মায়ের উপাসকের। তবে প্রথম প্রথম এসে তাঁকে আমি মদাচ্ছন্নতার মধ্যেই পেতাম বলা ভাল। চুর হয়ে রয়েছেন সব সময়। চোখদুটো ঢুলুঢুলু। রক্তবর্ণ। কিন্তু আশ্চর্যের, তার মধ্যে উত্তর দিচ্ছেন ঠিকঠাক। ঘুরছেন-ফিরছেন। পা পর্যন্ত টলছে না। ভুলও বকছেন না একটুও। অথচ তিনি ভরপেট খেয়েছেন। তবু মাতলামির লেশমাত্র শরীরে নেই। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাখ্যায় একেবারে নির্ভুল। শ্লোক বলছেন একেবারে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে। বলা হয় যে, সাধকদের পূর্ব জীবনের কথা জানার ইচ্ছে কখনও করতে নেই। তাছাড়া এটাও ঠিক অন্তেবাসীরা পূর্বজীবনের কথা বলতেও চান না খুব একটা। খুব গাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠলেও প্রসঙ্গ এলে তাকে কৃৎকৌশলে অন্য প্রসঙ্গে পার করে দেন। তাই আলো সাধুর পূর্ব জীবনের জনশ্রুতি আমার কর্ণগোচর হলেও সে রহস্য ভেদ হয়নি আর অদ্যাবধি কখনও কোনওদিন। আমি তা চেষ্টাও করিনি। আমার সেদিকে আগ্রহও জন্মায়নি। বরং আমার আগ্রহের বিষয় ছিল তাঁর ভাবালুতার প্রতিই বেশি মাত্রাতেই। তাই আমি ঘন-ঘনই যেতাম তাঁর কাছে। বসতাম। বুঁদ হয়ে তিনি শাস্ত্র আলোচনা করতেন।

শ্মশানে দুপুরের নির্জনতায় গঙ্গার হু হু হাওয়ায় তাঁর ব্যাখ্যা, শ্লোক শুনতে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়তেন তখন। যাঁরা দাহকার্যে এসেছেন মূলত সেইসব বিয়োগবিধুর মানুষজন। তবে সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ থাকত না আলো সাধুর। শুধু দু'একজন মদ এনে প্রসাদ করে দিতে বলতেন। তিনি নির্লিপ্ত মুখে এক ছিপি শুধু গলায় ঢেলে আবার পূর্বোক্ত আলোচনায় চলে আসতেন। তাঁর সঙ্গে-মিশে, কথা বলে এটুকু আমার মনে হয়েছে জনশ্রুতি যাই থাক না কেন তিনি শিক্ষিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ আর বর্তমানে যথেষ্টই সাধনমার্গেরই মানুষ। হতে পারে পূর্বজীবনে তিনি অপরাধকর্মে জড়িয়ে ছিলেন। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এখন অন্তেবাসী হওয়ার পর তিনি একজন ভাবালুতায় আচ্ছন্ন মানুষই কিন্তু আমার মনে হয়েছে।

তাঁর মূলাধার ব্যাখ্যার পর বলেছিলাম, যা বললেন এসব তো সবই ধারণা। প্রতীক। শোনা-জানা-পড়া কিছু শরীরের ক্রিয়াকর্ম।

বললেন—তা ঠিক। কিন্তু এসব তো অনস্তিত্বের কোনও ব্যাপার নয়। তোর মধ্যে ধাত্রীশক্তি আছে এটা তো মানিস?

বললাম—হ্যাঁ।

—তাহলে তোর মানাটা প্রতীক। ধারণা। এই ধারণায় তুই কিন্তু এসেছিস শুনে -জেনে -পড়ে। তোর জন্য যে অক্ষরজ্ঞান বরাদ্দ হয়েছিল অ, আ সবই তো ধারণা। প্রতীক। ভাষার আধারে যা অনস্তিত্বের নয়। এই প্রতীকে অ যে অ— তা তুই শুনে -জেনে-পড়ে-দেখেই বুজেছিস। আ-কে তুই অ মানিস না কারণ অ প্রতীক তোর জানা। তা জানিয়েছেন তোকে যিনি তিনি-ই তোর গুরু-আধার। শিক্ষক। ঠিক তেমনই শরীর জানা-চেনা-পড়া সবই ওই গুরু-আধারে হয়। অনস্তিত্বটা অস্তিত্ব করে দেন গুরু। তান্ত্রিকগুরু। যোগীগুরু। এসব তো প্রাণায়াম ও যোগক্রিয়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী করে বুঝব আমার মূলাধার জাগছে?

বললেন— জাগা মানে কী বলতে চাইছিস শুনি?

বললাম— অবশ্যই শক্তি।

—তা-ই বল। শক্তি তো তাপশক্তি। এ তো বোঝানোর নয় দেখানোর। মূলাধার চক্রে চাপ সৃষ্টি হলেই চৈতন্যশক্তি ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

— কীভাবে এই শক্তি ওঠে?

—যোগে শ্বাস-দমের ক্রিয়ায় শক্তি মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে উপরে ওঠে।

বলতে বলতেই তিনি পঞ্চমুন্ডির আসনে গিয়ে বসে পড়লেন। আসনের উপর বসে পড়েই শিরদাঁড়াটাকে সোজা সটান করে নিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। শ্মশান নির্জন। কোনও মড়া আসেনি। দু'একটা কুকুর কেবল এদিক-ওদিক

ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাওয়া উঠছে গঙ্গা থেকে। অদ্ভুত এক শান্তি ও আরামের ভেতর দেখছি সাধু শ্বাস নিচ্ছেন জোরে জোরে। ছাড়ছেন। শরীর কাঠামোর নির্দিষ্ট স্থানে নড়াচড়া চলছে। তারপরই দেখলাম সাড় নেই আর। ওঠা-পড়া নেই কোনও। দড়দড় করে ঘামছেন তিনি। এত শীতলতার ভেতরও তাঁর গাল-কপাল বেয়ে স্বেদবিন্দু নির্গত হচ্ছে সমানে।

কিছুপর চোখ খুললেন তিনি।

বললেন— তাপ এভাবেই ওঠে। প্রথমে মূলাধার খুলতে হয়। একদিনে হয় না। মূলাধার খুলতে সময় লাগে অনেকদিন। অভ্যাসযোগ। নিয়ম করে করতে হয়। কণ্ঠদেশে বায়ু নিয়ে গুহ্যদ্বার সংকোচন প্রসারণে মূলাধার খোলে। আর তা খুলতে পারলেই শক্তির জাগরণ হয়। জাগরিত শক্তির জন্যই তো ধারণা। যা তুই বললি। এই যে পঞ্চমুণ্ডিতে বসে আছি। পাঁচ-পাঁচটি মাথা সাজানো। এসব তো সবই সাধন অঙ্গের ধারণা। প্রতীক। তন্ত্র তো সিম্বলিক রে। শক্তি তো আধারে আসে। সিম্বলে।

বললাম— এই যে পাঁচ-পাঁচটি মাথা সিঁদুর মাখানো। কী সব প্রতীককে ইঙ্গিত করছে শুনি?

— এই যে শৃগালের মাথাটা দেখছিস....

হাতে তুলে তিনি আমার কোলে ছুঁড়ে দিলেন। প্যান্টটা আমার সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে গেল। থাইয়ের কাছদুটো। সেদিকে সাধুর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি সেটাকে ধরে পাশে নামিয়ে রাখলাম। তাতে যেটা হল হাতও আমার সিঁদুরে চপচপে।

—শিবা হল যোগতন্ত্রে জীবনের উত্তরণ। শিবাই শিব হবে রে। শরীর পশু থেকে শৃগাল থেকে শিব হলেই শক্তি জাগবে। শিব মানে শূন্যতা।

বললাম— দ্বিতীয় মাথাটি?

বললেন— ওটা সারমেয়। কুকুরের।

— এর মানে?

— মানে একেবারেই পরিষ্কার।

— কীরকম? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বললেন— কুকুর ভক্তের প্রতীক। মহাকাব্যে তো কুকুরই গিয়েছিল রে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। কুকুর সম্বন্ধে প্রভুভক্ততার নানা প্রমাণ আছে।

বললাম— তন্ত্রে এর সম্বন্ধ কী?

বললেন— সাধনার মূলই তো জ্ঞান আর ভক্তি। শিবজ্ঞান বা শূন্যতা সাধকের মূল শিবামুন্ডে। ভক্তির স্থূলতা রক্ষা সারমেয় মুন্ডে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তৃতীয় মুন্ড?

— ওটি সর্পের। সাপ তো বৃত্তি রে। পাশ। সাধনার ক্ষেত্রে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও জৈবিক প্রয়োজনীয়তা সাধককে কাতর করে না। কুন্ডলিনীশক্তি জাগাতে সাহায্য করে।

— আর চতুর্থ মুন্ড?

— বৃষের। বৃষ তো শিবের বাহন। সাধকের আত্মভোলা দশাটি হল বৃষের প্রতীক।

— পঞ্চমটি বুঝতেই পারছি মানুষের।

বললেন— বিদেহী আত্মার উঁকিঝুঁকি চারধারে। এইসব আত্মাদের যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথ তৈরি হয় তান্ত্রিক তাই পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে প্রেতভোগের ব্যবস্থা করেন। এসব সবই হল গিয়ে আসলে স্থূলতার সঙ্গে সূক্ষ্মতার মিশেল। পঞ্চমুন্ডির আসনে বসেই পঞ্চ মকার সাধনা করা হয়। এসবও তো স্থূলতা ভাঙার কারণে।

বললাম— সূক্ষ্মতার মদ কুন্ডলিনীযোগের ফলে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রের সুধা ক্ষরণ। মাংস হল বাক্ সংযম, মদ্য প্রাণায়ামে প্রাণ আর মনের একাত্মতা। মুদ্রা সৎ ভাবনা ও সৎ সঙ্গের চালনা আর মৈথুন যদি ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ অর্জনেরই প্রতীক হয় তাহলে স্থূল মদ-মাংসের প্রয়োজন কেন? তান্ত্রিক কেন মদ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন? আর ভৈরবীর সঙ্গে সহবাস করেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আলো সাধু। তারপর বললেন, গ্রাম বাংলায় চালু এক প্রবাদ অছে জানিস— কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। সেটা প্রতিশোধের। তন্ত্রেও তা খাটে রে। খাটে।

— কীভাবে? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বললেন— শরীর দিয়ে শরীর মারার কথা জানিস?

বললাম— ও তো বাউল সাধক বলেন।

বললেন— বাউল কেন রে ও তো আসলে দেহসাধক করেন। ভাগযোগ তোদের মতো বিশেষজ্ঞের কাজ। একটা কথা জানবি, সাধনা কোনও অর্থেই কিন্তু বিশ্লেষণের নয়। পঞ্চ ম-কার কেন বলা হয় জানিস?

বললাম— প্রতিটি দ্রব্যেরই আদ্য অক্ষর 'ম' বলে।

হাসলেন আলো সাধু। তান্ত্রিকের সেই অট্টহাসে তবে নয়। মৃদু এক হাসির রেখা তাঁর মুখমণ্ডলে উঠে মিলিয়ে গেল। তবে কথা বলার মধ্যে আজ আর মদের ভুরভুর গন্ধ নেই। ইদানীং তাঁর স্থূল মদাচ্ছন্নতার বালাই নেই কোনও। যা ওই এক ঢোক, এক ছিপি তা ওই ভক্ত-শিষ্যের প্রসাদ করার অনুরোধে। তবে বলতে কোনও বাধা নেই যে, এসব ভক্ত-শিষ্যরা বেশির ভাগই পাঁড় মাতাল। গাজারু। তাদেরই আনাগোনা শ্মশান চত্বরে তান্ত্রিকদের ডেরায় বেশি দেখেছি। এতদিনের সঙ্গে এটা বুঝেছি যে, এসব কারণেই প্রান্তিক এই সাধনা আভিজাত্যের মর্যাদায় এখন অনেকখানি নিচু নজরের। তার কারণ অবশ্যই তান্ত্রিকের ব্যভিচার। তবে এক্ষেত্রে সকলে একই সমার্থক মানুষ নন। অনেকেই আবার জাঁতাকলে পৃষ্ট। একথা বলছি এ কারণেই যে, শ্মশানে-মশানে এঁদের ডেরায় সাধারণের প্রবেশাধিকার সেই অর্থে তো নেই। অনেক মানুষ এঁদের ভয়ও পান। বলেন তুকতাক জানেন। ক্ষতি করে দিতে পারেন। এ তো মঠ-মন্দির নয় যে দলবেঁধে সকল মানুষের আগমন ঘটবে। তাই তান্ত্রিক ডেরা বাঁধলে ছাউনির টিন-প্লাস্টিক ও কিছু আনুষঙ্গিক চাহিদার যোগান দেন পাঁড় মাতাল শ্রেণি এই ভেবে যে, এটাও একটা মদ-গাঁজার ঠেক হতে পারে। আর তান্ত্রিক যেহেতু মদ-গাঁজা খানও তাই মঠ-মন্দিরের সেই নেশা নিষেধের ব্যাপার তো এখানে নেই। যার জন্য নেশারুর আনাগোনা এখানে বেশি। তান্ত্রিক অনিচ্ছায় এঁদের প্রশ্রয়ও দেন জীবনধারণের সুবিধার্থে। যতই তাঁরা সাধক হন খিদে-তৃষ্ণার কিছুটা ঊর্ধ্বে থাকুন তথাপি কিছু অর্থ তো লাগেই। যার যোগান আসে মূলত এদের কাছ থেকেই। পরে অবশ্য তান্ত্রিকের মাহাত্ম্য বা সুনাম এলে সাধারণের প্রবেশাধিকারও ঘটে কিছু সেখানে। তবে তার আধিক্য অনেক কম। যাঁরা আসেন তাঁরা ওই তুকতাকের কারণেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তান্ত্রিক সাধু কি সত্যিই এসবের অধিকারী হয়ে ওঠেন? উত্তরে হ্যাঁ বলেও যেটা বলতে হয় হল: কুলকুন্ডলিনী যখন কিছুটা জাগরিত হয় তখন সাধকের শরীরে একটা ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় ঠিকই। অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও বলতে পারেন তিনি। হাত দেখেন। হাত দেখে জ্যোতিষীরা যেমন করে বলেন, তেমন করে এঁরা আবার বলেন না কিন্তু। ঘরবাড়ি ছেলেমেয়ে সবার কথা আশ্চর্যভাবে বর্ণনা দিয়ে বলেন। এসব সব আসলে হয় ইচ্ছেশক্তির জোরে। কুন্ডলিনীশক্তিকে বেশি মাত্রায় জাগ্রত করতে পারলে এই ইচ্ছেশক্তির আয়ত্ত ঘটে সাধকের। যোগ করে কুলকুন্ডলিনীকে আজ্ঞা চক্র ভেদ করাতে পারলেই, সত্যের যথার্থ স্বরূপ বোঝা যায়। কুল-কুন্ডলিনী যখন ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে বহুমাত্রিক অবস্থা লাভ করে তখনই মনুষ্য শরীরে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা জন্ম নেয়। বলা হয়

সাধকের ক্ষেত্রে দূর দর্শন শ্রবণের কথাও। এর কিন্তু যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। মনের শক্তি নিউট্রনের মতো সব কিছু ভেদ করে পৃথিবীর গভীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে। মানুষের অন্তঃপুরে ঢুকে তার মনের ছবি দেখা যায় তখন। সাধক এই দর্শনেই জ্যোতির জগতের ছোঁয়ায় Extra Sensory ক্ষমতা নিয়ে মানুষের মনজগতকে পড়ে ফেলতে পারেন হুবহু। তখনই সাধারণে ভাবে যে, সাধকের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ভক্তশিষ্য ভিড় করে। অনেকেই তখন নাম-খ্যাতি-অর্থের লোভ আর সামলাতে পারেন না। এতেই পরবর্তীতে তাঁর শক্তির ক্ষয় হয়। তিনি আর ঠিকঠাক সব কিছু মিলিয়ে দিতে পারেন না। সাধকই তখন প্রতারক হয়ে ওঠেন। সাধকের এইসব মন পড়ার ক্ষমতাকে বিজ্ঞান দেখছে occult faculty হিসেবে।

কুন্ডলিনী জাগরণের প্রথম ধাপে সাধকের দেহ সমস্যা যেটা হয়, স্থূল দেহের উপরে যে চাপ পড়ে তা কমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা যখনই চলতে থাকে তখন সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশের প্রাথমিক পথটা খুলে যায় আর সূক্ষ্ম দেহে কুন্ডলিনীর তাপ বা চাপ গিয়ে প্রবেশ করলে অহংকারের যে স্থূল বন্ধন তা শিথিল হয়ে পড়ে। অনেকের মত এটা অহংকারের সমস্যা। আসলে সেটা অহংকার প্রতীকে ভারসাম্যেরই সমস্যা। কারও কুন্ডলিনী যদি হঠাৎ তীব্র গতিতে মুখরিত হয়ে পড়ে তাহলে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হলে সাধারণের যে ভাব হয়, সাধকেরও সেই ভাব আসে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অপ্রস্তুত কোনও ব্যক্তি যদি কুন্ডলিনীর স্বাভাবিকতাকে ঠিকঠাক বজায় রাখতে না পারে তাহলে স্বাভাবিক কারণেই নার্ভের উপর চাপ পড়ে। সেই চাপে হরমোনও গলে যেতে পারে আর তখনই স্নায়বিক দুর্বল্য দেখা দিতে পারে। দেহে কুন্ডলিনী জাগরণে সাধক দেহের মধ্যে জ্যোতির্বলয়ের দেখে থাকার কথা বলে থাকেন। স্নায়বিক দুর্বল্যকে সেই অসাম্যতায় বা সঠিক ভারসাম্যের অভাবে জ্যোর্তিবলয়ের তাল কাটা বা ফুটো হয়ে পড়া হিসেবে আমরা ভাবতেই পারি। জ্যোতির্বলয়ের (Halo) কাজই হল নানা ধরনের বহিঃ প্রভাবের হাত থেকে শরীরে অর্জিত সূক্ষ্মতাকে রক্ষা করা। এতে যদি ভারসাম্যজনিত অভাবে স্নায়বিক দুর্বল্য চলে আসে তাহলে স্বাভাবিক-ভাবেই বাইরে থেকে বা স্থূল শরীরের ক্ষতিকর পদার্থ সূক্ষ্মতার পর্যায়ে অনায়াসে ঢুকে যেতেই পারে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে যেটা হবে পৃথিবীর আবরণের উপরও যদি ভারসাম্যের অভাবে কিছু শিথিলতা চলে আসে তবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্বের কোনও বিষাক্ত রশ্মি এই গ্রহে পড়ে পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। সাধক শরীরকে পৃথিবী বা ব্রহ্মান্ডই কল্পনা করেন। এক্ষেত্রে শরীর পৃথিবী বা ব্রহ্মান্ডতে তো সেই একই সমস্যা দেখা

দেয়। তবে সাধক যদি কুন্ডলিনী জাগরণের ক্রমটিকে বজায় রাখেন তবে তাঁর দুর্বল্যগুলোকে তিনি শুধরে নিতে পারেন। তবু দেহের যে অঞ্চলে কুন্ডলিনী থাকবে সেই অঞ্চলের স্নায়ুর প্রভাব সাধকের উপর স্বাভাবিক ক্রিয়াতে থাকবে। যদি থাকে তাহলে শরীরস্থ দ্বিতীয় চক্র স্বাধিষ্ঠানে যৌন উন্মাদনা দিতে থাকবে। মণিপুরে, তৃতীয় পদ্মচক্রে এলে বিপদ আরও বাড়বে বই কমবে না। তৃষ্ণা, মোহ ইত্যাদি জাগতিক বৃত্তিগুলো গ্রাস করতে থাকবে। সাধক একেই বলেন খাই খাই ভাব। সাধক জ্যোর্তিবলয়ের বা ইংরাজি তর্জনায় Plasmic body-র ফুটো নয় বন্ধ করলেন কিন্তু তাতেও যে তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটবে তেমন কোনও মানে নেই। উল্টো সাধনও হতেই পারে। Personality বেড়ে যেতে পারে তাঁর। যেটা তাঁর ব্যক্তিত্ব বা অহংকার। এটা তো শরীরের স্থূলতা। অথচ অনেক সাধক এটিকেই আধ্যাত্ম অবস্থা ভেবে বসেন। কিছুটা উন্নতি তো সাধক শরীরে হয়ই তৃতীয় চক্রে মণিপুরে কুন্ডলিনী চলে এলে। সেই শক্তিতে মন পড়া যায় ঠিকই আর তা যদি সাধক শুরু করেন, ভক্ত-শিষ্যে সামিল হয়ে পড়েন; গুরুগিরিতে মেতে ওঠেন তাহলেই সেই অর্জিত শক্তি নষ্ট হয়ে বসে। তখন আর তাঁর ঠিকঠাক মন পড়া হয় না। তিনি ভন্ড তান্ত্রিক বা ঠকবাজ সাধুতে পরিণত হন। কিছুকাল ব্যবসা জমিয়ে টাকা-পয়সা করে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। অনেকক্ষেত্রেই মারধোর খেয়ে তাঁর নিজস্ব রমরমা পসারের পাততাড়ি গোটান। তন্ত্রজ্ঞ পুরুষ হয়ে ওঠা আর তাঁর হয় না। তন্ত্রে স্থূল মদ-মাংসের ব্যবহার নিয়ে আলো সাধু কিন্তু সুন্দর গ্রহণীয় এক উত্তর করেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তান্ত্রিকের মদ খাওয়া ও ভৈরবী মিলন নিয়ে যা আসলে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলনই। সেখানে পার্থক্য কেবল যা তা হল যোগক্রিয়ায় সাধকের বা পুরুষের বীর্যকে উর্ধ্বারেতা দান।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, সারা জগতজোড়া দুইটি পথই তো আছে।

বললাম— কীরকম?

বিস্ময় প্রকাশ করলেন তিনি।

বললেন— কীরকম আবার! দুটোই তো পথ রে।

জিজ্ঞাসা করলাম— কী কী?

বললেন— প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। পঞ্চ ম-কারের পথ হল প্রবৃত্তির। তুই যদি প্রবৃত্তিকেই না জানিস নিবৃত্তি তোর আসবে কীভাবে? ভোগ-বাসনায় না-থাকলে মদে-মাংসে-মৈথুনে না-আসলে তোর বৈরগ্য সাধনা হবে কী করে? বুঝবি কী করে তুই নিবৃত্তির সাধনাই আসল পথ? তন্ত্র তাই ভোগের মধ্য দিয়ে যোগে যায়।

সাধক মদে চুর হতে হতে এক সময় বোঝে আসল মদের আচ্ছন্নতা। যদি সাধন তার মুখ্য হয়; গুরু তার ঠিক হয়, তবেই না সে ব্রহ্মরন্ধ্রের মদে আচ্ছন্নতার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠবে। না হলে সে পাঁড় মাতালই হবে। ভৈরবী সাধনও তো ভোগই। আর ভোগের মধ্যেই যোগ আসে রে। যোগ আসলেই সাত্ত্বিক পথ খুলে যায়।

সাধুর কথা ধরে একটি গল্পকাহিনি এখানে উপস্থাপনা করা যেতেই পারে। তবে গল্পাকারে তা বললেও এ তো আসলে সাধকের দেখানো সহজপথ। চৈতন্যদেব বঙ্গ জুড়ে হরিনাম প্রচারের আদেশ জারি করলেন হরিদাসকে। কিন্তু হরিদাস নাম প্রচারে লোকই জমায়েত করতে পারলেন না। ফিরে এসে তিনি চৈতন্যদেবকে বললেন যে, ভোগাসক্ত জীব ভোগ পরিত্যাগ করে হরিনাম করতে যে রাজিই হল না। তখন চৈতন্যদেব নিজে হরিনাম প্রচারে বের হলেন। তিনি সর্বসাধারণকে বললেন যে, তোমরা মাছ-মাংস খেয়ে রমনীর কোলে বসে হরিনাম কর। এই কথা শোনা মাত্র দলে দলে লোক হরিনাম মহামন্ত্রের জয়গান করতে থাকল। হরিদাস সব দেখে-শুনে চৈতন্যদেবকে বললেন, আমাদের জন্য কঠোর সংবিধান, নানা সংযম-বিধান আর সাধারণের জন্য এরূপ ব্যবস্থার কারণ কী? চৈতন্যদেব বললেন, তোমরা বিষয়বিরাগী ঈশ্বরানুসারী ভক্ত। কাজেই তোমাদের জন্য সাত্ত্বিক পথের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু সাধারণ ভোগাসক্ত জীব, ভোগ ছাড়া জীবিত থাকতে ইচ্ছুক নয়। ভগবান অপেক্ষা তারা ভোগকেই প্রিয় জ্ঞান করে। তাদের বাসনানুযায়ী চলতে না পারলে তারা করবেই বা কেন? তাই তাদের ভোগের মধ্যেই হরিনামের ব্যবস্থা করলাম। কিছুদিন পর নামে মজে সকলেই ভেগবাসনা পরিত্যাগ করবে।

তন্ত্র যে চৈতন্যদেবের এই উপদেশকে শিরোধার্য করে বসেছে। সাধনার উপকরণের মদ-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা-মৈথুন স্থূল অর্থে এসে আপনা আপনিই যে সূক্ষ্মতায় গিয়ে মেশে তন্ত্র তারই ইঙ্গিত রাখছে।

আলো সাধু তন্ত্রের সেই অভিপ্রায়কে আমার সামনে চৈতন্য পথের মতোই খুলে ধরেছেন ব্যাখ্যায়, যুক্তিকতায়। আমি তো নিজেই দেখলাম সেদিন তাঁর নেশাচ্ছন্নতা একেবারে নেই। প্রসাদক্রিয়া ছাড়া তিনি মদই ছুঁচ্ছেন না একেবারে। বুঝতেই পারছি যে তাঁর সাত্ত্বিক যোগ চলছে। বিকেল নেমে আসছে হালিশহরে। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। সাধু এক সময় আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ছিন্নমস্তার দোর খুলে দিলেন। ঠিক তখনই শ্মশানে হরিধ্বনির শব্দ মুখরিত হয়ে উঠল। আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন শুধু সাধু। তারপরই মায়ের কাজে, সন্ধ্যারতির যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। শ্মশানযাত্রীর দু'একজনও তখন মন্দিরে প্রণাম সারছেন। আমি ভাবছি, সাধুর ঘুরে তাকানোর অর্থ কী? তিনি কি আমাকে

চাহনিতে বলতে চাইলেন, ওই শোন ভোগের পথের সমাধা হয়ে গেল? তারই শেষ মন্ত্রধ্বনি। বল হরি। হরি বোল। বল হরি। হরি বোল।

'সিন্দুরপুররুচিরারুণপদ্ম-মন্যৎ/সৌযুম্নমধ্যঘটিতং ধ্বজমূলদেশে। /অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈ— /ববাদ্যৈঃ সবিন্দুলসিতৈশ্চ পুরন্দ-রান্তৈঃ॥' অর্থাৎ, লিঙ্গমূলের সমদেশে সুষুম্না নাড়ির মধ্যে আছে আর একটি পদ্ম। এই পদ্ম সিঁদুরের মতো রক্তবর্ণ ও মনোরম। পদ্মের যে ছয়টি দল, বর্ণ তার বিদ্যুতের মতো। দলগুলো শোভা পাচ্ছে ব, ভ, ম, য, র এবং ল এই ছয়টি অক্ষর দ্বারা। এরপর বলা হয়েছে: 'তস্যান্তরে প্রবিল-সদ্বিশপ্রকাশ— /মম্ভোজমণ্ডলমযো বরুণস্য তস্য। /অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরনিন্দুশুভ্রং /বং-কার বীজমমলং মকরাধিরূঢ়ম্।' অর্থাৎ, এই পদ্মের মধ্যেই চিন্তা করতে হবে পদ্মাকার জলমন্ডলের কথা। এই জলমন্ডল হল অত্যন্ত শোভা সম্পন্ন, শুক্লবর্ণ ও অর্ধচন্দ্র শোভিত। এই পদ্মে রয়েছে প্রসিদ্ধ বরুণদেবের রং বীজ। এই রং বীজ শরৎকালের চাঁদের মতো নির্মল এবং মকরের উপর অধিষ্ঠিত। শাস্ত্র বলছে: 'তস্যাঙ্কদেশকলিতো হরিরেব পায়াৎ/নীল প্রকাশরুচিরশ্রিয় মাদধান। /পীতাম্বরঃ প্রথম যৌবন-গর্ব্বধারী—/শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো ধৃত বেদবাহু॥' অর্থাৎ, বরুণ বীজের কোলে থেকে ভগবান বিষ্ণু ত্রিভুবন পালন করেন। তাঁর বর্ণ মনোহর নীল। পরিধানে পীতবসন। যৌবনসুলভ গর্ব শরীরে। বুকে রয়েছে শ্রীবৎস্য চিহ্ন ও বনমালা। তিনি চতুর্ভুজ। অনেকে অবশ্য বলেন তাঁর হাতে রয়েছে আয়ুধ ও হৃদয়ে আছে কৌস্তভ রত্ন। এই কৌস্তভ হল অমৃতসূর্যের প্রভার মতো। কৌস্তভের নীচে রয়েছে অনুরূপ উজ্জ্বল শ্রীবৎসচিহ্ন। পাশবদ্ধ বরুণ বীজের কোলে হরির হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বাহনের কথা না বলা হলেও চিন্তায় রাখতে হবে গরুড়ের কথাই। কারণ হল, মূলাধার চক্রে হাঁসের পিঠে ব্রহ্মার উপস্থিতি দেখা গেছে। এরপর বলা হচ্ছে যে, 'অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিনীসা— /নীলাম্বুজোদরসহোদর কান্তি-শোভা।/নানায়ুধোদ্য একরৈর্ল-সিতাঙ্গ লক্ষ্মী— /দিব্যাম্বরা-ভরণভূষিত-মত্তচিত্তা॥' অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান পদ্মমধ্যে শোভা পাচ্ছেন প্রসিদ্ধা রাকিনী নাম্নী শক্তি। তাঁরও শরীরবর্ণ নীল পদ্মের মধ্যভাগের মতো। চার হাতে নানা আয়ুধ। এই চার হাত বৃদ্ধি করেছে তাঁর অঙ্গশোভা। তিনি ধারণ করেছেন দিব্যবস্ত্র এবং দিব্যাভরণ আর মত্তচিত্ত হয়ে আছেন। শেষে বলা হচ্ছে: 'স্বাধিষ্ঠানাখ্য মেতৎ সরসিজ মমলং চিন্তয়েদ যো মনুষ্য। /স্তস্যাহঙ্কার-দোষাদিক-সকলরিপুঃ ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন॥/যোগীশঃ সোহপি মোহাদ্ভুত তিমিরচয়ে ভানুতুল্যপ্রকাশো॥ /গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্ব্বিরচয়িত সুধা বাক্য সন্দোহলক্ষ্মীঃ॥' অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান নামে এই নির্মল পদ্মকে চিন্তা করে, তার

অহংকার, কামবোধ ইত্যাদি রিপু তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেই লোক যোগীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং দুর্নিবার মোহরূপ অন্ধকারের মধ্যে সূর্যের মতো প্রকাশ পেতে থাকে। সেই লোক গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধে অমৃততুল্য বাক্যসমূহের সৌষ্ঠব সম্পাদনে সমর্থ হয়।

সাধক, শরীরের দ্বিতীয় পদ্মচক্র স্বাধিষ্ঠানের এই শ্লোকজনিত ব্যাখ্যা এভাবেই ভক্ত-শিষ্যদের সামনে দিয়ে থাকেন। তারাপীঠের মুন্ডমালী তলায় বসে ধরণী খ্যাপা আমাকে স্বাধিষ্ঠানের এই ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিলেন। দু'একজন ভক্ত-শিষ্যরও সমাবেশ হয়েছে সে সময়। আজ নগেন বাবার আশ্রমে সাধু ভান্ডারা আছে। সেই উপলক্ষে গিজগিজ করছে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড়। তবে তাঁর সিংহভাগই যে ভেকধারী আর হতদরিদ্র মানুষজন তা তাঁদের চেহারা দেখলেই বোঝাই যায়। কোনও পথ নেই আর তাই সাধুবেশী ভিক্ষাধারী আর কী। তবে তারাপীঠ যেহেতু তাই প্রকৃত সাধকের ছায়া সেখানকার কোথাও নেই এমন ধারণাও ঠিক নয় একেবারে। কিন্তু এই সিদ্ধপীঠে প্রকৃত সাধক, তান্ত্রিক কখন চুপিসাড়ে আসেন আর চলে যান তা জানা মুস্কিল। আগেভাগে কিছু চেনাজানা থাকলে অবশ্য খোঁজ পাওয়া যায়। তেমনই খোঁজ মিলেছিল ধরণী খ্যাপার। থাকেন নলহাটির শ্মশানে। তন্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ হিসেবে কিছু তাঁর সমাদর আছে জনসমক্ষে। আমাকে খোঁজ দিয়েছিলেন তাঁরই এক ভক্ত-শিষ্য। ভক্তটির মুখেই শুনেছিলাম যে প্রথমে তিনি নাড়া বেঁধেছিলেন নাকি ল্যাংটাবাবা নামে এক পিশাচসাধকের কাছে। ল্যাংটাবাবা নাকি মড়ার মাংসও খেতেন। সব সময় কৌপীন পরে থাকতেন। তাই নাম ল্যাংটাবাবা। ল্যাংটাবাবার অলৌকিক ক্ষমতা সব নাকি ধরণী ক্ষ্যাপার আয়ত্তে। সত্যমিথ্যা জানি না। অলৌকিকতার কিছু আমার প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়নি। তবে তাঁর সঙ্গে কথা বলে যেটা মনে হয়েছে, পুরোপুরি সাধনমার্গের মানুষ। কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন যে, আপনার আর আমার মানুষ হিসেবে পার্থক্য কিছু আছে নাকি?

বললাম— তা তো কিছু আছেই। আপনি সাধনমার্গে থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞ। লোকে শ্রদ্ধা-সম্মান করেন। পায়ে লুটিয়ে পড়েন। খ্যাপা বলে মানেন।

হাসলেন তিনি।

বললেন— আপনিও তো আপনার পরিচিত মহলে শ্রদ্ধা-সম্মান পান না কি? সেগুলো কি সব মুখ্য নাকি? আর শাস্ত্রজ্ঞ! সে সব তো হল গিয়ে অর্জিত বিদ্যা। সে তো আমার থেকে আপনার অনেক বেশি আছে। পার্থক্য কেবল আপনি মায়াস্রোতে মিশে মায়ানাশের সন্ধান করতে এসেছেন। আখর বানাবেন কিছু।

পুস্তক লিখবেন। মনে রাখবেন ওই যে ভক্ত-শিষ্যদের দ্বারা আমার যে শ্রদ্ধা-সম্মানের কথা আপনি তুললেন, সেই ভক্ত-শিষ্য শ্রদ্ধা-সম্মান সব আপনার পাঠকের হাতে। আমি মায়াস্রোতের বিপরীতে আছি। চালচুলো নেই। শ্মশানে-মশানে থাকি। তাই লোকে আমাকে ক্ষ্যাপা বলে। আধ্যাত্মবাদে খ্যাপা, পাগল হল গিয়ে সব টাইটেল। পদবি। বুঝলেন। মায়াস্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালে আপনার কপালেও তা জুটত। ওসব আর কী। ছোঁদো সম্মান। ব্যক্তিত্ব খসার জন্য এ পথে এলাম আর দেখুন ব্যক্তিত্ব নিয়ে বসে আছি।

বললাম— মায়া কী আপনার চোখে?

— মায়া হল শক্তি। মা থেকেই মায়া। সংসারের বিষয়-কামনা তো মায়া। এত তার শক্তি লোকে কি ছিঁড়ে বেরোতে পারে? সাধক মায়ার মা-কে শুধু গ্রহণ করেন। ডাকেন। শরীরের শক্তিতে। তখন মা-ই মোক্ষ প্রদায়িনী হন।

— মা-ই শক্তি হন। চক্রে চক্রে তাঁর ওঠাপড়া। এই তো?

— হ্যাঁ। তবে মায়া প্রতীকমান। স্থূল দেহে মায়া থাকে। তখনই উপাদানে ভরপুর হয়। দেহ সূক্ষ্ম হলে উপাদানতীত হয়। আর তখনই সাধক মানসস্তরে পৌঁছে যায়।

— তার জন্য যোগসূত্র?

— হ্যাঁ। যোগেই তো চক্রভেদ হয়। মানস থেকে তখন মহামানসে চলে যাওয়া যায়।

— মহামানস কী?

— স্বপ্নহীন ইন্দ্রিয়ে এলে মহামানস আছে। তখন চক্র-প্রতীক নাশ হয়। দেবী-দেবতার ছবি মুছে যায়। তখন ঈশ্বরপর্যায়ে চলে যাওয়া যায়।

বললাম— আসলে আপনি বলতে চাইছেন যে, প্রথমে সাধক subject ধরে শুরু করেন শক্তিকে জাগাতে। তাই ব্রহ্মা-বিষ্ণুর উজ্জ্বল চিহ্ন সব চক্রে চক্রে। তারপরই পুরুষত্বের বিলীন শূন্যতায় তখনই শক্তিরূপিনী নারীর জাগরণ। স্বাধিষ্ঠানে তিনি যেমন রাকিনী। তারপরই পরম শূন্যতা। subject আর নেই তখন সবই object.

— একেবারে ঠিক। তবে কী জানেন, বিষয়টা অত সোজা নয়। সচ্চিদানন্দে আসতে আটটি পর্যায় পেরতে হয়। প্রথমে সৎ।

বললাম— Existence.

— তারপর চিৎ।

— Consciousness Force.

— আনন্দ।

— Bliss.

— এই তিনটি এলেই মহামানসে আসবে সাধক। বুঝলেন।

বললাম— supermind

বললেন— সেই supermind-এ আসতে বস্তুগত অস্তিত্বকে আগে পেরোতে হবে। তবে না আসবে এইসব দৈবঅস্তিত্ব।

জিজ্ঞাসা করলাম, বস্তুগত অস্তিত্ব বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

— প্রথমে মন।

— Mind.

— তারপর আত্মা।

বললাম— Psyche.

— প্রাণ।

— Life.

— বস্তু

— Matter.

— আসলে কী জানেন অস্তিত্বের পর্যায় থেকেই উপাদানহীন অস্তিত্বে আসতে হয়। আসতে হবে সৎ-এ। Existence-এ। এখানেই শূন্যতা পরম হয়ে বিরাজ করে যে।

তন্ত্রে একের পর এক চক্র ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। তার জন্যই বস্তুকে (Matter) জোর করে একটা বিশেষ স্তরে ওঠানো হয়, আবার সৎ-কে (Existence) একটি বিশেষ স্তরে নামাতেও হয়। সৎ (Existence) থেকেই চৈতন্য, চিৎ (Consciousness), আনন্দ (Bliss) ও মহামানসে (supermind) নেমে আসেন সাধক, আবার বস্তু (Matter) থেকে প্রাণ (Life), আত্মা (Psyche) ও মনের (Mind) সাহায্যে তিনি উপরে ওঠেন। দৈবঅস্তিত্বে সৎ (Existence) থেকে তিনি নামেন গিয়ে মহামানসে (supermind)। বস্তুগত অস্তিত্বে বস্তু (Matter) থেকে ওঠেন মনের (Mind) স্তরে। তখন দুই প্রান্তের দুই গ্রন্থি অর্থাৎ ঊর্ধ্বে বা উপরের এবং নিম্ন বা নীচের প্রান্তের এমন জায়গায় পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায় যে, শুধু একটা সূক্ষ্ম পর্দার জন্যই দুই জগতের অস্তিত্ব পৃথক হয়ে পড়ে। বস্তুকে যদি সাধক মনের পর্যায়ে নিয়ে আসেন আবার অপর দিকে সৎ-কে যদি মহামানসের পর্যায়ে নিয়ে আসেন তখন দৈবঅস্তিত্ব বা জগতের আলোয় অর্থাৎ সৎ+ চিৎ +আনন্দ +মহামানস-এর আলোয় বস্তুগত অস্তিত্ব বা জগৎ অর্থাৎ কিনা

এখানে মন + আত্মা + প্রাণ+ বস্তু আলোকিত হয়ে পড়ে। মন মহামানসে এসে গিয়ে দৈবসত্তার অধিকারী হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে আত্মা আনন্দিত হয়ে পড়ে। প্রাণও তখন চৈতন্য শক্তি বা চিৎ-এ আলোকিত হয়ে যায় আর বস্তু আলোকিত হয়ে পড়ে সৎ-এর ঝলমলে আলোক রশ্মিতে। যোগসাধনায় যদি দৈবসত্ত্ব আর বস্তুসত্তাকে একটি মিলনস্থলে রাখা যায় তবেই সমগ্র বস্তুসত্তা দৈবী জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে পড়ে। কাজটা বলা সহজ কিন্তু বাস্তবিক পর্যায়ে যোগ ক্রিয়ায় এলে অনেকদিনেরই তা অধ্যাবসায়। নচেৎ মোটেই সহজ নয়।

উপাদানহীন অস্তিত্বের কথা যে ধরণী খ্যাপা বললেন তাতে স্থূল উপাদানময় অস্তিত্বে আসতে 'সাংখ্যদর্শন' বলছে সৃষ্টিকর্মে চব্বিশটি উপাদানের কথা। যা চব্বিশতত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত। বাংলার বাউলও কিন্তু চব্বিশের কথা বলে থাকেন। আবার তাঁরা সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রস্পর্শের কথাও উল্লেখ করেন। তন্ত্র আবার ছত্রিশটি তত্ত্বের কথা কিন্তু বলছে এক্ষেত্রে। সাধুরা বলছেন যে, পুরুষ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। পুরুষকে শুদ্ধ পুরুষ বা শিব বলছেন তাঁরা। শিবের অর্থ শূন্যতা। অর্থাৎ কিনা সেই উপাদানহীন অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বে, শিবে, শূন্যতায় অহং থাকবে কিন্তু অহংকার বোধটি একেবারে আসবে না। অহং এলেই আসবে ইদম। তন্ত্র বলছে অহং আর ইদম একতোত্মর জড়িয়ে আছে। যাকে আমরা পুরুষ ও প্রকৃতি বলে চিহ্নিত করতে পারি। এটা হল তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব। শক্তিতত্ত্ব= পুরুষ + প্রকৃতি। এরপরই আসছে সদাশিবতত্ত্ব। অনেকে একে বলছেন সদাখ্যতত্ত্ব। এটা আর কিছুই নয়, শক্তির মধ্যে ইচ্ছের সঞ্চার। ইচ্ছেকে শক্তিতে পরিণত করে দেওয়া। ইংরাজিতে বললে একে বলা যেতে পারে universe in potential from. তারপরই ঈশ্বরতত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ কিনা পুরুষ অহং সম্পর্কে বোধ লাভ করেন। নিজের শূন্যতার অতীন্দ্রিয় ভুবনে এসে তিনি এটাও বুঝতে পারেন যে, অহং-এর বাইরেও কিছু আছে। এই বোধই তন্ত্রবিদ্যার শুদ্ধতত্ত্বের জন্ম দিচ্ছে। যেখানে অহং ও ইদম বোধ একেবারেই স্পষ্ট হয়ে আসছে। এরপরই মায়া বা কার্যমায়া— যা কিনা পুরুষের গুণ তাঁর একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও গুণকে পৃথক বলে মনে হওয়া। আর তার পরই আসছে সৃষ্টির সূক্ষ্মতম উপাদানগুলোর কথা— যা কিনা পুরুষের গুণ তাঁর একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও গুণকে পৃথক বলে মনে হওয়া। আর তার পরই আসছে সৃষ্টির সূক্ষ্মতম উপাদানগুলোর কথা— কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল ও নিয়তি। এগুলোকে বলা হচ্ছে পঞ্চকুঞ্চক। এরপরই প্রকৃতি পর্যায়। এই প্রকৃতিতেই সত্ত্ব, রজ, তম গুণ মিশে থাকে একত্রে। এই গুণগুলোর তারতম্য হিসেবে এরপরই আসছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়র কথা— চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কথা—

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পঞ্চ তন্মাত্র— মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন। পঞ্চ মহাভূত— ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই হল তন্ত্রের ছত্রিশটি তত্ত্ব। দাঁড়াল এই রকম: এক, শক্তিতত্ত্ব= পুরুষ ও প্রকৃতি। দুই, সদাশিবতত্ত্ব= ইচ্ছেশক্তি। তিন, ঈশ্বরতত্ত্ব= জ্ঞান শক্তির পরিবর্তে ক্রিয়াশক্তি। চার, শুদ্ধতত্ত্ব=মায়া বা কর্মমায়া। পাঁচ, পঞ্চকুঞ্চক =কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল, নিয়তি। সর্বমোট পাঁচটি। ছয়, প্রকৃতিতত্ত্ব= সত্ত্ব, রজ, তম, জ্ঞান, বুদ্ধি, অহংকার। সাত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়= চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক। আট, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়=বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। নয়, পঞ্চ তন্মাত্র =মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন। দশ, পঞ্চ মহাভূত= ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম। সর্বমোট যোগফল— শক্তিত্ত্ব (২), সদাশিবতত্ত্ব (১), ঈশ্বরতত্ত্ব (১), শুদ্ধতত্ত্ব (১), পঞ্চকুঞ্চক (৫), প্রকৃতিতত্ত্ব (৬), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (৫), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (৫), পঞ্চ তন্মাত্র (৫), পঞ্চ মহাভূত (৫)। তাহলে হল গিয়ে সংখ্যা নিরিখে— ২+ ১+ ১+ ১+ ৫ +৬ + ৫ + ৫+ ৫ + ৫= ৩৬। 'সাংখ্যদর্শনে'র চব্বিশ তত্ত্ব আসছে আবার এইভাবে: সেখানে ধরা হচ্ছে, প্রকৃতি (মহৎ) + বুদ্ধি +অহংকার+ মন+ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় +পঞ্চ তন্মাত্র +পঞ্চ মহাভূত = চব্বিশ তত্ত্ব। তবে ভেদাভেদ অনেক আছে সাধকের বর্ণনায়। ভিন্ন মত ও কর্মপন্থায়। সৃষ্টি ক্রমবিকাশের কাহিনিতে সিদ্ধান্তমত আবার বলছে, ক্রমবিকাশ হল দু'রকমের— শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ মায়াকে বলা হচ্ছে মহামায়া। এই মায়ার পরিচালক শিব। অর্থাৎ কিনা সাধকের শূন্যতা। মায়াকে শিব তিনটি শক্তি দিয়ে পরিচালনা করে থাকেন— ইচ্ছেশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি। শুদ্ধ মায়াকে এখানে আবার পাঁচ ভাবে ভাগ করা হয়েছে— নাদ, বিন্দু, সদাখ্য, মাহেশ্বরী, শুদ্ধ বিদ্যা। নাদ বলা হচ্ছে শিবতত্ত্ব। জ্ঞানশক্তি। হিন্দু শক্তিতত্ত্বে ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি অপেক্ষা প্রবলতর। শুদ্ধ মায়া থেকে চার ধরনের শব্দ আসার কথা বলা হয়— পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী। পরা শব্দ হল সর্বোচ্চ ও সূক্ষ্মতম। এই অবস্থা হল গিয়ে নাদের সমান। মানে হল এখানে শিবের (শূন্যতার) ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি পায়। পশ্যন্তি বলা হচ্ছে ঐশ্বরিক পর্যায়ের শব্দ। মূল থেকে অবিচ্ছিন্ন। মধ্যমা হল মূল থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু শ্রুতিগোচর নয়। বৈখরী হল গিয়ে শ্রুত শব্দ। অক্ষর ও শব্দে এর প্রকাশ। বলা হচ্ছে যে, শুদ্ধ মায়া থেকে সদাশিব ও রুদ্র আত্মপ্রকাশ করেন। সদাশিব তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা অশুদ্ধ মায়া থেকে সৃষ্টি করে ফেলেন কাল, নিয়তি ও কলা। সদাশিবকে সাধকের অতিশূন্যতা হিসেবে দেখা যেতে পারে। কলা থেকেই বিদ্যা/জ্ঞান ও রাগ/ আকর্ষণ জন্মায়। জ্ঞান এক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞান। আকর্ষণ শক্তির স্থিতাবস্থা। পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাওয়া সাধকের। পরমাত্মার পঞ্চকুঞ্চক বলা হচ্ছে— কাল,

নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগকেই। এই পঞ্চকুঞ্চুক দ্বারা প্রভাবিত আত্মা থেকে পুরুষতত্ত্বের (শূন্যতার) আত্মপ্রকাশ ঘটে। কলা থেকে রুদ্রের কার্যকলাপে প্রকৃতিরও আত্মপ্রকাশ হয়। প্রকৃতির অব্যক্ত পর্যায় থেকে আসে চিত্ত বা বুদ্ধি। বুদ্ধি হতে অহংকার। তিনরকম অহংকারের কথা বলা হয়। সাত্ত্বিক অহংকার, রাজসিক অহংকার ও বৈকৃত অহংকার। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে আসে ইন্দ্রিয় ও মন। রাজসিক ও বৈকৃত অহংকার থেকে আসে কর্মেন্দ্রিয়গুলো। ভূতাদি থেকে আসে তন্মাত্র। তন্মাত্র থেকে মহাভূত বা পঞ্চভূত। সৃষ্টি রূপে পরমপুরুষের এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে কাজ করে ছত্রিশটি তত্ত্ব এইভাবেও ভিন্ন মতে সামিল হয়েই। আবার শাক্তাদ্বৈত মতে, চৈতন্য আর শক্তির তিনটি পর্যায়। চিৎশক্তি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছেশক্তি। চিৎশক্তিকে বলা হচ্ছে যে, একেবারে নির্ভেজাল চৈতন্য। আনন্দশক্তি ইঙ্গিত রাখছে, চৈতন্যের বাইরেও কিছু আছে। ইচ্ছেশক্তি ইঙ্গিত রাখছে আত্মপ্রকাশের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আত্মপ্রকাশটি আসলে শক্তির। বলা হচ্ছে এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এসেছে চৈতন্যের তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। প্রথমে হল বীজাবস্থা। স্বাভাবিক এখানে বস্তুর প্রকাশ নেই কোনও। আছে পঞ্চতত্ত্ব— শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা। দ্বিতীয় অবিদ্যা। এখানে বস্তুর সূক্ষ্ম ক্রম ঘটে। পঞ্চকুঞ্চক না বলে বলা হচ্ছে মিশ্রতত্ত্ব এগুলো— মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, রাগ, বিদ্যা। যেহেতু একটি বেশি আছে বলেই বোধ হয়। তৃতীয় স্থূল পর্যায়কে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এখানেই অবিদ্যার প্রকাশ হয়। এসময় বস্তু অতীব শক্তিশালী হয়। এখানে আবার সাংখ্যের চব্বিশটি তত্ত্বের কথাই কিন্তু বলা হচ্ছে। বাউল যে চব্বিশটি তত্ত্বের কথা বলছে, সেখানে আসছে ষড়রিপুর ছয়— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়র দশ আর অষ্টপাশের আট— মুখ, দুই স্তন, দুই হাত, বুক, নাভি, যোনি। এই হল বাউলের আট। তন্ত্রের থেকে তা হুবহু আলাদা পাশ। এগুলোকে বাউল সাধক অষ্টমচক্রও বলে থাকেন। এসবই হল গিয়ে সঙ্গিনীর প্রত্যঙ্গ। সর্বমোট চব্বিশ এভাবে এল। তন্ত্রমতে ভৈরব মৈথুনে বা ভৈরবী চক্রে ভৈরবীর প্রত্যঙ্গগুলোর যেমন পুজো সারেন; কামপাশ মুক্ত করার কথা তাঁরা বলেন দুই শরীরেই গোপনাঙ্গের পুজোয়, বাউলও সঙ্গিনীর শরীর একইভাবে পরিভ্রমণ করেন দম আর শ্বাসে। যেহেতু তাঁরা পুজোয় বিশ্বাস করেন না। তখনই তাঁদের সেই সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রস্পর্শও হয়ে যায়। বাউল ফেনিয়ে এইসব বোধে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞান রাখেন। আসলে তা কিছুই নয় মিলনের সময় দম আর শ্বাসে বাউল যেমন সঙ্গিনীর শরীরে চুম্বন করেন সঙ্গিনীও একইভাবে তাই-ই সারেন। বলা হয় যে, করনখে দশ, পদনখে দশ, গলায় দুই দুইজনের,

অন্তরে এক, জিভে এক, কপালে দেড়। তাঁরা বলেন চুম্বনে আত্মবিস্মৃত মগ্নতা আত্মার কথা। সাধক ও সঙ্গিনী ভুলে যান নিজস্বতা। তাঁদের এই সম্বিতহীনতাই পরমতত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত। তন্ত্রে যা কখনও নয়। চক্রস্থ শক্তিতেই সেখানে কেবল পৌঁছানো যায়।

শরীরের তৃতীয় পদ্মচক্র সম্পর্কে শাস্ত্র বলছে: 'তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে/নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরূপহিত জঠরে ডাদি ফান্তৈঃ স চন্দ্রৈঃ ॥/ধ্যায়েদ বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মন্ডলং তৎ ত্রিকোণং/তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাদ্যৈ স্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজম্॥' অর্থাৎ, স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপরিভাগে নাভিমূলের সমদেশে দশদল মণিপুর নামক চক্র অবস্থিত। এই পদ্মের দলগুলো সজল মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ। এর মধ্যে নীল পদ্মের সমান বর্ণ ড-কারাদি ফ-কার পর্যন্ত বিন্দুযুক্ত দশটি বর্ণ সন্নিবিষ্ট আছে। ওই পদ্মমধ্যে বালসূর্যসদৃশবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমন্ডল ধ্যান করতে হয়। এই মন্ডলের বাইরের দিকে তিন কোণে তিনটি স্বস্তিক চিহ্ন শোভা সম্পাদন করে। বর্ণিত মন্ডলের মধ্যভাগে বহ্নির বীজ অর্থাৎ নাদবিন্দুযুক্ত রেখা চিন্তা করতে হয়। এরপর বলা হচ্ছে: 'ধ্যায়ে মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং তৎ ক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তি-নির্বসতি সততং শুদ্ধ সিন্দূররাগঃ॥' / ভস্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরলসিত-পুর্ব্ববৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রা/ লোকানা মিষ্টদাতা ইভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী॥ অর্থাৎ, মন্ডলস্থির বহ্নিবীজ মেষস্থিত, অভিনব সূর্যসদৃশ রক্তবর্ণ এবং তাঁর অঙ্গ উজ্জ্বল ও চতুর্বাহু সমন্বিত। তাঁর ক্রোড়দেশে বিশুদ্ধ সিন্দুরের মতো রক্তবর্ণ রুদ্রমূর্তি সর্বদা বাস করছেন। তিনি বৃদ্ধরূপধারী ও তিননেত্রযুক্ত। তাঁর শরীর ভস্মবিলেপনাভরণের দ্বারা শোভামান। তিনি লোকদিগকে ইষ্টদান করেন এবং হস্তে অভয়মুদ্রায়শোভিত হন। অর্থাৎ তাঁর হাতে অভয় মুদ্রা ও বেদ মুদ্রা বিদ্যমান আছে। তিনি জগতের সৃষ্টি ও সংহার করতে সমর্থ। তারপর বলা হচ্ছে যে, 'অস্ত্রান্তে নাকিনী সা সকল শুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী/শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈ র্বিবিধবিরচনালঙ্কৃতা মত্তচিত্তা। /ধ্যাত্বৈতন্নাভিপদ্মং প্রভবতি নিতরাং সংহৃতৌ পালনে বা/বাণী তস্যাননাব্জে নিবসতি সততং জ্ঞানসন্দেহলক্ষ্মীঃ॥' অর্থাৎ, মণিপুর নামক পদ্মমধ্যে বা পদ্মের কর্ণিকাতে প্রসিদ্ধা লাকিনী শক্তি অবস্থিতা আছেন। তাঁর অঙ্গ সমুজ্জ্বল এবং বাহু চারটি। তিনি শ্যামবর্ণা। পীতবর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার রচনার দ্বারা বা পরিধান ভঙ্গির দ্বারা অলংকৃতা। আনন্দময়চিত্তা এবং সকলের মঙ্গলকারিনী। ধ্যানান্তরে তাঁর তিন মুখ, তিন চোখ, প্রচন্ড দাঁত, ভীষণ রূপ এবং দক্ষিণ ভাগে ও বামে চার হাতে বজ্র,

শক্তি, বর ও অভয় মুদ্রা ধরে আছেন। যে মানুষ নাভিদেশস্থিত এই পদ্মকে চিন্তা করেন, তিন জগতের সংহার পালনে সমর্থ হন এবং তাঁর মুখপদ্মে ভারতীদেবী ও বিভিন্ন জ্ঞানসমন্বিতা লক্ষ্মী নিরন্তর বাস করেন।

মুন্ডমালীতলায় তারা মায়ের বৈষ্ণবী রূপ। নবমবর্ষীয়া বালিকারূপিনী। শ্যামাশ্যামা ভাব। শ্বেতবস্ত্র পরিধানে। বলা হয় মুন্ডমালীতলা তারা মায়ের স্নানের ঘাট। এখানকার প্রাণপুরুষ ছিলেন ছোটবাবা। বাবা দেহ রাখার পর মন্ত্রশিষ্যা কৃষ্ণা মা-ই মুন্ডমালী মায়ের মন্দির ও ছোটবাবা আশ্রমের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কৃষ্ণা মা-র মাধ্যমেই আলাপ জমেছিল আমার সরমা ভৈরবীর সঙ্গে। কথাবার্তায় বোঝা যায় যথেষ্ট শিক্ষিতা রমণী। শুনলাম কৃষ্ণা মায়ের কাছেই, তিনি না কি ছিলেন গৃহী-তান্ত্রিক। তাঁর বাবা সংস্কৃত পন্ডিত ছিলেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর পরই সরমা ভৈরবী হয়েছেন। তবে তিনি কোনও সাধনসঙ্গী জোটাননি। সত্তর উর্ধ্ব বয়স তাঁর। চামড়ার ঔজ্জ্বল্য ও মুখের আতিশয্য বলে দিচ্ছে যে এক সময় তিনি যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন। স্বামী মারা গেলেও বিধবার বেশ নয় তাঁর। কপাল ভর্তি সিঁদুর। হাতভর্তি পলা। তবে চুলে জটাটটা কিছু নেই। একঢাল পাকা চুল। বেশ যত্নেরই। তেল-সাবানে চাকচিক্য আছে।

মায়ের আরতি সবে শেষ হয়েছে। ভক্ত-শিষ্যের দাপট তারাপীঠের মন্দিরের থেকে এখানে বেশ কম। সব সময়ই একই চিত্র। সকলে এখানে আসেন না। তাই জায়গাটা মূল তারাপীঠের তুলনায় নিরিবিলি। সকালেই আজ আলাপ হয়েছে ভৈরবীর সঙ্গে। সন্ধ্যার পর পর দেখা হতেই কুশল বিনিময়ের পর কথা উঠল তন্ত্র সাধনার প্রথম স্তর নিয়ে।

বললেন— ধ্যানে-যোগে না বসলে আপনি শরীরের মধ্যে পৃথিবীরূপ দেখবেন কীভাবে? মূলাধারে ঘন স্রোতের লাল, স্বাধিষ্ঠানে গোধূলি আর প্রভাতের রক্তবর্ণ আলোর ছটার মাঝে ছোট ছোট সবুজ— এইসব অনুভূতি তো মানসনেত্রের ব্যাপার বাবা। আত্মদর্শন কী কখনও খুলে বলা যায়? শাস্ত্রদর্শন জানানো যায়। স্বাধিষ্ঠানের যে শ্লোকবাক্য এ তো সব মানস নেত্রের ব্যাপার বাবা। আপনার শুনে মনে হতেই পারে এসবই কষ্টার্জিত কল্পনা।

বেশ ভাল কথা বলেন ভেরবী।

বললাম— স্বাধিষ্ঠানের অনুভব কী আপনার?

বললেন— অনুভব কী বলছেন আপনি! সবই মানসনেত্রের বাস্তব। স্বাধিষ্ঠানে ছায়ামূর্তি ভাসে, মণিপুরে তারই স্পষ্টতা আসে যে।

— ও তো শক্তির চাপে আপনারই মনে হওয়া ছায়াঘন বলয়।

— পাখি কীভাবে ওড়ে তার ব্যাখ্যা আপনার কাছে কী আছে শুনি? যা বলবেন আপনি ওড়ার ভঙ্গিমার কারসাজি যা প্রমাণ করা যায় প্রত্যঙ্গের নিরীক্ষায় কিন্তু অনুভূতি ওড়ার উপলব্ধি এসব তো সংকেত আপনার কাছে। যোগও তাই। সংকেত রাখে। বুঝতে হয়। সংসারের প্রেম-দুঃখ-হাসি-অশ্রু সবই তো সংকেত রাখে বাবা। সংসারী সেখানে থেকে তা ধরতে পারে। সংসারের মতোই এ যে এক রাজ্য— যোগরাজ্য। এখানকার বায়ুমন্ডল, আকাশ, সূর্য, যেসব আত্মার ইঙ্গিত— সবই এ রাজ্যের অধিবাসী না হলে বোঝা যাবে না। শোনটা সবই আপনার থিওরি হবে। পরীক্ষায় মাতা যে হবে না। মানবদেশে মণিপুর চক্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। কুন্ডলিনী শক্তি এখানেই জঠরাগ্নি ও ভূতাগ্নির পার্থক্যকে ধরতে পারে।

বললাম— সূক্ষ্ম দেহের তাপ প্রবল হলে স্থূলদেহের তাপ তো এমনিতেই দুর্বল হয়ে আসবে।

বললেন— সাধককে এই চক্রে বসে দেহে যে পরিমাণ তাপ বা অগ্নির উপাদান আছে তা মেপে ব্যহবারের পথ করে নিতে হবে। চক্রগুলোর অবস্থান সব তো সূক্ষ্মদেহে। স্থূলদেহে মূলাধারে কুন্ডলিনী বস্তুসত্তা দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো থাকে। ঘুমিয়ে থাকে কুন্ডলিনী। আপনার যেমন আছে বাবা।

বললাম— কী করে বুঝলেন আপনি, আমার কুন্ডলিনী ঘুমিয়ে আছে?

— আপনার শরীরই তা বলে দিচ্ছে। চক্রবন্ধন যায়নি আপনার। সুস্থ নীরোগ শরীর আপনার, সুন্দর শরীর— সবই ঠিক কিন্তু বাবা যোগজ্যোতি যে নেই আপনার শরীরে। ও যে দেখলে বোঝা যায়। এ পথে ঘুরে-ফিরে আপনিও বোঝেন তা। না হলে হাটেমাঠে এত সাধুর ঘোরাঘুরি, আপনি খামোকা এই বৃদ্ধার কাছেই বা ছুটে আসবেন কেন শুনি?

আমি চুপ।

ভৈরবী বলে যাচ্ছেন।

— পার্থিব শরীরের বাইরে কিছু অপার্থিব শরীর আছে বাবা। তা আর কিছুই নয়। যোগের শরীর। তারই সন্ধানে আপনি বের হয়েছেন। আপনার সেই চেতনা আছে ঠিক কিন্তু কুন্ডলিনীর বিকাশচেতনা হয়নি আপনার এখনও শরীরে। এ আমার উপলব্ধ চেতনা। তবে মূলাধার খুলে যাবে আপনার।

— কীভাবে খুলবে? আমি যে যোগ করি না।

— মূলাধার আপনার খুলবে যোগ ছাড়া জ্ঞানশক্তিতে। যাতে ইচ্ছেশক্তি আছে। এই যে জানা-বোঝার ইচ্ছে আপনার, হোক তা মেকি অভিজ্ঞতা— যা আপনি লিখবেন কিন্তু সেখানে তো সদার্থক এক আলো আছেই। আধ্যাত্ম জ্ঞানের আলো।

আমি দেখছি বলতে বলতে ভৈরবী কেমন তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মুখে-চোখে খেলা করছে যেন সন্ধ্যার এই অকপটতা। ভাবছি আমার মূলাধারে প্রাণের আবেগে রোদের ছটার ঝিলিক লাগবে কি!

ভৈরবী বললেন, রোজ একটু শোনা-চেনা-বোঝা প্রাণায়ামটা অভ্যাস কর বাবা। নাতির বয়সী তুই। তোর জ্ঞানভান্ডারে শক্তির ঠোকাঠুকি লাগুক— আমি এই কামনা করি। উন্নতি আসুক তোর জীবনে।

মুহূর্তেই দেখলাম, ভৈরবী কেমন করে যেন আমার অদেখা ঠাকুমা হয়ে উঠলেন। আমার মাথাতে তাঁর হাতেরই স্নেহছায়া।

ভাবলাম, যতই তিনি ভাবমার্গে বিচরণ করুন, অপত্য অধিকার যে এই নিঃসন্তান গৃহী ভৈরবীর নেই সেই সুধাকণা তিনি কুন্ডলিনীশক্তি দ্বারা কীভাবে ঢেকে রাখবেন! পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যে তাঁর মোকাবিলা করে।

মণিপুর চক্রের পরেই চক্রই অনাহত চক্র। শাস্ত্রে এই চক্রের বর্ণনা রয়েছে এইরকম: 'তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলম্ /কাদ্যৈ র্দ্বাদশবর্ণকৈ রূপাহিতং সিন্দুর রাগান্বিতৈঃ/নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং/বায়োমন্ডল মত্র ধূম্রসদৃশং ষট্‌কোণ শোভান্বিতম্ ॥' মণিপুর পদ্মের উপর হৃদয় স্থানে অনাহত নামক পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্ম অত্যন্ত মনোহর এবং বন্ধুক পুষ্পের মতো উজ্জ্বল। অর্থাৎ গাঢ় রক্তবর্ণ। এর দল হল দ্বাদশটি আর পদ্মটি দেখতে সিঁদুরের মতো গাঢ় বর্ণের এই পদ্ম কল্পবৃক্ষের ন্যায় কিংবা তার থেকেও বেশি উৎকৃষ্ট। কল্পবৃক্ষ বাঞ্ছিত ফল দান করে, কিন্তু এই পদ্ম তার থেকেও বেশি ফল দান করে। তবে ফল এখানে কিন্তু মোক্ষরূপেই মানা হচ্ছে। এই পদ্মের মধ্যে ষট্‌কোণ শোভিত ধূম্রবর্ণ বায়ুর কথা চিন্তা করা হয়ে থাকে। এরপর বলা হচ্ছে: 'তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলীধূসরং/ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাবিরূঢ়ং পরম। /তন্মধ্যে করুণানিধান মমলং হংসাভ মীশাভিধং/পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিবধ ল্লোকত্রয়ানামপি ॥' এই পদ্মের মধ্যে যে বায়ুমন্ডল তার মধ্যে ধূম্রশ্রেণির মতো ধূসরবর্ণ মনোহর বায়ুবীজ (যং) চিন্তনীয়, যা হস্তচতুষ্টয় দ্বারা শোভামান এবং কৃষ্ণসার মৃগে সমারূঢ়। বায়ু বীজের মধ্যে ঈশ নামক করুণাধার হংসের মতো শুক্লবর্ণ এবং নির্মল শিবমূর্তি চিন্তার কথা বলা হয়েছে। যিনি দু'হাত দিয়ে ত্রিলোকবাসীকে বর এবং অভয় দান করছেন। শিবের ত্রিনয়ন। কণ্ঠভূষা, অঙ্গদ, হার ও নূপুর এই সকল অলংকারে তিনি সজ্জিত। ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে আছেন। তাঁকে কপর্দ্দকযুক্তরূপে চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে: 'অত্রান্তে খলু কাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা

শুভা/সর্ব্বা-লঙ্কারণান্বিতা হিতকারী সম্যগজনানাং মুদ্রা। /হস্তৈ: পাশকপালশাভন-বরান্ সংবিভ্রতি চাভয়ং/মত্তা পূর্ণসুধারসার্দ্রহৃদয়া কঙ্কাল মালাধরা॥' অনাহত পদ্মের মধ্যে প্রসিদ্ধা কাকিনী নাম্নী শক্তি বিরাজ করছেন। তিনি অভিনব বিদ্যুতের মতো পীতবর্ণা ও ত্রিনেত্রা এবং শুভলক্ষণান্বিতা। তাঁর শরীরে সর্বপ্রকার আভরণ নিহিত রয়েছে। তিনি হর্ষভরে সম্পূর্ণরূপে সর্বলোকের হিতসাধন করছেন। তাঁর চার হাতে পাশ, কপাল, অভীষ্টবর ও অভয় ধরা রয়েছে: 'এতন্নীরজ কর্ণিকান্তরলসচ্ছিক্তি স্তিকোণাভিধা/বিদ্যুৎ কোটিসমানকোমলবপুঃসাস্তে তদন্তর্গতঃ। /বানাখ্যঃশিবলিঙ্গকোহপি, কনকাকারাঙ্গারাগোজ্জ্বলঃ/মৌলৌ সূক্ষ্মবিভেদযুঙ্মনিরিব প্রোল্লাসল্যালয়ঃ॥' হৃদয়ে অবস্থিত পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণা নাম্নী দেদীপ্যমানা শক্তি অবস্থান করছেন। যাঁর দেহ শতকোটি বিদ্যুতের মতো ও কোমল। তাঁর অভ্যন্তরে বাণ নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। যাঁর শরীর স্বর্ণবর্ণ অঙ্গরাগে শোভিত। এই বাণ লিঙ্গের মস্তকেও সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। তিনি উপরিভাগে ছিদ্রযুক্ত মণির মতো প্রকৃষ্ট শোভাকে ধারণ করে আছেন। বলা হচ্ছে যে, 'ধ্যায়েদ যো হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং শর্ব্বস্য পীঠালয়ং/দেবস্যানি-লহীন-দীপকলিকা-হংসেন সংশোভিতম্। /ভানো র্মন্ডলমন্ডিতান্তরলসৎ-কিঞ্জল্কশোভাধরং/বাচামীশ্বর ঈশ্বরোহপি জগতাং রক্ষাবিনাশে ক্ষমঃ॥' যে ব্যক্তি হৃদয়ে অবস্থিত এই পদ্মকে ধ্যান করেন তিনি বাক্যের অধীশ্বর বৃহস্পতিতুল্য হন এবং ত্রিজগতের ঈশ্বর রক্ষণবিনাশে সমর্থ হন। এই পদ্মকর্ণিকা নির্বাতদীপকলিকাকার হংসস্বরূপ জীবাত্মা দ্বারা সুশোভিত। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে প্রকাশমান কেশরগুলো সব কর্ণিকার অভ্যন্তরস্থ সূর্যমন্ডল দিয়ে পরিশোভিত। তাই সাধককে পদ্মের কর্ণিকাতে প্রথমে বায়ুমন্ডল, তারপরে সূর্যমন্ডল ও এরও পরে বায়ু বীজকে ধ্যান করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। সবশেষে অনাহত চক্র সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'যোগীশো ভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ কান্তাকুলস্যানিশং/জ্ঞানীশোহপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়গণো ধ্যানাবধানক্ষমঃ। /গদৈঃ পদ্যপদাধিভিশ্চ সততংকাব্যাম্ব-ধারাবহো/লক্ষ্মীরঙ্গনদৈবতং পরপুরে শক্তঃ প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ॥' যে ব্যক্তি এই পদ্ম চিন্তা করেন, তিনি হলেন যোগীশ্রেষ্ঠ। কামিনীদিগের প্রিয়তম বিশেষ জ্ঞানশালী পুণ্যবান জিতেন্দ্রিয় এবং ধ্যান দ্বারা বস্তুজগতের স্বরূপাবধারণে সমর্থ হন। লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গনের দেবতা হয়ে থাকেন। গদ্য-পদ্যাদি রচনা দ্বারা নিরন্তর কাব্যরূপ জলবর্ষী মেঘরূপে প্রতীকমান ও মুহূর্তের মধ্যে অপরের শরীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

নগেন বাবার আশ্রমেই কথা হয়েছিল মণি ভৈরবের সঙ্গে। থাকেন তিনি বক্রেশ্বর শ্মশানে। বক্রেশ্বরের তন্ত্রে স্থানমাহত্ম্য একটা আছেই। অষ্টাবক্র মুনির

সিদ্ধাসন এখানেই। ভৈরব প্রতি অমাবস্যায় তারপীঠে আসেন যাগযজ্ঞ করতে। বললেন, মায়ের স্নানঘাটে করণক্রিয়া যা করি। মহাশ্মশানের জনারণ্যে ভক্ত-শিষ্যদের ভিড়ে করণক্রিয়া ঠিকঠাক হয় না।

বিকেল বিকেল মায়ের স্নানঘাটে তিনি যজ্ঞকুন্ড বানাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে ঘিরে ছিলেন গুটিকতক ভক্ত-শিষ্য। তারই মাঝে এল চক্র-প্রসঙ্গ।

বললেন— শরীরের প্রথম তিন পদ্মচক্রে কিছুই যে নেই বাবা। মূল ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয় অনাহতে এসে। আধ্যাত্মবাদের সূচনাই হয় অনাহতে।

বললাম— কীভাবে?

— আধ্যাত্ম-কথার অর্থ কী জানেন আপনি?

— অবশ্যই জ্ঞান।

— এই জ্ঞানের শুরু অনাহতে এসে। এই যে বাহ্যিক যাগযজ্ঞ সাধক করেন তা নিজের কুলকুন্ডলিনীকেই আসলে সতেজ ও ক্রিয়াশীল করার জনাই।

বললাম— এর সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্ক কী?

— যজ্ঞ কথার অর্থ জানেন আপনি?

— কী?

— যজ্ঞের অর্থই হল আধ্যাত্ম জ্ঞান। যজ্ঞ করা হয় কেন জানেন কিছু?

— কুন্ডলিনীর ক্রিয়াশীলতার কারণে। এ তো আপনিই বললেন।

—তা বললাম। যজ্ঞকে আমরা মানি আকাশী শব্দ। ব্যোম বলে। অনাহতে ব্যোমের স্থান। বীজমন্ত্র যং। যজ্ঞের মূল লক্ষ্য হল গিয়ে ব্যোমীয় প্রাণীদের ভোজন করানো।

বললাম—কারা এঁরা?

—এঁরাই তো দেবতা। সাধক মানেন যে, যজ্ঞের সুঘ্রাম বেরোয়, যাকে আমরা বলে থাকি ধুঁয়া তাই এঁরা ভোজন করেন।

—অনেকে বলেন মণিপুরের আগুনে শরীরের যাগযজ্ঞের কথা।

—তাই তো হল বাবা। দেবতা তো সাধকের শরীরে। আপনি প্রতীক বুঝলেন এতক্ষণ। জয় মা। মাগো এ যে উল্টা বুঝলি রাম। মণিপুরে সাধকের জঠরাগ্নি মরে এ তো জানেন। না কি? লাইনে অনেকদিন ঘুরছেন-ফিরছেন মনে হয়। চক্র বুঝছেন পড়াশুনার মতো করে। চক্র তো বিজ্ঞান। মুখস্থ উগরে ফল মিলবে কি আপনার?

বললাম— শেখাবেন?

— সিখবেন কি আপনি! নাড়া বাঁধতেচ হবে মাসের পর মাস। ও আপনার হবে না। সব ছেড়ে এসে পড়লেও হবে না।

— কেন?

— কারণ, আপনি জ্ঞান জিজ্ঞাসু। ভাব-জিজ্ঞাসু হলে এসব হয়। অনাহত পদ্মে ধ্যানে যোগে ভাবজ্ঞান আসে। সে অনেক কঠিন কাজ। বরং আপনি জিজ্ঞাসাটুকু ঠিকঠাক জানুন। জঠরাগ্নি মরে এলে ভূতাগ্নি জ্বলে উঠবে শরীরে। যার শরীরে ভূতাগ্নি জ্বলে তিনিই যজ্ঞ করার অধিকারী।

কথা চলতে চলতেই দেখছি ভৈরবের যজ্ঞকুন্ড একেবারে প্রস্তুত। এখন তা কেবলই প্রজ্জ্বলনেরই অপেক্ষায়।

শরীরের পঞ্চম পদ্মচক্র বিশুদ্ধ চক্রের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এইভাবে: 'বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজ মমলং ধূমধূম্রাবভাসং/স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ সৌনৈর্দলপরিলসিতৈ দীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ। / সমাস্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভো-মন্ডলং/বৃত্তরষ্ঠপং হিমচ্ছায়ানাগোপরিলসিততনোঃ শুক্র বর্ণস্বরস্য॥' কণ্ঠ-দেশে বিশুদ্ধ নামক নির্মল পদ্ম অবস্থিত আছে। এই পদ্ম ধূম্রবর্ণের মতো অবভাসমান। এই পদ্মের দল রক্তবর্ণ। এই রক্তবর্ণ আ-কারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণের দ্বারা প্রকাশিত। এই পদ্ম শুভবুদ্ধি মানবের জ্ঞানদৃষ্টিগম্য। অর্থাৎ কিনা যিনি চিত্ত নির্মল করে নিতে পেরেছেন তিনিই এই পদ্ম প্রত্যক্ষ করতে পারেন। নচেৎ অন্য কারও পক্ষেই তা সম্ভবপর নয় কোনওভাবেই। এই পদ্মের মধ্যেই আছে পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রকাশিত গোলাকার আকাশমন্ডল। এতে শ্বেতহস্তিস্থিত শোভিত দেহ শুক্লবস্ত্র পরিধান করে শুক্লবর্ণ বীজ হং অবস্থান করছে। এরপরই বলা হচ্ছে: 'ভুজৈঃ পাশভৌ-ত্যঙ্কুশবরলসিতৈ: শোভিতাঙ্গস্য তস্য/মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজাহভিন্নদেহো হিমা-ভঃ। /ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো ললিতদশভূজো ব্যাঘ্রচর্ম্মা-স্বরাঢ্যঃ/সদাপূর্ব্বেদেবঃ শিব ইতি চ সমাখ্যনসিদ্ধ প্রসিদ্ধঃ॥' এই বীজের দেহ চারটি হাত দ্বারা সুশোভিত। হাতগুলোতে পাশ, অভয়মুদ্রা, অঙ্কুশ ও বরমুদ্রা শোভিত। এই বীজের ক্রোড়দেশে হিমের মতো শুভবর্ণ অর্ধনারীশ্বর সদাশিব সর্বদা বাস করছেন। তাঁর তিনটি চোখ, পাঁচটি মুখ, দশটি মনোরম ভূজ। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরে আছেন। এর পরের বর্ণনা এইরকম: 'সুধা সিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসিত কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা/শরং চাপং পাশং শৃনি মপি দধতী হস্তপদ্মৈ-শ্চতুর্ভি। /সুধাংশোঃ সম্পূর্ণ শসপরিরহিতং মন্ডলং কর্ণিকায়াং/মহামো-ক্ষদ্বারং শ্রিয় মভিমতশীলস্য শুদ্ধোন্দ্রিয়স্য॥' এই পদ্মে শাকিনী শক্তি বাস করেন। তিনি চন্দ্রের মতো শুক্লবর্ণা। তাঁর পরিধানে রয়েছে পীতবস্ত্র। চতুর্ভূজে ধারণ করে আছেন শর, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে

নিষ্কলঙ্ক-পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান। এই পদ্ম যোগচিন্তক শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির মুক্তির দ্বারস্বরূপ। একেবারে শেষে বলা হয়েছে যে, 'ইহ স্থানে চিত্তং নিরবধি বিনিধায়াত্মসম্পূর্ণযোগঃ/কবির্বাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ শান্তচেতাঃ/ত্রিকালানাংদর্শী সকল হিত করো রোগশোকমুক্ত/শ্চিরঞ্জীবী- জীবী নিরবধি বিপদাং ধ্বংসহংস প্রকাশঃ॥' যে ব্যক্তি এই বিশুদ্ধ পদ্মে চিত্ত স্থির করে সতত আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, শান্তচিত্ত সেই সাধক নিরতিশয় কবি, বাগ্মী এবং জ্ঞানী হন। অর্থাৎ কিনা তিনি উপদেশ ছাড়াই সর্ববিষয় বুঝতে সমর্থ হন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ ও সকলের হিতকারী রোগশোকরহিত ও চিরজীবী হন। বিপদ বিনাশনে তিনি সূর্যের মতোই প্রভাবশালী হন।

আনন্দ ভৈরব বামদেবের সমাধিমন্দিরে বিশুদ্ধ চক্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাকে বলেছিলেন, বিশুদ্ধ চক্রে এলে স্থূলতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এখানেই শুরু হয় সাধকের সূক্ষ্মস্তর। তখন কেবল তিন আবরণ থাকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী এই আবরণ?

বললেন— সত্ত্ব, রজ, তম।

— স্থূলতা তাহলে কীভাবে নষ্ট হল? আবরণ তো রইলই।

— তিন গুণই তো মনকে প্রভাবিত করে। পঞ্চ উপাদান দৈহিক গঠন ঠিক করে দেয় আমাদের। ছয় স্বাদ দেহের স্বাভাবিক কাজ ঠিক করে। বিশুদ্ধে শক্তি এলে স্থূল যে আস্বাদন শক্তি তা তো আর থাকে না। সূক্ষ্মতার ভেতর তিনটি আবরণ থাকে। তারপর রজ-তমের নাশ। সত্ত্ব থাকে। সাত্ত্বিকতা আসে সাধকের। কুণ্ডলিনী তখন আজ্ঞায় উঠতে সক্ষম হয়।

শাস্ত্রে আজ্ঞা চক্র সম্পর্কে বা হয়েছে: 'আজ্ঞানামাম্বুজন্ত দ্বিমকর-সদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং/হক্ষাভ্যাং বৈকলাভ্যাং পরিলসিতবপু নেত্রপত্রং সুশুভ্রম্। /তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্রষট্কং দধানা/বিদ্যাং মুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা॥' অর্থাৎ, ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা নামে প্রসিদ্ধ দ্বিদল পদ্ম আছে। এই পদ্ম চন্দ্রের মতো অতীব শ্বেতশুভ্র। ধ্যানে তেজোরূপে শক্তি দ্বারা এর প্রকাশ হয়ে থাকে। এই পদ্ম ধ্যানের স্থানরূপে প্রসিদ্ধ। এই পদ্ম কর্বুর বর্ণ হ-কার ও ক্ষ-কার এই দুই বর্ণ দ্বারা শোভিত। এর কর্ণিকাতে হাকিনী নাম্নী শক্তি বাস করেন। এই শক্তি চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণা। তাঁর দুটি মুখ। তিনি হস্তভঙ্গি দ্বারা বিদ্যা— যা কিনা জ্ঞানমুদ্রা বা পুস্তকমুদ্রার প্রতিরূপ, কপাল— মানুষের ললাট অস্থি, ডমরু ও জপমালা ধারণ করে আছেন। তাঁর চার হাতে চার ধরনের আয়ুধ রয়েছে। সুতরাং তিনি চতুর্ভূজা। মতান্তরে ষড়ভূজা এবং ত্রিনয়নী। এরপর বলা হয়েছে যে,

'এতৎপদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং/যোনৌ তৎকর্ণিকায়া মিতরাশিবপদং লিঙ্গচিহ্ন প্রকাশম্। /বিদ্যুন্মালা-বিলাসং পরম-কুলপদং ব্রহ্মসূত্রপ্রবোধং/বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহৃদয় শ্চিন্তয়ে তশ্চ্যং-ক্রমেণ॥' এই আজ্ঞা চক্রের মধ্যে সূক্ষ্মস্বরূপ প্রসিদ্ধ মন বাস করে। এই কর্ণিকাতে ত্রিকোণ যোনি অবস্থিত। তন্মধ্যে লিঙ্গচিহ্ন যুক্ত ইতর নামক শিবের স্থান। এর অর্থ দাঁড়ায় এইরকম: ত্রিকোণের মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। তিনি বিদ্যুৎশ্রেণির মতো উজ্জ্বলতাপূর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে প্রণবের অবস্থান চিন্তা করেন সাধক। বলা হয় এই প্রণব পরমকুলপদ। অর্থ দাঁড়ায়, পরম বা উৎকৃষ্টকুল— শক্তি, ত্রিকোণ। কুল হল স্থান। যিনি উৎকৃষ্ট শক্তিস্থানে বা ত্রিকোণে বিরাজ করছেন। বলা হচ্ছে: 'ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে শীঘ্রগামী মুনীন্দ্রঃ /সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদশী সকল হিতকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। /অদ্বৈতাচারবাদী বিলসিত পরমাপূর্ব্বসিদ্ধি প্রসিদ্ধো/দীর্ঘায়ু সোহপি কর্ত্তা ত্রিভুবন-ভবনে সংহৃতৌ পালনেচ॥' উক্ত পদ্মের ধ্যানপরায়ণ সাধক শাঘ্র অপরের শরীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। ধ্যানযোগসম্পন্ন যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হন। সকল বস্তুর স্বরূপ অবগত হন। সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সকলের সকল প্রকার হিতসাধনে সমর্থ হন এবং উপদেশ ব্যতিত সর্বশাস্ত্রের অর্থ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই ধরণের সাধক অদ্বৈতচারী ও অদ্বৈতবাদী হয়ে অদ্ভুত তপঃসিদ্ধির দ্বারা খ্যাতি লাভ করে মানব সমাজে শোভিত হন। তাঁরা দীর্ঘায়ুও হয়ে থাকেন। ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্তা বলে গণ্য হন। পরের শ্লোকে আরও বলা হয়েছে: 'তদন্ত চক্রে-হস্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্মা/ প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রবণবিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ। /তদূর্ধ্বে-চন্দ্রার্দ্ধস্তদুপরি বিলসদ্বিন্দুরূপীমকার/স্তদূর্দ্ধে নাদো হসৌ বলধবলসুধা-ধারসন্তানহাসী॥' আজ্ঞা চক্রে উল্লেখিত ত্রিকোণের মধ্যে নিরন্তর জাগ্রত অন্তরাত্মা বাস করেন। যাঁর জ্যোতি প্রদীপের মতোই উজ্জ্বল। তিনিই প্রণবের বিবেচনা রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। অর্থাৎ, আ-কার ও উ-কার এই উভয়ের সন্ধিযোগ সম্পন্ন ও-কার রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। তাঁর উর্ধ্বে অর্ধচন্দ্র সুদৃশ্য বিন্দুরূপী ম-কার বিদ্যামান। সুতরাং মানে দাঁড়াল, এখানেই প্রকৃত প্রণবরূপে অন্তরাত্মা বিরাজ করছেন। এই প্রণবের উপরে বলদেব, চন্দ্র। ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ নাদও এখানে বর্তমান। বলা হয়েছে: 'ইহ স্থানে লীনে সুসুখসদনে চেতাসিপুরং/নিরালম্বং বদ্ধা পরমগুরুসেবাসুবিদিতম্।/তদ-ভ্যাসা দ্যোগী পবনসুহৃদাং পশ্যতিকণান্, /ততস্তন্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিত— রূপানপি সদা॥' সাধক পরমগুরুর সেবার সাহায্যে মনকে বিষয়ান্তর থেকে বের করে যোনিমুদ্রা বা খেচরীমুদ্রা বন্ধন করে নিরতিশয় সুখের স্থান এই আজ্ঞা চক্রে বার বার চিন্তাকে

স্থাপন করার ফলে প্রণবাধার ত্রিকোণের চতুর্দিকে লীন হলে সর্বদাই ত্রিকোণের মধ্যে শূন্যস্থানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। 'জ্বলদ্দীপাকারং তদনু চ নবীনা-র্কবহুল— /প্রকাশং জ্যোতি বর্বা গগন ধরণী—মধ্য মিলিতম্। /ইহস্থানে সাক্ষা দ্ভবতি ভগবান পূর্ণবিভবো/ হব্যয়ঃ সাক্ষী বহ্নিশশিমিহিরয়ো র্ম্ডল-লইব॥' সাধক বহ্নিশিখা দেখার পর মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত জ্যোতি দর্শন করেন। এই জ্যোতির আকার প্রজ্জ্বলিত দীপের মতোই। তার প্রকাশ নবোদিত বহু সূর্য সদৃশ। এই আজ্ঞা চক্রে সম্পূর্ণ বিভবশালী অর্থাৎ কিনা সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি কার্যে সমর্থ অবিনাশী সর্বসাক্ষী ভগবান শিব বিরাজমান আছেন। বহ্নিমণ্ডলে, সূর্যমণ্ডলে ও চন্দ্রমণ্ডলে যেমন ভগবানের অবস্থিতি আছে, তেমনই এই স্থানেও আছে। সহস্রদল পদ্মচক্রের মধ্যে যেমন বহ্নিচন্দ্র সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে ভগবান চণক আকারে অবস্থিত আছেন, এখানেও তেমনই চণকাকার বিন্দুরূপে বিরাজ করছেন। চণকের অর্থ হল চানা বা ছোলা। বিজ্ঞান সম্মতিতে একে আনলে প্রোটন ও নিউট্রন ভাবা মোটেও অস্বাভাবিক নয় কিন্তু। আজ্ঞা পদ্মের মাহাত্ম্য এত বেশি যে শাস্ত্রকার এখানেই বর্ণনাকে শেষ করে দেননি। বলেছেন: 'ইহস্থানে বিষ্ণো রতুল-পরমামোদ-মধুরে/সমারোপ্য প্রাণং প্রমুদিত মনাঃ প্রাণানিধনে। /পুরং নিত্যং দেবং পুরুষ মজ মাদ্যং ত্রিজগতম্/ পুরানাং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতি চ বেদান্ত-বিদিতম্॥' যোগীশ্রেষ্ঠ মানব প্রাণ-বিয়োগ কালে হৃষ্ট চিত্তে এই আজ্ঞাচক্রাভ্যন্তরে অতুলামোদ পরিপূর্ণ বিষ্ণুর বা পরমেশ্বরের স্থানে বা প্রদর্শিত বিন্দুস্বরূপে প্রাণকে সমারোপিত করে প্রাণ-বিয়োগের পর বেদান্ত-প্রসিদ্ধ ত্রিজগতের আদিভূত জন্মরহিত অবিনশ্বর দ্যোতনশীল সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষে প্রবিষ্ট হন। বলা ভাল, পরমাত্মাতে লীন হয়ে যান তিনি। একেবারে শেষে এই চক্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 'লয়স্থানং বায়ো স্তদুপরি চ মহানাদরূপং সির্বাদ্ধং/সিরাকারং শান্তং বরদ মভয়ং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রকাশম্। /যদা যোগী পশ্যেদ্গুরুচরণযুগাম্ভোজসেবা-সুশীল/স্তদা বাঁচং সিদ্ধিঃ করকমলতলে তস্য ভূয়াৎ সদৈব্॥' আজ্ঞা চক্রের উর্ধ্বস্থানে মহানাদরূপ বায়ুর লয়স্থানের কথা চিন্তা করার জন্য সাধককে বলা হচ্ছে। এই আধার বা নাদ অর্ধনারীশ্বর মূর্তির শক্তির মতোই বলা হচ্ছে, যা সিরাকার বা লাঙ্গলের আকার। এই স্থান বিশুদ্ধবুদ্ধির প্রকাশক। সাধক, যোগী গুরুর পাদপদ্মযুগল সেবা করে যখন মহানাদের স্বরূপকে তিনি দর্শন করেন তখন তাঁর করতলে নিরন্তর বাক্য সিদ্ধি অবস্থিত হয়। বলা যায়, যোগীসাধক তখন অনায়াসে অভিলাষিত বাক্য প্রয়োগ করতে সমর্থ হন।

শীতের রাতে একবার তারাপীঠের শিবাভোগতলা পেরিয়ে কালা বাবার কুটিরে গিয়েছিলাম। তখন সবে অমাবস্যা গেছে। মহাশ্মশানে চারধারে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ভাবছি, একেই জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার' বলব কি? মাটির রাস্তা ধরে মোবাইল জ্বেলে জ্বেলে আমরা তিন বন্ধু হাঁটছিলাম। কোনও কোনও কুটিরের দাওয়ায় তান্ত্রিকরা মোমবাতি জ্বেলে বসে আছেন। কাউকে কাউকে ঘিরে রয়েছে দু-চারজন দর্শনার্থী। রহস্যময় পরিবেশ। তারই ভেতর দিয়ে শ্মশানের একেবারে শেষ প্রান্তে কালা বাবার কুটিরে পৌঁছলাম।

দেখা মাত্রই বললেন, ভাবলাম রাত হয়েছে আজ আর আসবেন না। তাছাড়া যা শীত পড়েছে। আপনারা সব শহুরে মানুষজন। বোধহয় কষ্ট হচ্ছে মানিয়ে নিতে শীত। কী বলেন?

বললাম— আমরা বেশ উপভোগই করছি বলতে পারেন।

আমার এক বন্ধু বলল, শীতের আমেজে মদটা ভাল জমে। হুযুগে কিনে ভাবলাম যাই বাবাকে দিয়েই প্রসাদ করিয়ে আনি। তাছাড়া আমার বন্ধুর তো নানা জিজ্ঞাসা। রাতের গতিতে এগোবে ভাল। এখন বেশ নিরিবিলি। আপনার অনুচরেরা কেউ নেই। শাস্ত্রজ্ঞ আলোচনা এসময়ই তো ভাল জমে।

বাবা বললেন, তা বেশ, তা বেশ।

ভেবেছিলাম, শীতের রাতে মদ পেয়ে বেশ খুশিই হবেন বাবা। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে কোনও ভাবগতি দেখতে পেলাম না। বরং আমাদের অবাক করেই বললেন, তা বেশ। এনেছেন যখন এতদূর বয়ে তবে তো প্রসাদ করে দিতেই হবে। কিন্তু আমার মদে আর আসক্তি নেই।

কথা শুনে আমার দুই বন্ধুর চোখ কপালে উঠল। কিন্তু কালা বাবার এই কথাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার মতো কিছুই ইন্দ্রিয়গঠিত ব্যাপার হয়নি। এটা যথেষ্টই স্বাভাবিক ব্যাপার। যাঁরা তন্ত্র মানে ভাবেন মদ আর তান্ত্রিক পাঁড় মাতাল নতুবা গাঁজাখোর তাঁরা আদ্যন্ত ভুল ভাবেন। আসলে তান্ত্রিক বলতে যাঁদের সামনে পড়েন তাঁরা যে বেশিরভাগই স্থূল নেশাচ্ছন্নতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি এটা ঠিক। কিন্তু এ তো তাঁদের চেনার ভুল। প্রথম-প্রথম এরকম ভুল আমার অনেক হয়েছিল। কত বাটপাঁড় মাতালের সামনে যে পড়েছি ইয়ত্তা নেই। ভণ্ড ভেল্কিবাজী তান্ত্রিককে পয়সা দিয়েও কথা বলিয়েছি তাঁদের ভণ্ডতা, অনাচারকে জানতে বুঝতে। ভৈরবী সাধনার ব্যভিচার, যৌনাচারের নিদর্শনও কম চোখে পড়েনি। তবে সেগুলো সবই হল এ পথের আগাছাস্বরূপ। তার মাঝেই মহীরুহ না হলেও গুল্মশ্রেণির গাছ যে এখনও খুঁজলে পাওয়া যায় তার নিদর্শন এই কালা বাবা। সকালের একপ্রস্থ আলোচনায় এটা আমি বুঝে ফেলেছি। তাছাড়া আমাকে পাঠিয়েছেন যিনি এই তারাপীঠেরই একজন প্রসিদ্ধ সেবাইত বংশের মানুষ।

বহুদিন ধরে তান্ত্রিকদের অনাচার, যৌনাচার, ব্যভিচারের তিনি যেমন সাক্ষী তেমনই গুটিকতক তন্ত্রাভিলাষী মানুষদের আনাগোনাও তাঁর কখনও চোখ এড়িয়ে যায়নি। সেই রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথামতোই আমার কালা বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

বললেন— তান্ত্রিকের কাজ কী শুধু শুধু মদ্যপান? তন্ত্রে মদ লাগে ত্রিগুণভেদে উপাসনার জন্য। তম, রজের ওপরে উঠে গেলে শরীরই তার মদ হয়ে যায়।

বললাম— তাহলে কি আপনার এখন সেই দশা চলছে?

— কী দশা কী তার গুণাগুণ এখন আমি ঠিক পাই না। তবে সব সময় ঘোর। আচ্ছন্নতা। মদ খেলেও যা, না খেলেও তা। তা মন বলল না খেয়েই যখন এমন দশা তখন আর খেয়ে কী লাভ। তাই এখন খাওয়া মানে ওই প্রসাদ করা।

— বুঝলাম। এতে আপনার আসক্তি ঘুচেছে।

— আসক্তি ঘুচ্ছে কোথায়! তারা কি জানিস?

— কী? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— তারা হলেন দ্রব্যময়ী। তরল করুণা তারা। তারাই কুণ্ডলিনী। শাস্ত্রে বর্ণিত মদ তো মস্তিষ্কের সেই বিশেষ স্থান থেকে ঝরে। কখন ঝরে জানিস?

— কখন?

— যখন শরীরের অন্ধকার কেটে যায়। সত্ত্বগুণ আসে শরীরে। তখন তো শরীরের ভেতরেই মদ। বাইরের মদের দরকার কী? তখন স্থূল মদে, বোতলে, নেশায় অনীহা, অরুচি। সকালে তুই চক্রের কথা বলছিলি না। আসলে চক্র হল মাধ্যম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীসের?

— কীসের আবার! শরীরের। স্থূল শরীরকে চক্রই চেনায় আবার সূক্ষ্ম শরীরকে চক্রই বোঝাই। ষট্‌চক্রের শেষ হল আজ্ঞা চক্রে, জানিস কেন এই নাম?

— কেন?

— আজ্ঞা কথার অর্থ কী?

বললাম— আদেশ, অনুজ্ঞা, হুকুম। এইসব।

বললেন— আজ্ঞা হল মতি। পরমাত্মার বিরাজ আজ্ঞাতে এলেই বোঝা যায়। আজ্ঞাকে জ্ঞানপদ্ম বলে। এই জ্ঞান জ্যোতির্জ্ঞান। চক্রর কাজ কী জানিস?

— কী?

— চক্র জ্বালায় বাতি। প্রত্যেক চক্রের প্রদীপ্তশিখা আছে। তার রূপ আছে। অন্তর্হিত অর্থ আছে। সেই অর্থের জন্যই চক্রক্রিয়া। চক্র শক্তি তোলে। সাধকের মধ্যে যে মহাশক্তির আধার ও তো আসলে আলোর মন্দির। মন্দির কী জানিস?

— দেবতাকে যেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

—তা ঠিক। কিন্তু দেবতা তো আমি নিজে। দেবতা তো অধিপতি। আমার শরীরের অধিপতি। সেই দেবতাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চক্র। চক্র বাতি জ্বালায়। তখনই সাধকের অন্ধকার সব দূর হয়। আজ্ঞা সেই আলোকে অভেদ জ্ঞান করতে সাহায্য করে। আজ্ঞা ভেদ হলেই সহস্রারে যাওয়া যায়। সহস্রার কোন্য চক্র নয়।

সহস্রারকে অনেকেই কিন্তু চক্র মানতে চান না। সহস্রারকে বলেন দিব্যজ্যোতির স্তর বা মণ্ডল। আজ্ঞা ভেদ হলেই যেহেতু সহস্রারে যাওয়া যায়, আজ্ঞাকে তাই বলা যেতেই পারে Passport to the world Divine. অনেকে আবার আজ্ঞার পর সহস্রারকে চক্র হিসেবেই মেনে সাতটি চক্রের কথা বলে থাকেন। সহস্রারেরও নানা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অছে। অঘোরী সাধক আবার নয়টি চক্রের কথা বলেন। সেখানে আজ্ঞার পর যোগ হয় ললনা চক্র। সেটাকে তাঁরা সপ্তম পদ্ম মানেন। বলেন তালুমূলে রক্তবর্ণ চৌষট্টিদলবিশিষ্ট ললনা চক্র। অহংতত্ত্বের স্থান হিসেবে একে চিহ্নিত করেন। অষ্টম চক্র বলেন গুরু চক্র। ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্বেতবর্ণ শতদল বিশিষ্ট গুরু চক্রের কথা বলা হয়। এই পদ্মের কর্ণিকায় ত্রিকোণমণ্ডলে হ, ল, ক্ষ এই তিনটি বর্ণের কথাও তাঁরা বলে থাকেন। এখানে যোনিপীঠ ও শক্তিমণ্ডল থাকার কথাও বলা হয়। সাধক বলেন তেজোময় কামকলামূর্তি দেখে থাকেন তিনি ওই শক্তিমণ্ডলে। বলেন চক্রে গুরুবীজ (হং) থাকার কথাও। তার পাশেই গুরুদেবের অস্তিত্ব চিহ্নিত করে বসেন সাধক। যাঁর দুই হাত— এক হাতে বর ও অন্য হাতে অভয় মুদ্রা শোভা পাচ্ছে। গুরুদেবের বাম ক্রোড়ে আবার গুরুপত্নী বিরাজিতা। তিনিও বামক্রোড়ে একটি পদ্ম ও দক্ষিণ ক্রোড়ে শ্রীগুরুকলেবর বেষ্টন করে উপবিষ্টা আছেন। বলা হয় এই পদ্মচক্রে সাধক ধ্যানে বসলে তাঁর সর্বসিদ্ধি লাভ ও দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এরপর নবম চক্র হিসেবে সেখানে আসছে সহস্রার চক্র। তবে বেশির ভাগ সাধকই আজ্ঞার পর সহস্রারের কথা বলেছেন। ললনা, গুরুর কথা নির্দিষ্ট করেননি। যাঁরা বলছেন ষট্চক্রের কথা তাঁরাও সহস্রার মানছেন শক্তির শেষ স্বতঃস্ফূর্ত দশা হিসেবে; একে পদ্মচক্র না বলেও সচ্চিদানন্দের অংশ হিসেবে। আর যাঁরা সহস্রার পদ্মচক্র হিসেবে দেখছেন তাঁরাও একই অনুভূতি পোষণ করছেন। এখানে কোনওরকম মতপার্থক্য কিছু নেই। অঘোরী মতেও এখানে কিন্তু মতান্তর নেই কিছু। মতান্তর শুধু এটিকে শরীরের নবম চক্র বলে উল্লেখের। অঘোরীরা বলেন নটি চক্রের রহস্য ভেদ করতে হলে 'নর' আর 'খর'-র পার্থক্যকে বুঝতে হবে। 'নর' হল মানুষ আর 'খর' গর্দভ। 'খর'-রা পার্থিব ভোগবাসনাতে আবদ্ধ থাকে। শরীরের নিম্ন তিনটি চক্রের সাহায্যে চলে। আর 'নর'-রা ঊর্ধ্ব তিনটি চক্রে প্রভাবে চলে। এরা 'মান' সম্পর্কে 'হুশ' তাই মানুষ। এই নরই নারায়ণে রূপান্তরিত হতে পারে। কথাটা গূঢ়ার্থ দ্যোতক। অনেক সাধকেরই

আসলে শরীরের প্রথম তিন চক্র মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুরে কুণ্ডলিনী উঠে আসে। তারপর আর হয় না। তাঁরা পতিত সাধক। অর্দ্ধ সাধকও এঁদের বলা যেতে পারে। শক্তি যেহেতু কিছুটা আয়ত্তে এসেছে আর ইচ্ছেশক্তিও জাগরিত হয়েছে তার বল-এ তখন তাঁরা কিছু ভেল্কিবাজী দেখাতে গিয়ে সাধরণ্যে জীবিকাধারী গুরুর পর্যায়ে চলে যান। ফলে সেটা হয় শক্তি আর প্রচেষ্টার অভাবে মণিপুরের পর অনাহত পার করে না। তবে প্রকৃত সাধকের যট্‌চক্রে পেরোনো নিয়ে কোনও কথা থাকতে পারে না। তাই তাঁরা অঘোরী মতে অবশ্যই নরশ্রেণির। বাউল আবার মূলাধারের পরই বলেন মণিপুরের কথা। স্বাধিষ্ঠানকে তাঁরা বাদ দেন। সবাই নয়। সাধকভেদে এই মতপার্থক্য আছে সেখানেও। পার্থক্যগুণেই বাউল তাই গান বাঁধেন: 'চতুর্দল মূলাধারে/মণিপুর তার উপরে, /অনাহত বিশুদ্ধ পারে; /লক্ষ যোজন যাও না কেঁদে।'

বলা হয়, আজ্ঞা চক্রে ভেদ হলেই দৈবী অঞ্চলে প্রবেশ করে যান সাধক। এই অঞ্চলেই সহস্রার মণ্ডল বলে । পদ্মচক্র হিসেবে দেখলে সহস্রার পদ্মচক্র। শাস্ত্রে এই সহস্রার পদ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশং/বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণচন্দ্রাতিশুভ্রমা। /অধ্যেবক্তং কান্তং তরুণ রবিকলাকান্তিকিঞ্জল্ক শুভ্রং/ললাটাদ্যের্বর্ণৈঃ প্রবিলসিতবপুঃ কেবলানানুরূপম্॥' সমস্ত পদ্মের উপরি-ভাগে শঙ্খিনী নাড়ির মস্তকে অর্থাৎ শঙ্খিনীর সমাপ্তি স্থানে শূন্য স্থানে শূন্য প্রদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রের উর্ধ্বভাগে অবস্থিত বিসর্গের অধোদেশে প্রকাশমান নির্মল সহস্রদল অবস্থিত। এই পদ্ম পূর্ণচন্দ্রের মতো অতীব শুভ্রবর্ণ। তার অধোমুখও মনোরম। কেশরগুলো সব বালসূর্যের কিরণের ন্যায়। শরীর অ-কারাদি পঞ্চাশদ্ বর্ণের দ্বারা পরিশোভিত। এই পদ্ম নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ।'সমাস্তে তস্যান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসম্পূর্ণচন্দ্রঃ/স্ফুর-জ্জ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী। / ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি চ সততং বিদ্যুদাকাররূপং/তদন্ত শূন্যং তৎসকল সুরগণৈঃ সেবিং চাতি-গুপ্তম্॥' এই সহস্রদল পদ্মের মধ্যে কলঙ্করহিত শুদ্ধ সম্পূর্ণ চন্দ্র আছে। এরই জ্যোৎস্নাজাল স্ফুরিত হচ্ছে। এখানে উৎকৃষ্ট অমৃত সমুহের সুশীতল হাসি সর্বদা স্ফুরিত হচ্ছে। এই কোণের মধ্যে সেই প্রসিদ্ধ শূন্য বিদ্যমান। সকল দেবতা অতি গুপ্তভাবে এই পদ্মের সেবা করেন। 'সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতিরাং/যতেঃ স্বাত্মাজ্ঞানং দিশতি ভগবান নির্ম্মলমতেঃ। /সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকল-সুখ-সন্তান-লহরী/পরিবাহ্যে হংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিতঃ॥ ' যিনি নিরন্তর যোগীগণের প্রতি অমৃতকিরণ অতি মাত্রায় বর্ষণ করতে করতে— স্বাত্মজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানকারক তারকব্রহ্ম মন্ত্র উপদেশ করছেন, অথবা আত্মজ্ঞান উপদেশ করছেন, সকলের অধীশ্বর এবং সর্বকার সুখের বিস্তার রূপ

লহরীর নির্ঝরস্বরূপ, সেই পরমহংস নামে পরিচিত ভগবান পরম শিব সহস্রদল পদ্ম মধ্যে বসবাস করেন। 'শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণগণা/লপন্তীতিপ্রায়ো হরিহর পদং কেচি দপরে।/পরং দেব্যা দেবীচরণযুগলাম্ভোজরসিকা/মুনীন্দ্রা অপ্যণ্যে প্রকৃতিপুরুষ স্থান মমলম্॥' এই সহস্রদল পদ্মকে শিবের উপাসকগণ শিবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলে নির্দেশ করেন। বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে বিষ্ণুর স্থান নামে অভিহিত করেন। অপর এক শ্রেণির উপাসক বা হরিহরের যুগল মূর্তি উপাসকগণ একে হরিহরের স্থান বলে থাকেন। দেবীর চরণযুগল-পদ্মের রস আস্বাদনকারীগণ অর্থাৎ শাক্তরা একে দেবীর পরম স্থান বলে মনে করেন এবং অন্যান্য মুনীন্দ্রগণ বা প্রকৃতি পুরুষাত্মক হংসমন্ত্র উপাসকগণ একে প্রকৃতি-পুরুষের অবস্থানযোগ্য স্থান ভাবেন। 'ইদং স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়ত নিজচিত্তো নরবরো/ন ভূযাৎ সংসারে পুনরপি ন বদ্ধ স্ত্রিভুবনে।/ সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনস স্তস্য কৃতিনঃ/সদা কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরূপি বাণী সুবিমলা॥' যিনি এই সহস্র-দল পদ্ম সম্পূর্ণভাবে অবগত হয়ে, এতে নিজের চিত্তকে সংযত করেন সেই নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভূবনাত্মক সংসারে আবদ্ধ হন না। মানে হল, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। পুণ্য ভোগের জন্য স্বর্গলোক আর পাপ ভোগের জন্য পাতাললোক এবং পাপ-পুণ্য উভয় ভোগের জন্য মর্ত্যলোকে প্রাণীদের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়ে থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের বন্ধহেতুভূত পাপ- পুণ্যের আর উৎপত্তি হয় না। সুতরাং পুনর্জন্মও হয় না। ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত এ ধরনের সুকৃতিসম্পন্ন সাধকের সমগ্র অভীষ্ট বিষয় সম্পাদন করার, অপরের অনিষ্ট করার, শত্রুকে বিনষ্ট করার ও আকাশে গমন করার সম্পূর্ণ শক্তি জন্মে। এ ধরনের সাধকের মুখমণ্ডলে নির্মল জ্যোতির আর্বিভাব ঘটে। 'অত্রান্তে শিশুসূর্য-সোদরকলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী/শুদ্ধা নীরজ-সূক্ষ্মতন্তু শতধা-ভগৈক-রূপা-পরা। /বিদ্যুৎকোটি সমান-কোমল তনু র্বিদ্যোতি-তাধোমুখী/ পূর্ণানন্দ-পরম্পরাতি-বিগলৎ পীযুষধারাধরা॥' এই পদ্মে চক্রের অমা নাম্নী সেই প্রসিদ্ধা ষোড়শী কলা আছেন। এই কলা নবোদিত সূর্যের সমান কান্তিযুক্তা অর্থাৎ রক্তবর্ণা। তাঁর শুদ্ধা বা বিকারশূন্য পদ্মমৃণালের সূক্ষ্ম সূত্রের শতভাগের একভাগ পরিমিতা এবং পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। তাঁর শরীর বিদ্যুৎকোটির মতো কোমল। তিনি প্রকাশমানা ও অধোমুখী। তিনি পূর্ণানন্দের শ্রেণিরূপে অতিমাত্রায় বিগলিত পীযুষধারা ধারণ করছেন। 'নির্ব্বানাখ্যাকলা পরা পরতরা সাস্তে তদন্তর্গতা/কেশাগ্রস্য সহস্রধা-বিভাজিতস্যৈকাংশরূপা সতী।/ ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্য প্রবোধদয়া/চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গসমান-ভঙ্গুরবতী সর্ব্বার্কতুল্য প্রভা॥' পরা কলা থেকেও শ্রেষ্ঠা নির্বাণ নাম্নী কলা অমা করার ক্রোড়ে অবস্থিত আছে। এই কলা সহস্র ভাগে

বিভক্ত কেশাগ্রের এক ভাগ সদৃশ। তিনি প্রাণীদের অধিদৈবত বা ইষ্ট চৈতন্য স্বরূপ। মতান্তরে, হৃদয়স্থ চৈতন্য স্বরূপ। তিনি ভগবতী, নিত্য প্রবোধদয়া অর্থাৎ কিনা তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনয়িত্রী। তাঁর আকৃতি অর্ধচন্দ্রের মতো বক্র। এবং তিনি এককালে উদিত দ্বাদশ সূর্য প্রকাশের মতো প্রকাশযুক্ত। 'এতস্যা মদ্যদেশে বিলসিত পরমাপূর্ব্ব-নির্ব্বাণ-শক্তিঃ/ক্যোটাদিত্যপ্রকাশা ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈকরূপা। /কেশাগ্রস্যাতি সূক্ষ্মা নিরবধি বিগলয-প্রেমধারাধরা সা/সর্ব্বেষাং জীবনভূতা মুনিমনসি মুদ্রা তত্ত্ববোদংবহন্তী॥' এই নির্বাণকলার মধ্যদেশে অপূর্বা অনির্বচনীয়া পরমা নির্বাণশক্তি শোভা পাচ্ছেন। তিনি কোটি সূর্যের সমান প্রকাশযুক্ত ও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের উৎপত্তি স্থান স্বরূপ। তিনি কেশাগ্রের কোটি ভাগের এক ভাগ তুল্য সূক্ষ্ম স্বরূপ। তিনি নিরন্তর বিগলিত প্রেমধারা ধারণ করছেন। তিনি সকল প্রাণীর জীব স্বরূপ এবং তিনি যতিদিগের হৃদয়ে হর্ষ সহকারে তত্ত্বজ্ঞান বহন করছেন। সহস্রার পদ্ম সম্পর্কে এরপর বলা হচ্ছে: 'তস্যা মধ্যান্তরালে শিবপদ মমলং শাশ্বতং যোগিগম্যাং/নিত্যানন্দাভিধানং সকল সুখময়ং শুদ্ধ-বোধ-স্বরূপম্। /কেচি-দ্বরহ্মাভিধানং পদমিতি সুধিয়ো বৈষ্ণবং তল্লপন্তি/কোচিদ্ধংসাখ্য মেতৎ কিমপি সুকৃতিনো মোক্ষমাত্মপ্রবোধম্॥' সেই নির্বাণশক্তির মধ্যস্থিত শূন্যস্থানে অমল, নিত্য, যোগীদের জ্ঞানগম্য শিবস্থান আছে। এই স্থান নিত্যানন্দ নামে অভিহিত। তিনি সম্পূর্ণ সুখস্বরূপ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। কেউ কেউ একে ব্রহ্ম নামে নির্দেশ করেন। কেউ বলে থাকেন বৈষ্ণবস্থান। কেউ বা এর নাম করেছেন হংস। কেউ বা আত্মজ্ঞান সম্পাদক অনির্বচনীয় মোক্ষস্থান। এরপর বলা হচ্ছে: 'হুঙ্কারেনৈব দেবীং যমনিয়মসমভ্যাসশীলঃ সুশীলো/জ্ঞাত্বা শ্রীনাথ বক্রাৎক্রমমিতি চ মহামোক্ষ-বর্ত্ম প্রকাশম্। /ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তি সতাং শুদ্ধবুদ্ধিস্বভাবো/ভিত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবন দহনয়োরাক্রমেণৈব গুপ্তম্॥' যম, নিয়মাভাস স্বভাব বা যমাদি যোগাঙ্গের মাধ্যমে সুশীল ব্রহ্মপরায়ণ যোগী সাধক গুরুর মুখ থেকে মহামোক্ষ পথের প্রকাশক এই প্রক্রিয়াক্রমে অবগত হয়ে বায়ু এবং অগ্নির আক্রমণের দ্বারা এবং হুং এই বীজ উচ্চারণ করে কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে উত্থাপিত বা জাগরিত করে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের ছিদ্র প্রস্ফুটিত করবেন। এরপর কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে গুপ্তভাবে চিত্রাণী নাড়ির মুখমধ্যে স্থাপন করবেন। বলা হচ্ছে: 'ভিত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎপরমরস শিবেসূক্ষ্মাধাম্নি প্রদীপে/সা দেবী শুদ্ধ সত্তা তড়িদিববিলসত্তসন্তুরূপস্বরূপা। /ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলস-রসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে/তন্মোক্ষাখ্যানন্দরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতালক্ষণেন্॥' বিদ্যুতের মতো ঔজ্জ্বল্যশালিনী শোভামান সূত্রস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী সেই কুলকুণ্ডলিনী দেবী স্বয়ম্ভু, বাণ ও ইতর এই লিঙ্গত্রয় ভেদ করে

এই তিন ধারা সংরুদ্ধ পথ পরিষ্কার করে ব্রহ্মনাড়ি সম্বন্ধ অর্থাৎ চিত্রাণী নাড়ি গ্রথিত সমস্ত পথ প্রাপ্ত হয়ে সূক্ষ্মরূপে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে প্রদীপ্তদীপ্তি সম্বলিত সূক্ষ্মতম পরম রসশিব সমীপে অত্যন্ত দীপ্তি প্রাপ্ত হন। এবং সত্বর সাধকের নিত্যানন্দ স্বরূপ মোক্ষকে সম্পাদন করেন। 'নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং লয়বশাজ্জীবেন সার্দ্ধং সুধী/মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি। /ধ্যায়ে দিষ্টফলপ্রদং ভগবতীং চৈতন্য রূপং পরাং/যোগীন্দ্রোগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ সতঃ' সমাধিতে সংযতচিত্ত যোগীশ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মযুগল পরায়ণ জ্ঞানবান সাধক নাড়ি উত্তাপনের রীতি অনুসারে ব্রহ্মদ্বার প্রাপ্ত ভগবতী কুলকুণ্ডলিনীকে জীবের সঙ্গে লয়ক্রম অনুসারে অর্থাৎ যে স্থানে যে তত্ত্বের লয় চিন্তাবিহিত হয়েছে সেই রীতিতে মুক্তির স্থানে, শুদ্ধ পদ্মরূপ স্থানে বা সহস্রদল পদ্ম মধ্যে পরম বিন্দুরূপে অবস্থিত শিবস্বরূপ স্বামীর সমীপে উপস্থিত হয়ে ইষ্টফলপ্রদা অর্থাৎ কিনা ইষ্টদেবতা স্বরূপ সেই দেবীকে পরবিন্দু রূপ শিবের সঙ্গে অভিন্নরূপে চিন্তা করে নিয়ে পরবিন্দুকেও এর মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে বিরাজ-মান চিদাত্মাতে বিলীন করে শুদ্ধ চৈতন্যরূপ ধ্যান করবেন। 'লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পুনঃ কুণ্ডলী/নিত্যানন্দমহোদয়াৎ কুলপথান্মূলে বিশেৎ সুন্দরী। /তদ্দিব্যামৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়েদ্দৈবতং/ যোগীযোগ-পরম্পরাবিদিতয়া ব্রমাণ্ডভাণ্ডভ্যস্থিতম্॥' কুণ্ডলিনী সুন্দর পরমশিব থেকে নিঃসৃত লাক্ষারস সদৃশ পরমামৃত পান করে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি স্বরূপ স্থান থেকে বা সহস্রার পদ্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে চিত্রাণী নাড়ির মধ্যস্থিত ছিদ্রপথরূপ শক্তির যাতায়াতের পথে পুনরায় মূলাধার পদ্মে প্রবেশ করে। সাধক এখানে ইষ্টদেবতাকে করতে পারেন বলা হয়। ষট্চক্রস্থিত ডাকিনী লাকিনী ইত্যাদি দেবীশক্তিকেও তিনি সন্তুষ্ট করতে পারেন বলা হয়। এরপর বলা হচ্ছে: 'জ্ঞাত্বৈতৎক্রম মুত্তমং যতমনা যোগী যমাদ্যৈর্যতঃ/শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপদ্ম-যুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ। /সংসারে নহি জন্যতে নহি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে/নিত্যানন্দ পরম্পরা-প্রমুদিত শান্তঃ সতামগ্রণীঃ॥' যে যোগীসাধক যমাদি যেগাঙ্গযুক্ত হয়ে নিত্যানন্দ প্রদায়ক পাদপদ্মযুগল থেকে এই ক্রম অবগত হয়ে সংযত চিত্ত হন, সেই সমগুণযুক্ত মানব সজ্জনের অগ্রগণ্য হন। সংসারে তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। এবং প্রলয় সময়েও তাঁর ক্ষয় হয় না। সবশেষে বলা হয়েছে যে, 'যোহধীতে নিশি সন্ধ্যয়ো রথ দিবাযোগী স্বভাব স্থিতঃ/ মোক্ষজ্ঞান নিদানমেত দখলং শুদ্ধঞ্চ গুপ্তং পরম্। /শ্রীমৎশ্রীগুরু পাদপদ্মযুগলালয়ী যতান্তর্মনা/স্তস্যাবশ্যমভীষ্টদৈবত পদে চেতো নরী নত্যতে।' শ্রীগুরুর পাদপদ্মে যুগলপরায়ণ সংযত চিত্ত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ যে-যোগী সাধক সন্ধ্যাদ্বয়, রাত্রিতে ও দিবসে পরম গোপনীয় বিশুদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের

কারণ স্বরূপ এই নির্মল শ্লোকসমূহ পাঠ করেন, তাঁর চিত্ত অবশ্যই অভীষ্ট দেবতার পাদপদ্মে অতিশয় নৃত্য করে থাকে।

দেহের মধ্যে মেরুদণ্ডের বিভিন্ন গাঁটে বা সাধক কথিত চক্রে শক্তি গিয়ে পৌঁছলে কী ধরনের রং দেখা যায়, তা কিন্তু বোঝা যায় এই গাঁটগুলো বা চক্রগুলোর শক্তি তৈরির ক্ষমতা দেখে। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ এই শক্তিগুলোকেই বোঝাবার জন্য বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন সংখ্যা দল দিয়ে এবং তাকে সংস্কৃত একান্নটি বর্ণের সমাবেশ ঘটিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি চক্রের শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেবী-শক্তির কল্পনা করা হয়েছে। দেবী কল্পনা করা হয়েছে এই কারণে যে, শক্তি ভারতবর্ষে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে কল্পিত। চক্রগুলোকে পদ্মের দল দিয়ে পদ্ম হিসেবে যে কল্পনার কারণ, তাও আর কিছুই নয় মানুষের ইন্দ্রিয়বত্তা-গুলোকে বাইরের প্রভাব থেকে গুটিয়ে নেবার জন্যই। পদ্ম এখানে কিন্তু তারই প্রতীককল্প।

আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে বসে গিরি মহারাজ সেদিন আমায় চক্রগুলোকে কেন পদ্ম বলা হয় তার আধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সারছিলেন। তার পাশাপাশি এটিও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, চক্রগুলোর নানা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য। কৌশিকী অমাবস্যার বিকেল গড়িয়ে গেছে সেই কখন। আনন্দময়ী আশ্রমে সন্ধ্যারতিও সারা হয়ে গেছে। বাইরের জনসমুদ্রের আওয়াজ এসে পৌঁছছে মন্দিরের মধ্যেও। দু'একজন অতি চেনাজানা ভক্ত নিয়ে বসে আছেন গিরি মহারাজ। আমি আর সাধনা ভৈরবী বসে বাবার পাশে।

বাবা বললেন, পদ্ম পাঁকে জন্মায় কিন্তু পাঁক দ্বারা পঙ্কিল হয় না। পাঁকের উপর কেমন দাঁড়িয়ে সৌন্দর্যের শোভা বিতরণ করে পদ্ম। কিন্তু তার পাপড়িতে কোথাও কোনও কাদার ছিটে নেই। কাদা কী জানেন আপনি?

বললাম— কী?

— কাদা হল আমাদের মায়ার প্রতীক। মায়া কাদা ভেদ করে পদ্ম যেমন উপরে ওঠে তেমনি আমাদের মায়া কাটিয়ে উর্ধ্বে উঠে যেতে হবে।

— কীভাবে? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— সূর্যের আলো পেলেই পদ্ম পাঁপড়ি খোলে। শরীরের চক্র-গুলোতেও যখন কুণ্ডলিনীশক্তি উপস্থিত হয় তখন সেগুলোও পদ্মের দলের মতোই খুলে যায়। সূর্যের বিকিরণ করা তেজেও পদ্মের দল মুড়ে যায় না। কিন্তু তার উপর জল ছিটিয়ে দিলেই পর দলগুলো সব বুজে সারা। শরীরের চক্রগুলোকে পদ্মসম মনে করার কারণ হল এই বোঝানো যে, মানুষকেও জলের উপরে থাকা পদ্মের মতো

হতে হবে। পদ্মের দল যেমন জল পড়লে গুটিয়ে যায় তেমনই বাইরের প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষকেও সেই পদ্মদলের মতোই তার ইন্দ্রিয় বন্ধ রাখতে হবে। তবেই সে সাধনার পথে যেতে সক্ষম হবে।

— বাইরের প্রভাব বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?

ভৈরবী বললেন, বিষয় বাসনার প্রভাব। বিষয়কে বিষ ভেবে তা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে হবে। নানা বিষ চারদিকে। সমাজে। কামের বিষ, লোভের বিষ, মিথ্যার বিষ, ছলনা-কপটতার বিষ। এইসব বিষের পাঁক থেকে সরে এসে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠতে হবে আমাদের। এ বড় কঠিন কাজ। শরীর শরীর। শরীরের বন্ধন নাশ সোজা ব্যাপার নয়।

বাবা বললেন, শরীর ক'রকমের জানেন আপনি?

বললাম— আপনিই বলুন। আপনার কথা শুনব বলেই তো এতদূর এসেছি।

বললেন— শরীর তিন রকমের হয় আমাদের। জানবেন।

— কী কী?

— কারণ-শরীর, সূক্ষ্ম শরীর আর স্থূল শরীর।

বললাম— শেষ দুটো বুঝতে পেরেছি কিন্তু প্রথমটির অর্থ ধরতে যে পারলাম না।

— যে-দেহে আত্মার স্থিতি তা এসেছে যে মা থেকে। প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতি-শরীরকে মন্দির করে দিতে পারলে তবেই সেখানে যে পরমাত্মা বিরাজ করেন। তার আগে তো নয়।

চুপ করে গেলেন বাবা। ভক্তরা সব তার মুখের দিকে চেয়ে। তবু কিছু বললেন না বাবা।

ভৈরবী বললেন, আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন পরমাত্মা। পরমাত্মা নিজেই নিয়ন্তা। তখনই শরীর সত্ত্বগুণের হয়ে যায়। আত্মাকে করণ দেহ মানলেই সূক্ষ্ম দেহে পরমাত্মার বিরাজ হয়। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

বাবা বললেন, সৃষ্টির উৎস কী জানেন?

বললাম— কী?

— সৃষ্টির উৎস মায়া নিজে। স্থূল শরীরে মায়া থাকে। শরীর যখন এই পাশে আবদ্ধ তখন সে পশুশরীর। পাশ কাটলেই শরীর পশুপতি। মহাদেব। বাবা বিশ্বনাথ।

এই বলে ভৈরবী প্রণাম সারলেন। জোরে বলতে থাকলেন— জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়। সমবেত ভক্তের জয়ধ্বনিতে তখন আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম মুখরিত হয়ে উঠল। আর ঠিক তখনই বাবা আবার বলতে শুরু করলেন।

— আমাদের এই দেহের এক-এক অংশে পঞ্চভূতের এক-এক ভূতের প্রাধান্য। সবার নীচে পৃথিবী। তার উপরেই জল। আগুনের স্থান মধ্যে, নাভির কাছে। বায়ু বিরাজমান বুকে। কণ্ঠে ব্যোম। ব্যোম থেকেই শব্দ আসে। পৃথিবীর চক্র কী হল তাহলে?

বললাম— মূলাধার।

বললেন— জলচক্র স্বাধিষ্ঠান। আগুন মণিপুর। বায়ুচক্র অনাহত। ব্যোমচক্র বিশুদ্ধ। এই ভূতের উপর কী রয়েছে জানেন?

— কি?

— ভূতাতীত জগত। যার রং নেই, গন্ধ নেই, স্পর্শ নেই কোনও। রং আসছে কোথায় জানেন?

— কোথায়? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বললেন— রং রয়েছে আজ্ঞা চক্রে। সকল বর্ণের আধার হয়ে সাদা হয়ে রয়েছে রং। এটাই হল স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়ার সিংহদরজা। এর দ্বাররক্ষী কে বলুন তো?

বললাম— ব্রহ্মরন্ধ্র। আপনাদের তন্ত্রমতে তা হল গিয়ে সহস্রার।

আমার উত্তরে খুশি হয়ে উঠলেন গিরি মহারাজ। সাধনা ভৈরবীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, মা এ কাকে এনেছেন আপনি?

মা বললেন, বাবা ওঁর সূক্ষ্মবোধ রয়েছে। কিন্তু ক্রিয়া নেই যে!

— নেই কী রে? করণক্রিয়া নেই। জ্ঞানক্রিয়া আছে।

— করণক্রিয়া আছে বাবা। সব জীবদেহেই আছে তা। বলেন, তার প্রয়োগ নেই।

দেখলাম, মায়ের কথাতে সম্মত হলেন গিরি মহারাজ।

জিজ্ঞাসা করলাম, করণক্রিয়া শরীরে কেমনভাবে রয়েছে?

বললেন— শরীরে তো শ্বাস বয় আমাদের। যা প্রাণের কারণ।

বললাম— হ্যাঁ।

মা বললেন, এই শ্বাস হল শিব। প্রশ্বাস শক্তি। শ্বাস হল হ আর প্রশ্বাস স। একে আমরা বলি মন্ত্র।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীসের মন্ত্র?

— এ হল অজপা মন্ত্র।

— মানে?

— জীবদেহের ঐশ্বরিক প্রবাহ। এই হল হংস। এই ক্রিয়া সব শরীরে কিন্তু যোগ কেবল সাধন শরীরে।

বাবা এতক্ষণ চুপ। প্রেক্ষিতে কিছুই বলছিলেন না তিনি।

এবার বললেন, প্রাণশক্তি আগুন। জীবনীশক্তি বায়ু। পঞ্চবোধ যখন পরম চৈতন্য জাগে তখন আবার তিনরূপও যে জাগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী কী এই তিনরূপ?

বললেন— জাগ্রত।

বললাম— মানে?

— জাগ্রত হল গিয়ে শরীরের বিষয়চেতন। স্থূলদেহ ভোগ। দ্বিতীয় রূপ স্বপ্নময়। যেখানে অন্তর্বিষয় থাকে না। এই উপভোগ আসে সূক্ষ্ম শরীরে। সূক্ষ্মে এসে চেতনাও হারিয়ে যায়। তখনই পরম চৈতন্য জাগে।

বললাম— সহস্রারে তা হয় বলছেন?

— সহস্রারে দুই সত্তা লীন হয়

— একটু যদি বুঝিয়ে বলেন।

— শরীর জাগ্রত থাকে কীভাবে?

বললাম— দেহ আর প্রাণ নিয়ে।

— আমাদের দেহ হল ব্যক্তি। এই ব্যক্তি মরলে স্বপ্নময়তা আসে। তখন চলে মানস স্তর। তারপরে মহামানস। তারপর ব্যক্তি যায় তুরীয় দশাতে।

— কীভাবে?

— প্রথমে ব্যক্তি হল বস্তু। তারপর ঈশ্বরবোধ। শেষে ব্রহ্মাণ।

বললাম— স্পষ্ট হল না কিছুই।

শ্লোক বললেন বাবা, 'আনন্দস্বরূপ অমৃত যদ্‌বিভাতি'। সীমিত বুদ্ধি দিয়ে আনন্দের অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায় না। চক্র জাগরণ বোঝা কী সহজ! চক্র হল প্রতিফলন।

—কীসের?

— মনের। মনকে জাগতিক থেকে মহাজাগতিকে আনে চক্র। চক্র সাধককে ভুগিয়ে মারে। চক্রকে বশ করতে পারলে শরীরে জ্বলে বিশ্বজগতের বাতি। এসব হল শক্তিতরঙ্গের লীলা বাবা। লীলায় না এলে সবই ভাসা-ভাসা। এই যে, আপনার মধ্যে স্পন্দন আছে। কিন্তু মহাস্পন্দন না এলে অসীম মহাশূন্য শরীরের সবই তো আপনার মনে হবে ধারণা। ধারণ না করলে ধারণা যাবে না আপনার। মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরটা একটু একাগ্র হয়ে খুলুন না। তাহলে অনেকটা বোধ আসবে আপনার। এ তো আর কঠিন কাজ নয়। তাহলেই বুঝতে পারবেন: 'দেহের ভিতরে অবাক কাণ্ড, /দেহে নাচে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।'

সুরে সুরে বললেন গিরি মহারাজ। সন্ধ্যা তখন মজে রাতের কাছাকাছি চলে আসছে। ঘড়িতে দেখলাম আটটা।

বললেন— এবার তো মহাশ্মশানে যাত্রা করতে হয়।

ভৈরবী বললেন, চলুন বাবা। ভিড় ডিঙতে সময় লাগবে অনেক।

আমাকে বললেন, চলুন। শ্মশানে যজ্ঞক্রিয়ায় অংশ নিয়ে বসবেন।। আহুতি দেবেন। মনে অনেক আলো আসবে। অনভিজ্ঞতা কাটবে আপনার। দেহের ব্রহ্মাণ্ড দেখতে দেহে যেতে হবে আপনাকে বাবা। সঙ্গে দেহ চেনাবে খালি। কিন্তু কজটা যে একার। শক্তিসাধক তাই কী বলছেন জানেন?

বললাম— কী?

উঠতে উঠতে মা সুরে ধরে ফেললেন:

আপনাতে আপনি থেকো
যেওনাকো কারুর ঘরে।

বাবাও লাইনদুটো গেয়ে উঠলেন ভাবের বসে:

আপনাতে আপনি থেকো
যেওনাকো কারুর ঘরে।

ভক্ত-শিষ্য সব খুশি হয়ে উঠলেন বাবা-মায়ের এই সুরের যুগ্মতায়। দু'জনেরই দরাজ গলা। তবে মায়ের গলায় সুর খেলে। বাবর রুক্ষ গায়ন। সেই রুক্ষ্মতায় সুর দিয়ে আবারও গেয়ে উঠলেন মা। তাঁর পৃথুল শরীরে এবার যেন গায়নের ঢেউ খেলল। হাতে ধরা ত্রিশূলকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে গায়নে বাউলের ভঙ্গিকে নিয়ে এলেন তিনি:

আপনাতে অপনি থেকো
যেওনাকো কারুর ঘরে।
কত মণি পড়ে আছে ঐ
চিন্তামণির নাচ্‌দুয়ারে॥

সকলে তখন 'জয় মা জয় মা' বলে ধ্বনি দিতে থাকলেন। তার ভেতরেই চলতে থাকল সকলেরই শ্মশানে আসবার প্রস্তুতি। খালি হয়ে গেল আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম। আমরা এখন মন্দিররোডে। জনসমুদ্রে। ভৈরবী আমার পাশে পাশে চলেছেন। গিরি মহারাজ বেশ কিছুটা আগে। কিছুটা যাওয়ার পর তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। ভিড়ের ভেতর কোথাও তিনি মিলিয়ে গেছেন। জানি না সেটা একার রাজত্ব কি না!

দেহে ছেঁকাছেঁকির খেলা চলে অহরহ

কৃত্তিবাস থেকে সোজা আট-দশ পা এগোলেই মা কামাখ্যার মন্দির। আজ আষাঢ়ের কৃষ্ণাসপ্তমী। অম্বুবাচী। বিশেষ হোম হবে মন্দিরে। সকাল থেকেই কমবেশি ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে সমানে। বিরাম নেই। দুপুর-দুপুর যখন ফুলিয়ায় নামলাম, বৃষ্টি আরও জোরে এল। স্টেশনে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঝিরঝিরে মাথায় নিয়েই ভ্যানরিকশায় উঠলাম। কৃত্তিবাস পৌঁছতেই ধরে এল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গাছের থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে জল। যেন শান্তিবারি সমানে বর্ষিত হচ্ছে আমারই মাথায়। মন্দিরে যখন পৌঁছালাম, বেশ ভক্ত সমাগম। তারই ভেতর এক ঝলক দেখা পেলাম মায়ের। যোগমায়া ভৈরবী। যাঁর আমন্ত্রণে আজ এখানে আসা। হাসি বিনিময় হল কেবল। মনে হল, মায়ের হাসিতেও বৃষ্টিস্নাত গাছগাছালির সব উন্মোচন-সংবাদ লেগে। এতখানি তাঁর হাসির মহিমা। অথচ প্রথম যেদিন দেখেছিলাম ভৈরবী মা-কে, কোথায় ছিল তাঁর শক্তিমন্ত লাবণ্য! সুন্দর কতখানি নির্দয় হয়ে উঠতে পারে আত্মরূপান্তরণের দীপ্তিতে মা-ই তাঁর জাজ্বল্য উদাহরণ।

চৈত্রমাস, ঠাঠাপোড়া রোদ নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম মায়ের দরজায়। কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া-বয়রায় সেদিনই আমার প্রথম যাওয়া। ভ্যানরিকশাতেই গিয়ে নামলাম কৃত্তিবাস হাইস্কুলের গায়ে। চোখ পড়ল গিয়ে ওই শান বাঁধানো স্মৃতিস্তম্ভে। তারপরই কৃত্তিবাসের কল্পিত মূর্তিসহ মন্দিরে। উপরে অশত্থের ছায়া। নীচে এসে দাঁড়াতেই রোদের হলকা খানিক নরম হয়েছে। হাওয়াও দিচ্ছে ফুরফুরে। তবে তাতে লেগে গরমের ভাব। খটাখট শব্দ হচ্ছে তাঁতের। বোনা হচ্ছে জালি গামছা। কাপড়। মাটিরাস্তা ধরে এগোতেই নামাঙ্কিত লাইব্রেরি তথা সংগ্রহশালা। ঢুকতে ইচ্ছে করল না। শুনেছি ফ্রান্স থেকে আনা কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথির মাইক্রোফিল্ম এখানেই সংরক্ষিত। মনে আমার তখন ভৈরবী মায়ের কৌতূহল। যাঁর টানে মূলত খবর পেয়ে এতদূর আসা। যবন হরিদাসের আখড়া পেরোতেই ছিটেবেড়ার জঙ্গল। কৃত্তিবাস আর যবনের পাশাপাশি সহবস্থান। আর তার পাশেই

ভৈরবী মায়ের সাধন অস্তিত্বের ধারা। ভাবছি, এই বঙ্গভূমে ধর্মের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমাও লজিক সম্মত। না হলে শাক্ত-বৈষ্ণবও এমন পাশাপাশি থেকে গিয়ে নাক-উঁচু প্রবণতাকে চোখ রাঙায়। সম্প্রীতির অনুমোদনকে সার্থক করে। ভাবতে ভাবতেই দুপুর প্রখর হচ্ছে। নিমগ্ন কাকের ডাকের মাঝে কোথাকার এক কোকিল পাখির ডাক খুঁচিয়ে তুলছে আমার রোমাঞ্চ। কেন না চলে এসেছি আমি ভৈরবী মায়ের ডেরায়। দেখছি, বাঁশের কঞ্চির গেটটি নারকেল দড়ি দিয়ে ছিটেবেড়ার সঙ্গে বাঁধা। ধারে কাছে কেউ নেই। তাঁতিবাড়ির কোলাহল থেকে একটু দূরে ভাঙা-ছেঁড়া ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভৈরবী মায়ের ভিটে আর কোনও বসতিও নেই এদিকে। রাস্তার ওধারের জমি ঘন সবুজে ঢেকে রয়েছে।

গেট খুলে শুকনো পাতা মাড়াবার শব্দ আর পাখির ডাককে সাঙ্গ করেই আমি কেবল একবারই বলে উঠলাম, মা। মা আছেন?

তাতেই বিস্ফোরণ।

ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল।

মনে হল এক ক্ষুধার্ত সিংহীর গর্জন।

— কী চাই ?

বললাম— একটু দেখা করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।

আওয়াজ আরও চড়া হল। উঠোনে ঘুরঘুর করা শালিক, ঘুঘু ফরফরিয়ে উড়ে গেল তেজি কথার ভঙ্গিমায়।

বললেন— দেখা-টেখা হবে না। মানে-মানে কেটে পড়। তন্ত্র-যন্ত্র কিছুই করবি না তোরা। শুধু বিয়ে করে বউ আনবি, তার আগে ভৈরবীর কাছে আসবি শরীর নাড়াচাড়া শুনতে। যা-যা শান্তিপুর যা। নেড়েচেড়ে দেখে আয়। পাশযুক্ত পশু সব। ভোগের লালায়-ঝোলায় থাক গে যা। তা না চলে এসেছে আত্মশক্তির জাগরণ চিনতে। সরে পড় সরে পড়। না গেলে গায়ে গরমজল ঢেলে কুকুর তাড়াব।

বললাম— একবার যদি...

কথাটা সম্পূর্ণ করতে দিলেন না। তার আগেই আরও যেন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

— গেলি গেলি। না গেলে ত্রিশূল ছুঁড়ে মারব। নিশানা জানিস যোগমায়া ভৈরবীর।

অগত্যা আর কথা বাড়ালাম না। ঘর থেকেই বেরোলেন না ভৈরবী। সিংহীর গর্জন গুহা থেকে উঠে গুহাতেই শান্ত হয়ে এল। ক্ষুরধার দাঁত-নখ আর দেখা হল না তার।

চলে এলাম হরিদাসের আখড়ায়।

সদানন্দ বাবাজি আমার পূর্বপরিচিত। এক সময় জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাঠে আমার যাতায়াত ছিল। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ। অনেকদিনই হল থিতু হয়েছেন এই আখড়ায়।

বললেন— ঝাঁঝি খেলেন বুঝি? সকলেই আসে। চলে যায়। শুনেছি তো আগে দুবরাজপুরে থাকতেন। বছর খানিক হল এখানেই রয়েছেন। লোকে তো বলে সিদ্ধাই রয়েছে ওঁর। কথাবার্তায় তো মনে হয় না। জানেন, এখানে আছেন এতদিন; আখড়া মারাননি কোনওদিন। খোল-কর্তাল জোরে বাজালে শাসান, আস্তে না বাজলে ল্যাংটো হয়ে এসে নেত্য করবেন। ভয়ে থাকি। গ্রামের পাঁচজন ভক্তিশ্রদ্ধা করে। রোগও না কি ভাল হয়! ওষুধ দেন। তা আপনি কী মনে করে? আবারও জিজ্ঞাসা। কত আর খুঁজে মরবেন ভগবান। এবার নাম নেন। আত্মস্থ হন দিকি। মনে শান্তি পাবেন। কৃষ্ণ নামে সকল তোলপাড় দূর হবে।

হাসলাম।

বাতাসার সরবত দিলেন বাবাজি। হাতপাখা দিয়ে বললেন, জিরোন। হাওয়া খান। বিকেল-বিকেল গঙ্গাস্নানে যাবেন। তখন ধরবেন। চেষ্টা করবেন। যদি মুড ভাল থাকে। সারাক্ষণই তো খিঁচিয়ে রয়েছেন। কৃষ্ণ-সান্নিধ্য তো নেই; নমনীয়তা আসবে কোথা থেকে।

বাবাজির এই কথা কতখানি যে ভুল এখন বুঝি অনেকদিন ভৈরবী সান্নিধ্যে আসার পর। একদিন বেলাবেলি এসেছিলাম।

মা তখন মন্দিরের চাতালে পা চড়িয়ে বসে।

দেখে বললেন— আয়। বোস। আজ রাধাষ্টমী। মাকে কৃষ্ণ-উপাচারে সাজিয়েছি দ্যাখ। দ্যাখ দ্যাখ খড়্গ খুলে নিয়েছি মায়ের হাতের। বাঁশি দিয়েছি। দিনরাত মা বাজাচ্ছেন। দুপুর-দুপুর কেউ নেই। মা বললেন, রাধা কই রে যোগমায়া।

বলে এক মস্ত হাসি দিলেন মা। সেই হাসিতে আনন্দমূর্তির মতো খুলে গেলেন মা। বলতে থাকলেন।

— বুঝলি, মাকে কী উত্তর করলাম আমি।

আমার জিজ্ঞাসার প্রতিশব্দকে বলবার সুযোগই দিলেন না ভৈরবী। নিজেই বলে চললেন।

— মা, যোগমায়া তো মহামায়া হয়ে আছে। মায়া কী রে ছোরা?

বললাম— পাশ। বন্ধন।

উত্তর করার সুযোগটুকু পেলাম এইবার।

ভৈরবী বললেন— সেই মায়াকেই তো মেরে রেখে এসেছি যোগে। সেই জন্যই তো আমার নাম রাখা হয়েছে যোগমায়া।

— কে রেখেছেন মা, আপনার অমন সার্থক নাম?

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভৈরবী।

— সার্থক-অসার্থক জানা-বোঝার তুই কে শুনি? কোন নির্ধারক তুই? বিচার-বিশ্লেষণ করা তোদের স্বভাব। সেজন্যই তো শিক্ষিত লোকদের থেকে ভগবান দূরে থাকেন। সারাক্ষণ তোদের কেবল যুক্তি-তর্ক। কেন রে, ভাব নেই তোর? মনের যুক্তিকে মার। তর্ক থামা। প্রমাণ ছাড়ান দে। তবেই দেখবি সত্য পাবি। সুন্দর পাবি তুই। সুন্দর পেলে শিব এমনিই আসবে তোর ভেতরে। তখন আর ভৈরবীর কাছে ঘুরে মরতে হবে না রে। শরীরেই তোর শক্তির জাগরণ হবে। শরীরই হবে তোর কামাখ্যা। শরীরই হবে তোর দেবী মহামায়া। শরীরেই তোর বিরাজ করবে মায়ের পঞ্চকামিনী রূপ।

স্বভাব বশেই মৃদুস্বরে বললাম, কী কী মা, মায়ের সেই পঞ্চরূপ? বোধহয় ভাবে এলেন ভৈরবী। সার্থক মাতৃরূপ নিয়ে স্নেহ ঢেলে দিলেন কথায়।

বললেন— কামাখ্যা, ত্রিপুরী, কামেশ্বরী, সারদা, মহোৎসাহা। মায়ের এই হল পঞ্চকামিনী রূপ। দেবীর চারদিকে রয়েছেন সদা জাগ্রত অষ্টযোগিনী— গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কটীশ্বরী, ধনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা। আসলে মা তো যোনিমণ্ডল রে। যোনিই সৃষ্টি। সৃষ্টির হাতেই খড়্গ। আজ দ্যাখ, তাঁর হাতেই আমি বাঁশি ধরিয়েছি। কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন মা। আর আমি দ্যাখ চুল ছেড়ে দিয়ে আলুলায়িত ভাব নিয়ে রাধা হয়েই বসে থেকেছি। তারপরই তুই এলি। তোকে বলে ফেললাম ভাবের কথা। ভাবই সব রে। ভাবই সব। ভাবসঙ্গে থাকবি সব সময়। সঙ্গ করলেই দেখবি রঙ্গ আসবে। ওঠ ওঠ। কৃষ্ণপুজোর সময় হয়ে গেল। আরতিতে আজ খোল বাজবে। হরেকৃষ্ণ নাম হবে রে। থেকে যা। সব ধরতে পারবি তুই। ভৈরবী উঠতে উঠতে গুনগুন করলেন: 'সহজ পথে উছ্‌ট লাগে ওরে মন কানা;/ (ও) তুই আপনি সহজ না হইলে সহজের পথ পাবি না।'

তার মাঝেই খোঁপা বাঁধা হয়ে গেল যোগমায়া ভৈরবীর। ঢুকে গেলেন মন্দিরে। মায়ের হাতের বাঁশিতে জড়িয়ে দিলেন জবার মালা। আমি তখনও নাটমন্দিরে বসে। যুঝে উঠতে থাকলাম সেই বাঁশি-রহস্যকেই। খড়্গ, বাঁশি সব একাকার হয়ে এল আমার সামনে। কালীকৃষ্ণর সদার্থক প্রতিনিধির সামনে আমি তখন দাঁড়িয়ে।

যোগমায়া ভৈরবী মা-কে যোনিমণ্ডল বলেছেন। কামাখ্যাতে তো দেবীর কোনও মূর্তি নেই। দেবীর অধিষ্ঠান যোনিপীঠের গহ্বরে। লাল শালুতে ঢাকা। তবে কামাখ্যা

শব্দটি কিন্তু আসলে সৃষ্টিদ্যোতক। আভিধানিক পরিভাষাতে দেখলে শব্দটি এসেছে অষ্ট্রিক শব্দ 'কামোই' থেকেই। 'কামোই' কথার অর্থ দৈত্য। 'কামোইত' অষ্ট্রিক পরিভাষাতে শয়তান। 'কোমেন' শব্দটির অর্থ সমাধি বা কবর। ভাষাতত্ত্ববিদরা কামরূপে কামাখ্যা দেবীর মধ্যে আদি নরগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ্য করে এসেছেন বরাবরই। অষ্ট্রিক ছেড়ে যদি এবার খাসিয়া ভাষাতে যাই, দেখব 'কমেত' কথাটি সেখানে আছে। যার অর্থও মৃতদেহ। আবার সাঁওতাল শব্দ 'কোমেন'। অর্থ হল দেবতা। তবে অষ্ট্রিক অনুমোদনের সায়ই এক্ষেত্রে বেশি। কা-মেই-খা। 'কা' হল স্ত্রী। 'মেই' মানে মা। আর 'খা' হল গিয়ে জন্মদাত্রী। সুতরাং এখানে ভৈরবীর বলা মাতৃপ্রত্যঙ্গের যোগাযোগ কিন্তু রয়ে গেছেই। 'কালিকাপুরাণে' কামাখ্যা শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'কামার্থমাগতা যস্মান্মথা সার্দ্ধং মহাগিরৌ। /কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা।। /কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গাদায়িনী। /কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে।।' অর্থাৎ কিনা স্বয়ং ভগবানই বলছেন যে, এই মহাদেবী অভিলাষ পুরণ করার জন্য আমার সঙ্গে নীলকুটে আসায় কামাখ্যা নাম লাভ করেছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামদায়িনী এবং কামনাশিনীও।

তন্ত্রমতে কা হল গিয়ে আবার শক্তি। 'ক' শক্তিমান। সুতরাং 'কা' আদ্যাশক্তি মহামায় বা মা-মা। তাই তার অপর নাম কা-মা বা কা-মাতা। তিনি আকাশচারিণী বা ব্যোমতত্ত্বে (খ) প্রাণবায়ুর (য়) বিস্তার স্বরূপিনী। অর্থাৎ কিনা তিনি কামাখ্যা।

মানদা ভৈরবী একবার আমাকে বলেছিলেন, সাধক বা সাধিকা নিজেই কামাখ্যা রে।

— কীভাবে মা?

প্রশ্ন রেখেছিলাম আমি।

বললেন— কাম মারাই তো সাধনার প্রধান কাজ। কাম মরে শ্বাসে। দমে। প্রাণবায়ুকে সর্বপ্রথম লাগাতে হয় কাজে। সে যদি জন খাটতে রাজি হয় তবেই শরীর কামাখ্যা হবে। এত ঘনঘন কামাখ্যা যাই কেন জানিস?

জিজ্ঞাসা করলাম— কেন মা? কেন যান আপনি?

ভৈরবী মায়ের হয়ে এবার উত্তর করলেন খ্যাপা ব্রহ্মানন্দ। প্রায় প্রতি অমানিশাতেই এই দুই ভৈরবী যজ্ঞ করতে চলে আসেন গৌরনগর শ্মশানঘাটে। সেদিন বেশ ভক্তশিষ্য সমাগম হয়। এমনই এক অমানিশায় মা বললেন, এই যে, সতীর দেহ ভোলানাথের কাঁধে করে নৃত্য— এর মানে জানিস তোরা? ভক্তশিষ্য চুপ। মা তাকালেন আমার দিকে।

বললাম— আপনি বলুন না। আপনার যুক্তি শুনি আমি।

— যুক্তি কীর রে ও! ও যে প্রতীক। কামাখ্যায় থাকা প্রস্তরীভূত যোনি যেমন সৃষ্টির প্রতীক তেমনই সাধকদেহে শক্তির জাগরণের রূপ হল গিয়ে সতী কাঁধে করে ভোলানাথের তা-ধিন্-তা-ধিন্।

বলেই মা এক গাল হাসলেন। ভক্তের দেওয়া পান মুখে পুরে বললেন, কড়া করে দেয়নি কেন রে গোপাল সুরভি?

ভৈরব বললেন, কুণ্ডলিনীযোগে কাম ছেঁকতে হয়। দেহে ছেঁকাছেঁকির খেলা চলে অহরহ। রাত্রিদিন। শরীর তো হল গিয়ে ছাঁকনি। কাম ছেঁকতে হয়। লোভ-মোহ বাকি সব অষ্টপাশও তো ছেঁকার জিনিস। সাধককে, সাধিকাকে প্রথম যা ছেঁকতে হয় তা হল গিয়ে কাম। তাই কাম ছেঁকতেই আমরা সবাই কামাখ্যা ছুটি। থাকি। আসি-যাই।

হিন্দু শক্তিচিন্তায় আদ্যাশক্তিই রাজ্ঞী, রাজমহিষী বা রানি হয়ে আকাশে বিস্তারিতা (আ) হয়ে নিয়ন্ত্রীধারায় (ত) গতিশীলা (ঈ) অর্থাৎ কা-মা-খাতি বা কা-শাই (শাহী) খাতি। অর্থাৎ কিনা দেবী কাছাইখাতি বা কেশাইখাতি। কাঁচা মাংসভক্ষিণী।

মানদা ভৈরবী শরীরকে কামাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। এখন প্রশ্ন হল শরীর যদি কামাখ্যা হয় তবে সেই শরীর কীভাবে, কীরূপে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করবে? তন্ত্রে পঞ্চ ম-কারে সাধনার কথা বলা হয়। সেখানে মদ, মাংস, মৎস্য ভক্ষণ করার কথা উল্লেখ আছে। তবে স্থূল অর্থে মদ, মাংস, মৎস্য বলতে যা বোঝায় আদতে পঞ্চ ম-কারের সাধনায় মদ, মাংস, মৎস কিন্তু তা মোটেই নয়। মদ্য হল যোগকালে কুলকুণ্ডলিনী যখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তখন সেখানকার স্নায়ু থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকেই তন্ত্রে মদ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে: 'সোমধারা ক্ষরেদ যাতু ব্রহ্ম রন্ধ্রাদ্ বরাননে। /পিত্বানন্দময় স্তাং যঃ স এব মদ্য সাধক:॥' মাংস হল জিভ বা রসনা। কথা বা বাক্যকে রসনার অংশ হিসেবে ধরা হয়। যে ব্যক্তি বাক্য ভক্ষণ করেন অর্থাৎ কিনা যোগ প্রক্রিয়ায় বাক্ সংযম করে মৌন হয়ে যান, তিনিই হলেন মাংস সাধক। — 'মাশব্দাসনা জ্ঞেয়া তদংশান রসনা প্রিয়ান। /সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক॥' আবার বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যেতে পারে: মাংস ভক্ষণ হল জ্ঞানখড়্গ দিয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা— এই পাশগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। তন্ত্রের পশ্বাচার ভক্ষণেরই প্রতীকীরূপ হল মাংস ভক্ষণ। মানদা ভৈরবীর শরীরকে কামাখ্যা বলার অর্থ হল কামসহ পশ্বাচারকে বিনাশ করা। ভৈরব ব্রহ্মানন্দ কুণ্ডলিনীবলে পশ্বাচারের প্রতিরূপকেই কামরূপে চিহ্নিত করে কাম ছেঁকতে কামাখ্যায় ছোটার কথা বলেছেন। সাধক শরীরে যখন শক্তির জাগরণ ঘটে তখনই শক্তি কাঁচা

মাংসভক্ষিণী কামাখ্যাতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। শরীরে মহামায়ার আর্বিভাব ঘটে। তিনিই সাধক সাধিকার মাংসকে আত্মস্বাদ করেন। কাঁচা মাংসভক্ষিণী হয়ে ওঠেন। কারণ হল: 'স্থূল বা কাঁচা শরীরের বিনাশ হয় কুণ্ডলিনী যোগেই। এই যোগবলেই সাধক সাধিকার শরীর কামাখ্যা হয়ে ওঠে। তন্ত্রমতের এই শক্তিচিন্তার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয়দেরও শক্তিচিন্তার একটা সুসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। 'কা' হল গিয়ে সেখানে সৃজনশীল শক্তি। 'মাত্' দৈবী শৃঙ্খলা। তাহলে দাঁড়াল গিয়ে সেই হিন্দু তন্ত্রমতেরই শক্তিচিন্তা কামাত্ বা কা-মাতা। কামাখ্যা। জাপানে আবার 'কমি' শব্দের অর্থ হল ঈশ্বর। কখনও 'কমি' হল গিয়ে ক্ষতিকর শক্তি। কামাখ্যা যদি কাম মারার বা কাম ছেঁকার প্রতিরূপ হিসেবেই দেকেন সাধক সাধিকা, তবে তা তো ক্ষতিকারক 'কমি'-ই। কামকেই তো মারতে চাইছেন ভৈরবী সাধিকা। ভৈরবী ছেঁকার কথা বলছেন। সুতরাং জাপান আভিধানিকেও এর কিন্তু সাযুজ্য রয়েছে।

কাম ছেঁকতে বা মারতে তন্ত্রে পঞ্চ ম-কারের তৃতীয় মুদ্রা হল মৎস্য। অনেককে আবার পঞ্চভূতকেও পঞ্চ ম-কারের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে দেখেছি। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমও বসে যাচ্ছে তখন তন্ত্রে। পঞ্চ ম-কারের পাশে। জলকে (অপ্) তাঁরা বলছেন মৎস্য। মদ্য হচ্ছে অগ্নি (তেজ)। মৃত্তিকাকে (ক্ষিতি) মুদ্রা বলছেন। মাংস চলে যাচ্ছে মরুত-এ। ব্যোম থাকছে মৈথুনে। তন্ত্রে মৎস্য সাধক তিনিই হতে পারেন, যিনি শরীরের গঙ্গা ও যমুনা নামে দুই মাছকে বেশ ভালভাবে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিতে পারেন। সাধক কীভাবে খাবেন শরীরের এই দুই কল্পিত মৎস্যকে? না খেলে মৎস্য সাধক তিনি হবেন বা কীরূপে? তন্ত্রশাস্ত্র তো বলছে: 'গঙ্গাযমুনয়োমধ্যে মৎস্য দ্বৌ চরতঃ সদা। /তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধক॥' অর্থাৎ কিনা গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুটো মাছ চরে বেড়াচ্ছে। গঙ্গাকে সাধক বলছেন শরীরেরই ইড়া নাড়ি। পিঙ্গলা নাড়ি হল গিয়ে যমুনা। রজ ও তম এই দুই মাছ তার মধ্যে দিয়ে চলাচল করে। রজ = শ্বাস, তম = প্রশ্বাস। সাধক বলেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনটি গুণের খেলা চলছে বা আধার রয়েছে। সত্ত্ব, রজ, তম। রজ আর তম মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত। সত্ত্বগুণ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন বা প্রভাবিত নয়। তাই রজ আর তম গুণের প্রভাব অতিক্রম না করলে সাধকের মুক্তি নেই। সত্ত্বগুণ জাগবে না। রজ-তম যিনি নাশ করতে পারবেন তিনিই হবেন মৎস্য সাধক। অনেকে আবার বলে থাকেন অহংকার, দম্ভ, মদ, পৈশূন্য, মাৎসর্য ও হিংসাস্বরূপ ছয়টি মৎস্যকে বৈরাগ্য দিয়ে ছেদন করে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নিতে জলচর মাছের মতো ভেসে বেড়ান। তন্ত্রসাধক, দেহসাধক বা যোগীগুরু মস্তিকের ঊর্ধ্ব অংশে সহস্রার পদ্মচক্রের কল্পনা করেন। একে আবার মহাপদ্মও বলেন

অনেকে। তার কর্ণিকাতে পারদের মত ঢল ঢল শ্বেতবর্ণের সুনির্মল জ্যোতির কথাও বলছে শাস্ত্র। বলা হয়েছে সেই জ্যোতি চন্দসূর্যের জ্যোতি থেকেও জ্যোতিষ্মান। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকা কুণ্ডলিনী আকারের মহাশক্তির কথাও বলছেন সাধক। বলা হচ্ছে যে, ইনিই পরমাত্মা। অনেকে একে পরমব্রহ্মাণ, তুরীয়, তুরীয়াতীত ইত্যাদি নানা অভিধায় ভূষিত করেছেন। বলা হয়েছে যে, সাধক যোগশক্তিতে দেহের মধ্যে ঘনীভূত বস্তুশক্তিকে এই পরমানন্দময় পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে জানেন বা পারেন তিনিই হলেন মুদ্রাসাধক। তন্ত্রশাস্ত্র মুদ্রা সাধকের অর্থ করেছে এইভাবেই। 'সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ। /আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম॥/সূর্য কোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম। /অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতম। /যস্য জ্ঞানোদয় তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে॥ ' অনেক দেহসাধক আবার তৃষ্ণা, ভয়, ঘৃণা, জুগুপ্সা, মান, লজ্জা ও ক্রোধস্বরূপ অষ্টমমুদ্রাকেই পশুপাশ মেনে তা থেকে শরীরকে বিচ্ছিন্ন করার মাহাত্ম্যকেই বলে থাকেন মুদ্রাভক্ষক। এভাবেই তাঁরা মুদ্রাভক্ষণ করে মুদ্রা সাধক হয়ে ওঠেন। বিশেষত বৈষ্ণব সাধক এবং বাউল সাধকরাই এরকম মত পোষণ করেন। শ্রীবাস অঙ্গনের কিশোরী দাস বাবাজি আমাকে সাধকের অষ্টপাশ নাশের কথা বলতে গিয়ে এই রকমই মত পোষণ করেছিলেন একবার। বলেছিলেন, পঞ্চ ম-কারের সাধনা বৈষ্ণবও করেন বাবা। ও কী শুধু তান্ত্রিকের কাজ। ও যে আসলে সাধকেরই সাধনা। ভেদাভেদ কী? ভেদাভেদ নামে। মতে। অভিজ্ঞানে।

বললাম, তন্ত্রে তো শক্তির উপাসনায় মদ-মাংস দেওয়ার রীতি আছে।

বললেন—মদ কী বাবা? ও তো আসলে নেশাচ্ছন্নতা। কৃষ্ণভক্ত এমনিতেই তো সর্বসময় ঘোরে থাকেন। নামে থাকেন। ওটাই যে তাঁর নেশা। মদ।

— আর মাংস?

— সে তো বাবা রসনা। শ্রীগুরুগোবিন্দের সুখবিধানের নামই ভক্তি। একে তুমি সেবাও বলতে পারো। হৃদয়ে কাম থাকলে পরে কামদেব কৃষ্ণনামের স্ফূর্তি হবে না যে বাবা।

— কামনা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?

— যাকে তুমি যৌনতা মানো সে তো রিপুর কামনা। ইন্দ্রিয়দোষ সব। দুঃসঙ্গ, কপটতা, বর্হিমুখীতা, আত্মবঞ্চনা এগুলোও যে কামনা বাবা। এগুলোর সংযম এলে কৃষ্ণকথাতে আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দ রসনা। রসনা তৃপ্তি। তাই তো হল মাংস ভক্ষণ।

জিজ্ঞাসা করলাম, মৎস্য,মুদ্রা, মৈথুন?

বাবাজি জপের পুঁটলির ভেতর হাত ঢোকালেন। থলের ভেতর হাতের নাড়াচাড়া বার কয়েক করার পরই বললেন, স্থূল মাংস, মদ, মৎস্য বৈষ্ণবের নৈব নৈব চ। ভগবান বৈরাগ্য চান। নাম চান। নামসেবা জীবকে রক্ষা করে ও কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌছে দেয়। তাই মৎস্য নাম-স্বরূপিনী। তাকেই আস্বাদন করেন পরম বৈষ্ণব। মুদ্রায় তা সেব্যভাবে আসে। গুরুসেবায়, গোবিন্দসেবায়। আর মৈথুন? সে তো বাবা আমাদের সারাক্ষণ চলে কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে।

মজলিশপুরের প্রবীণ প্রাজ্ঞ বাউল শশাঙ্কশেখর দাস বৈরাগ্য আমাকে বলেছিলেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ,মরুৎ, ব্যোমই হল পঞ্চতত্ত্ব। শরীরে রয়েছে এইসব। শরীর পৃথিবী। ব্রহ্মাণ্ড।

বললাম— কীভাবে?

বললেন— শরীরের নীচের দিক থেকে উপরের দিকে আমাদের যে পাঁচটি চক্র সেখানেই তো পঞ্চভূতের বাসা।

বললাম— মূলাধারে ক্ষিতি, স্বাধিষ্ঠানে অপ্, মণিপুরে তেজ, অনাহতে মরুৎ, বিশুদ্ধ চক্রে ব্যোম। এই তো?

মাথা নাড়লেন বাউল। তারপরই গুনগুন করতে থাকলেন: 'পাঁচটা ভূতের হাতে পড়ে মন/লাগালো মস্ত গণ্ডোগোল।'

কিছুক্ষণ চুপ।

তারপর আবার বললেন, পাঁচ, নিয়ে কারবার সব। দেবপূজাতেও তো তাই খ্যাপা। তাই তো বলি, শরীর আসলে হল গিয়ে দেবাঙ্গন। শরীর বৃন্দাবন।

বললাম— তন্ত্রেও তো শরীর কথা বলে।

বললেন— বলে খ্যাপা। তবে ও যে পঞ্চ ম-কারে প্রতীক দেবীর কথা কয়। আমরা বলি, দেবদেবী নয় গো, দেবদেবী নয়। মানুষই অটল হয়: 'যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয় মলে তা যদি তাতেই মিশায়/ তবে ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায় স্বর্গ-নরক কার মেলে?'

জিজ্ঞাসা রেখেই বাউল কথাগুলো সুরে ধরলেন। মজলিসপুরে তখন যেন মানুষেরই ঈশ্বর-অংশ প্রকাশ পাচ্ছে। না হলে বৃদ্ধ অশক্ত বাউল গলায় এতখানি সুর পাচ্ছেন কোথা থেকে? এত তাঁর উন্মাদনা এ কী ঈশ্বরাংশের নয়!

তন্ত্রে মৈথুনতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হল গিয়ে মৈথুন। একে সাধক চিহ্নিত করছেন পরমতত্ত্ব হিসেবে। সাধক বলে থাকেন মৈথুন তত্ত্বে জ্ঞান এলেই সিদ্ধি আসে। ব্রহ্মজ্ঞান হয়। নাদ ও বিন্দু যুক্ত হয়ে যে

পরম পুরুষ রয়েছেন তিনি রমণ করে মৈথুনের অবসান করেন। এই রমণের মূল উপাদান হল পরমাত্মা আর কুণ্ডলিনীশক্তি। সাধক মৈথুন সুসম্পন্ন করতে নিজ শরীরে কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করে সহস্রার পদ্মচক্রে নিয়ে গিয়ে শিবের সঙ্গে মৈথুন করাতে পারেন। তখনই তিনি হয়ে ওঠেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক। — 'মৈথুন পরমংতত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণম। /মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানম সুদুর্লভম॥রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। /মকরাশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগৌস্থিতঃ প্রিয়ে॥ /আকারহংস-মারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ। /তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম॥' অনেক সাধক মৈথুন তত্ত্বকে শিবস্থ প্রতীকে না এনে বলেন যে, ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুই নাড়িতে বাহিত প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুকে সুষুন্মাতে সংযোগ করানোও আলিঙ্গনরূপ মৈথুনস্বরূপ। বিষয়টি আসলে তো তাই-ই। যোগের সাহায্যে কুলকুণ্ডলিনীকে (Potential energy of the body) শরীরের মূলাধার চক্র থেকে সহস্রার চক্রের কূটস্থানে নিয়ে গিয়ে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে নেওয়া। এতে যেটা হয়, শরীরের যাবতীয় স্থূল সত্তার বিনাশে সূক্ষ্ম সত্তার জাগরণক্রিয়া। শক্তি ও পুরুষের আলিঙ্গনে সাধক অভেদাত্ম হয়ে পড়েন। সাধক বলেন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে এই মৈথুন তত্ত্বে। তবে সাধকের এই যুক্তি যথেষ্টই কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত। সৃষ্টির উষালগ্নে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এই অবস্থাতেই ছিল। Black hole-এর অভ্যন্তরে Chaos এই শান্ত অবস্থাটিকেই আলোড়িতকরে শক্তিকে পৃথক করে দেয়। ফলে শক্তিপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। শক্তিই আবার অণু-পরমাণুর জন্ম দেয়। তাদের পারস্পরিক সংযোগে স্থূল বিশ্বের সৃষ্টিও অনেকখানি সেই সাধক বর্ণিত মৈথুন তত্ত্বেরই প্রতিরূপ। শরীরে বায়ুক্রিয়ার মতোই আবার যখন উল্টো টানে (Big Crunch) বিশ্ব ভেঙেচুরে কেন্দ্রের অভিমুখে সরে যায় তখনও তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সংযোগ ও ঘর্ষণের মধ্যে দিয়ে শক্তি শূন্যে গিয়ে লয় প্রাপ্ত হয়। শক্তির এই শূন্যে লয় তো মৈথুন স্বরূপই। আদিতে জগৎ এই ধরনের মৈথুনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল আবার অন্তেও সেই মৈথুনেই তার নিষ্পত্তি। যোগক্রিয়া তো শরীরের স্থূলতাকে ভেঙে দিয়ে সূক্ষ্মতাকেই নিরাকার মহাশূন্যের মতো মনোরম্য ধ্রুপদ করে তোলে। শরীরের এই বিশেষ বিহ্বলতাই তো শরীরকে আলাদা করে। আর যিনি তা করে নিতে জানেন বা পারেন তিনিই যোগীগুরু। মহাসাধকে পরিণত হয়ে ওঠেন। আধ্যাত্মবাদ একেই বলে শরীরের বা শরীর ধারণকারী সাধকের জগদীশ্বরত্ব প্রাপ্তি হয়েছে। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করে গিয়েছেন। স্থূল জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেছে তাঁর। তা হয়েছে এই মৈথুন তত্ত্বতেই। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'মৈথুন পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্তিত্যন্তকরণম।' আমাদের শরীরকে

যদি মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতোই ক্ষুদ্র বিশ্ব (Micro World) ধরি তাহলে মহাবিশ্ব ও ক্ষুদ্রবিশ্বে দুই জগতেই মৈথুন তত্ত্ব বিশেষ প্রযোজ্য। আর সহজিয়া সাধক তো শরীরকে ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপই মনে করেন। নিদান হাঁকেন দেহভাণ্ডে যা নেই ব্রহ্মাণ্ডে তা থাকবে কোথা থেকে? এই যুক্তিক্রমেই তো শরীরকে ক্ষুদ্র বিশ্ব ধরা যায়। তন্ত্র সেই ক্ষুদ্র বিশ্বকেই উসকে তোলে শরীরক্রিয়ায়। সেজন্যই সেখানে পঞ্চ ম-কারের সাধনা। মৈথুন তত্ত্বের আগমন।

রাধাষ্টমীতে যোগমায়া ভৈরবী তো কালীকে কৃষ্ণ সাজিয়ে দিলেন কালীর হাতের খড়্গ খুলে নিয়ে বাঁশি ধরিয়ে দিয়ে। বুঝলাম কালী কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন আজ। ভৈরবী মা কর্তাল বাজালেন। খোল এল। মা গাইলেন বৈষ্ণবের যোলো নাম আর বত্রিশ অক্ষর: 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। /হরে রামো হরে রামো রামো রামো হরে হরে॥'

ভৈরবীর কৃষ্ণনামে সদানন্দ বাবাজির মতো গোঁড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়তো খুশিই হবেন। কেন না তাঁদের মত, কেবল কৃষ্ণময় পৃথিবীর। আর কৃষ্ণ যেহেতু সৃষ্টিকর্তা, স্বয়ং ভগবান তাই আর কোনও আরাধ্যের পুজো তাঁদের মতে অবুঝের আচরণ। কৃষ্ণই শান্তি, শরণাগতি ও সকল সমস্যার মীমাংসা। কৃষ্ণনামই সেই সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁদের মত, নামাশ্রয়ই কৃষ্ণাশ্রয়। নামভজনই কৃষ্ণভজন। নামসেবাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা। তাই দীন-দরিদ্রের সেবার এখানে কোনও প্রশ্নই নেই।

যশড়ার শ্রীপাঠের ভক্তিপ্রিয় ভজনোন্মুখ মহারাজ একদিন আমাকে ভাগবত গোস্বামী মহারাজের লেখা পড়া শোনাচ্ছিলেন। বহুদিনই হল তিনি দেহ রেখেছেন। 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ', 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা', 'শ্রীচৈতন্য বাণী'-তে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে তিনি কৃষ্ণচর্চার পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন। বহু পুস্তিকাসমূহের প্রণেতাও তিনি। ভক্তি, ভক্ত, ভগবান সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনা সুনির্দিষ্ট কৃষ্ণের দেবায়তনটিই নির্মাণ করে। ভক্তিপ্রিয় মহারাজ আমাকে গোস্বামী মহারাজের 'নদীয়া প্রকাশ'-এর একটি লেখা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। যেখানে তিনি বিবেকানন্দের মতাদর্শকে জোর আঘাতই করেছেন। 'জীবে প্রেম....', 'দরিদ্র নারায়ণ'...' এইসব বিবেচনাকে তিনি দ্বিধান্বিত যুক্তি বলে মনে করেছেন। ভক্তিপ্রিয় মহারাজেরও সেই একই অভিমত।

তিনি আমাকে বললেন, আপনি তো শিক্ষিত মানুষ। বহু শাস্ত্র পাঠও করেছেন। আপনি বলুন নারায়ণ দরিদ্র হয় কীরূপে? নারায়ণের যা ঐশ্বর্য আপনি তো সবই জানেন।

এরপর তিনি নারায়ণ মহিমাতে মাতলেন। চৌদ্দভুবনে চলে গেলেন।

আমি চুপ। আমাকে তিনি সম্মান করেন। আমি তাঁকে মান্যতা দিই তাঁর একনিষ্ঠ কৃষ্ণ মোকাবিলায়। সব সময়ই তিনি কথাতে কৃষ্ণময়। তাঁর যুক্তিচিন্তাকে আমি ভাঙব বা কীরূপে? আর তিনি আমলই বা দেবেন কেন আমার কথায়।

একদিন তিনিই তো অমাকে বলেছিলেন, আপনার মুস্কিলটা কী জানেন? বিনীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যখন ধরেছেন, আপনিই বলুন না? মৃদু হাসলেন মহারাজ।

বললেন—ভগবানকে আপনি সব সময় জ্ঞান দিয়ে বিচার করেন। যদি একটু ভক্তিভাবে আসতেন তাহলেই আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। সকল জিজ্ঞাসার অবসান হত আপনার। মহাপ্রভু অত শিক্ষিত মানুষ, পণ্ডিত, তার্কিক, শাস্ত্রজ্ঞ— শেষে দেখুন কেমন ভক্তিরসে মাতোয়ারা হলেন।

মহারাজকে আমি বলতে পারলাম না, শ্রীচৈতনদেব যে ধর্মের কথা বলেছেন, তা কখনওই আচারমূলক ও অনুষ্ঠান ক্রিয়াতে ঢাকা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্মপথের আরাধ্য ঠিকই কিন্তু সেই কৃষ্ণ-উপাসনায় উচ্চ মার্গের দর্শনাশ্রয় ছিল। চৈতন্যদেবই উপলব্ধি করেছিলেন জনসংঘকে প্লাবিত করতে হবে শক্তিতে। তাই তিনি হরিনাম সংকীর্তন সেই শক্তিপথের সুপরিকল্পিত সিংহাবলোকনের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। ইসলামি শাসনের উৎপীড়নে হিন্দু-বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় তাঁর নামসংকীর্তনই ইসলামিক শক্তিকে পরাজিত করেছিল। এ তো আদতে ছিল স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এদেশেই গড়ে ওঠা প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ। গণ-আন্দোলন। পরবর্তীতে গান্ধীজী যাকে আরও সুদৃঢ় করে নিতে পেরেছিলেন। সেখানে স্বদেশচেতনা আরাধ্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। চৈতন্যের কৃষ্ণ-উপাসনার সেই বলিষ্ঠ দর্শনকে গান্ধীজীও কাজে লাগিয়েছিলেন প্রেক্ষিতেরই স্বদেশিকতায়। চৈতন্যদেবও তো তাই-ই করেছিলেন। তবে বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁর মনুষ্য জাগরণের আখরকে ধরতেই পারেননি। ধরেছেন কেবল হরিভক্তিটকুকেই। কিন্তু সঠিক উদ্দেশ্য থেকে চ্যুত হয়ে যাওয়ার পর এই সম্প্রদায় চৈতন্যকে মেনেছেন ওই ধর্মগুরু হিসেবে। তাঁর মত ও পন্থাকে গুরুত্বই দেননি। বলা যায়, অতি কৃষ্ণচর্চায় শ্রীচৈতন্যদেব তাই তাঁদের কাছে মনুষ্য শরীর খসিয়ে হয়ে গিয়েছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই।

সদানন্দ বাবাজি মায়ের কৃষ্ণকথায় সামিল ছিলেন না তা তো আমি দেখতেই পেলাম। থাকবার কথাও নয়। তাঁর আখড়াতেও সান্ধ্যকালীন ক্রিয়াকর্মের ব্যাপার আছে। তা ছেড়ে তিনি আসবেনই বা কীভাবে। তাছাড়া যোগমায়া ভৈরবীর মতো অতখানি উদার তিনি নন। হবেন বা কীভাবে? গৌড়ীয় বেড়া ডিঙোতে পারেননি

এই পথের কত বিদগ্ধ মানুষজন সেখানে সদানন্দের মনে কালির আঁচড় কতটুকু! কথাবার্তায় তা আছে বলে মনে হয় না। আর মা? মা তো আমার কাছে এখনও বিস্ময়সূচক চিহ্ন। তিনি যে কী তা তো ধরতেই পারছি না এখনও পর্যন্ত। তবে এটুকু আমার কাছে স্পষ্ট তিনি বীরাচারী তন্ত্রসাধনার ভৈরবী হয়েছেন হয়তো ঠিকই, যৌনসম্ভোগেও লিপ্ত তথাপি তিনি কিন্তু ভ্রষ্টাচারী স্ত্রীলোক কখনওই নন। উচ্চমার্গের সাধিকা তিনি নাও হতে পারেন তবু তাঁর মধ্যে সাধন কণিকার বেশ একটা একীভূত ধর্ম সমন্বয়ের ঔদার্য যে আছে, এটা তাঁর কথাবার্তাতেই একেবারে সুস্পষ্ট। হতে পারে তিনি শিক্ষিতা, শাস্ত্রজ্ঞ কিংবা কোনও উচ্চস্তরের সাধক-সংস্পর্শ থেকে এসেছেন। আবার আমার এ ধারণা ভুল হলেও তাঁর ভেতর যে এক বিশেষ যুক্তি এবং শোভন প্রবর্তনার মূর্তিমানতা রয়েছে তা অস্বীকারের জায়গা নেই। তবে মা সম্পর্কে আমার এখনও কৌতুহলের শেষ নেই।

কামাখ্যা মন্দিরে কৃষ্ণ-আরতির পরও মা-কে আর ফাঁকা পাওয়া গেল না। ভক্তশিষ্যদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা শুনতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কাউকে দিলেন তাবিজ, কারও হাতে মন্ত্রপূত ফুল। রোগগ্রস্তকে জরিবুটি তুলে দিয়ে খাওয়ার প্রক্রিয়া ও সময়সূচি বাতলে দিয়ে একবার আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন মা। তাঁর হাসি ও চোখের অভিব্যক্তির অর্থ হল: বোস বাবা। আসছি। থাকতে যখন বলেছি তোকে, তোর সব জিজ্ঞাসার উত্তর আমি দেবো।

আমি বসে রইলাম নাটমন্দিরে। কিছুপর ফাঁকা হয়ে এল মন্দির। হাওয়া দিচ্ছে জোরে। গাছগাছালি পাগল হয়ে উঠছে। ভাদ্রের পচা গরমে একবাটি তালের বড়া হাতে মা এলেন আমার সামনে। বসলেন। বললেন, খেতে থাক। কালীকৃষ্ণকে নিজে হাতে ভেজে ভোগ চড়িয়েছি। খেতে-খেতেই তোর জিজ্ঞাসার উত্তর শোন। অথচ আশ্চর্য, মা-কে তো আমি তখনও কোনও প্রশ্নই করিনি। তবু মা অবলীলায় কৃষ্ণ ভেদ করছেন। কালীকে সাজাচ্ছেন সেই শরীর সাধনার বাস্তবতায়।

মা বলছেন— কালী কী?

বললাম— আপনি বলুন মা। আপনার অনুভূতি জানতে চাই।

বললেন— অনুভূতি কী রে ছোঁড়া। কালী তো বাস্তবতা।

— কীভাবে? জিজ্ঞাসা রাখলাম আমি।

— কালী হল কামনাকেই বশীভূত করে ফেলা। জানিস তুই মা উলঙ্গ কেন?

বললাম— কেন?

বললেন— কালী আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়কে কলন করছেন যে। কলন মানে বুঝিস তো?

—গণনা। খুব নিচু স্বরে বললাম আমি।

ভৈরবী বললেন— কালী রতিযোগের নারী। বিপরীত বিহার করছেন তিনি। শিব তাই নিষ্ক্রিয় হয়ে শুয়ে। তন্ত্র সাধনায় নিষ্ক্রিয় শিবকে, পুরুষকে তো শক্তিই জাগায়। তাই পুরুষ, সাধক ব্রহ্মলাভের জন্য শক্তিরূপা কালীর কামনাকে হরণ করে নেন। সেই হরণ রূপেতেই কালী ন্যাংটো। বসনহীনা। বুঝলি?

আমি কিছু উত্তর করার আগেই মা বলতে থাকেন। যেন এক্ষেত্রে আমার বোঝা না-বোঝার কোনও অর্থই নেই। অথচ মা তো আমার জিজ্ঞাসাকে, কৌতূহলকেই নিরসন করতে বসেছেন। সেসবের ভ্রূক্ষেপ নেই মায়ের। মহাভাবে পড়েছেন মা। মা মায়েরই প্রতিরূপে আচ্ছন্না। বলে চলেছেন।

— আমরা যদি আমাদের কান চাপা দিই শুনতে পাব না। চোখ বুজলে দেখতেও পাব না। মুখ বন্ধ করে রাখলে খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, সবই তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাই শক্তিকে সব সময় অনাবৃত রাখতে হবে। দর্শন শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি, শ্রবণ শক্তি, বাক্ শক্তি, প্রাণ শক্তি, কাম শক্তি— এগুলোকে সব অনাবৃত রাখতে হবে। আবরণ প্রকাশকে রুদ্ধ করে। কালী সেজন্যই বস্ত্র ছাড়া। বিবসনা।

বললাম— তাহলে আজ শক্তির হাত থেকে খড়্গ খুলে নিলেন কেন মা?

মা হাসলেন। তাঁর হাসিতে স্নিগ্ধ চাঁদের চমক। আজ অষ্টমী। ঠিক সাত দিনের মাথাতেই ভাদ্রী পূর্ণিমা। তারই শোভা যেন এখন মায়ের হাসিতে লেগে।

বললেন— শক্তির হাত থেকে আজকে শাসনকে খুলে দিতে চাইলাম আমি। আজ রাধাষ্টমী। শাসন দিয়ে কী আর প্রেম হয়! মা-কে তাই বাঁশি দিয়ে কৃষ্ণ করলাম। তবে না আমার ভাব আসবে রে। রাধাভাব। খড়্গ হচ্ছে শাসনযন্ত্র বুঝলি। শরীরে যদি শক্তির জাগরণ ঘটে শক্তিকে তো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণই হল গিয়ে শাসন। এই শাসন বর ও অভয়ের। তাই কালীর দুই ডান দিকের হাতে বর ও অভয় মুদ্রা। বাঁ দিকের এক হাতে খড়্গ। যা শাসনস্বরূপ। আরেক হাতে মুণ্ড। মুণ্ডটা কী জানিস কি তুই?

বললাম— আপনি বলুন মা।

— মুণ্ড হল আমাদের অন্যায় কাজের বিবেকী শক্তি। তাকেই পুরোদমে যে জাগাতে হবে। তাহলেই অন্যায় আসবে না। সাধনপথে শক্তির ন্যায় আসবে।

বললাম— আর বাঁশি। বাঁশি দিলেন কেন আপনি মায়ের হাতে? কেবল কৃষ্ণকে বোঝাবার জন্য? প্রেমকে সার্থক করবার জন্য?

মা বললেন— তুই বিচার-বিশ্লেষণ কর ছেলে। তাই তোর মনমতোই উত্তর দিই কী বল?

বললাম— বলুন। শুনি আপনার মতামত।

মায়ের মুখে এখন যেন কৃষ্ণের চিন্ময় কারসাজি। এ কি শুধু আমারই কল্পনা। না কি ভাবেরই অনুষঙ্গত প্রকাশ। ধরতে পারছি না। বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি নেই এখন ভৈরবী সম্মোহনে। তবে এ বিভ্রান্তিক মনের উদাহরণ নয়। এ হল গিয়ে মনোরম্য সৌন্দর্যের সৌন্দর্যযুক্তি। তত্ত্বায়নের উপলক্ষে তত্ত্বের নির্ধারণেও প্রকীর্ণ বীক্ষণের ঝলমলানি।

বললেন— কৃষ্ণের হাতে বাঁশি কেন, কী মনে হয় তোর? তুই তো পড়াশোনা করা ছেলে। কী ব্যাখ্যা আছে এর তোর কাছে শুনি?

বললাম— আমার যুক্তি কি সাড়া জাগাবে আপনার বিশ্বাসে?

— বল না তুই শুনি। যুক্তি ছাড়া বিশ্বাস হয় না কি রে। বিশ্বাসে যুক্তি থাকে। যদি তা না থাকে তা তোর আর বিশ্বাস থাকে না রে। ও যে সংস্কার হয়ে যায়। আর তা যদি অন্ধ হয় তো আরও কেল্লাফতে। তুই কী বলবি বল শুনি।

— বাঁশি তো আসলে সুরতরঙ্গ।

— কিসের সুর বলতে চাইছিস তুই? মা-র চোখেমুখে জিজ্ঞাসা।

বললাম— সৃষ্টির সুর।

বললেন— ঠিক বলেছিস তুই। দেহসৃষ্টির সুর হল গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি। ফুটোগুলো তো সব চক্র রে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা। বাঁশি শরীরকে বাজানোরই ইঙ্গিত করে। বাঁশির সুরতরঙ্গ শরীরকে দেহসাধনার সদার্থক দিকেই নিয়ে যায়।

ভৈরবী বাঁশিকে শরীরের ছটি চক্রসম মনে করেছেন, যা তাঁর মতে শরীরকে বাজাচ্ছে। ভৈরবীর এই যুক্তিময়তার মধ্যেও কিন্তু প্রবলভাবে বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে কিন্তু রয়েছে শক্তির তিনটি মৌল অবস্থা— নিউট্রন, প্রোটন, ও ইলেকট্রন। দেহসাধকও শরীর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনটি গুণক্ষোভেরই কথা বলে থাকেন।

যুগলকিশোরের মন্দিরে একবার মেলার সময়ই হাজির হয়েছিলাম। জ্যৈষ্ঠর চড়া রোদে ঘামতে-ঘামতে ঠাকুরদালানে ওঠামাত্রই চোখ পড়ল প্রেমানন্দ বাবাজির। সাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে এনে বসালেন। বললেন, আগে ঠাণ্ডা হন। কথাবার্তা হবে সব পরে। নবদ্বীপের বাবাজিরা তো এসেছেন। আজ আপনার কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার একেবারে নিরসন হবে। গৌর হরি, গৌর হরি।

বলেই বাবাজি হাসলেন।

বিকেলে কৃষ্ণ- জিজ্ঞাসাই উঠে এল।

নবদ্বীপের এক বাবাজী বললেন, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ত্রিভঙ্গ কেন? কেন আমরা বলি ত্রিভঙ্গমুরারি?

— কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বাবাজি বললেন, আমাদের শরীরের তিন-তিনটে গুণ নিয়ে তিনি যে ত্রিভঙ্গ হয়ে রয়েছেন। কী এই তিনখানা গুণ?

বললাম— কী?

বললেন— সত্ত্ব, রজ, তম গো।

বললাম— একটু বিস্তারিত যদি বলেন। ধরতে আমার সুবিধা হয়।

— সত্ত্ব হল শরীরের নিত্যতা সব আমাদের। স্থূল দেহ। সবাকার স্থূল শরীরে নিত্য জাগ্রত যে তিনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে জেগে আছেন তিনি?

— উপলব্ধিতে, অস্তিত্বে সদা জাগৃত তিনি। ভগবানের জেগে থাকা রজগুণে। শরীরকে রাজসিক মায়ায়, বন্ধনে তিনি আবদ্ধ করে রাখেন। এই মায়াকেই তো কাটাতে হবে বাবা। রজগুণকে নাশ করতে হবে। তমগুণকেও তাড়াতে হবে। তবে না সত্ত্বগুণে কৃষ্ণ সাজবেন।

— তম বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?

— তম তো তমসা। অন্ধকারাচ্ছন্নতা। তমগুণ কেটে গেলে আলো আসবে। শ্রীমধুসূদনের আলো।

বাবাজির কথানুযায়ী শরীরের এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাতেই ভগবান প্রকট হন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও তিনটি গুণস্বরূপ মৌলের মধ্যে কোনও একটি যদি প্রবল হয়ে ওঠে তাহলেই সমতা নষ্ট হয়ে বসে। সমতার জন্যই সত্ত্ব, রজ, তম। নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন। শরীরে যেমন তিনগুণের প্রাধান্যতার মধ্যে যদি সত্ত্বগুণ সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে উঠে অপর দুই গুণকে সম্পূর্ণ ছাপিয়ে যায় তা হলে স্থূল শরীর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সাধক তখন শূন্যতা ও অতিশূন্যতার মধ্যে কেবল ঘোরাফেরা করতে থাকেন। ঠিক তেমনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই অতিশূন্যতার (supuvoid) ভেতর নিশ্চল স্ফুটন কণা ঘোরাফেরা করতে থাকে। শক্তিপূর্ণ শূন্যতা (void) যখন বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা নিয়ে তৈরি হয়ে ওঠে তখনই সার্বিক অবস্থা থেকে ত্রিভঙ্গ হয়ে যায় বাহ্য দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না ঠিকই। কিন্তু কৃষ্ণকে শরীর দিলে আর পুরুষকে অতিশূন্যতা ও শূন্যতার মধ্যে রাখলে প্রকৃতি (শক্তি) সংযোগে তা তো ত্রিভঙ্গই হয়ে ওঠে। সেজন্যই বলা হয় যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ত্রিভঙ্গ। প্রকৃতি-পুরুষের সহাবস্থান। ভগবান ত্রিভঙ্গমুরারি।

কৃষ্ণের গায়ের রং যে কালো তার যুক্তি এখানে উঠে আসে। অতিশূন্যতা, শূন্যতা— এর কি কোনও বর্ণ থাকতে পারে? শূন্যতা সব সময়ই কালো বা কৃষ্ণই হয়। শরীর যখন শূন্যাবস্থায় চলে আসে তখন তা তো কৃষ্ণ বা কালোই হয়ে যায়। ভরতীয় আধ্যাত্মবাদে শূন্যতা বা পরম শূন্যতার প্রতিমূর্তিকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়ে থাকে। অতিশূন্যতার মধ্যে নিশ্চল স্ফুটনের কণাকে অনায়াসে আমরা চিৎ বলতে পারি। শূন্যতা যেমন শক্তিপূর্ণ হয়ে বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা সৃষ্টি করে ফেলে, তেমনই শরীরব্রহ্মাণ্ডে অতিশূন্যতার মধ্যে শূন্যতার আঘাতে জ্যোতিস্বরূপ যে আনন্দবিন্দুরূপ ফুটে ওঠার কথা বলে থাকেন সাধক তাকেই তো আধ্যাত্মবাদে সচ্চিদানন্দ বলছেন। বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিক্রমে সাজালে সচ্চিদানন্দ হয় সৎ + চিৎ +আনন্দ (নিউট্রন+প্রোটন + ইলেকট্রন)। আনন্দকে জ্যোতি বা আদি অপরিচ্ছন্ন প্লাজমাও বলা যায়। আজ্ঞা চক্র থেকে সহস্রার চক্রে গিয়ে যখন কুলকুণ্ডলিনী পৌঁছয় তখন কোনও রকমের স্বতন্ত্র সত্তাবোধ থাকে না। ব্যক্তি তখন বিশ্বসত্তাতে সামিল হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন শরীরব্রহ্মাণ্ডে এসে ধরা পড়ে। বাবাজি কৃষ্ণকে সেই শরীরের সারবত্তাই দিতে চেয়েছেন আর যোগমায়া ভৈরবী যে বাঁশিকে শরীরের ছয়টি চক্রে সাজিয়ে বাজাবার কথা বলেছেন তা কিন্তু দেহবিজ্ঞানেরই নামান্তর।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একান্নটি ধাপে Big Bang থেকে সৃষ্টি হওয়ার কথাই বলা হয়। এই একান্ন ধাপ বা স্তরের মধ্যে ছয়টি অতি স্থূল স্তরের কথা বলা হচ্ছে। যে স্তরগুলোকে যোগমায়ার বলা শরীরে ছটা চক্র হিসেবে অনায়াসে দেখতে পারি আমরা। এটাই যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিকোণ। এই ছয়টি স্তর আবার সাতটি সূক্ষ্মস্তরে বা ধাপে বিভক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে দাঁড়াল (৬×৭=৪২) টি সূক্ষ্ম স্তরভাগ। যোগশাস্ত্র বলছে যে, আজ্ঞা চক্র হল গিয়ে এমন এক চক্র ব্রহ্মরন্ধ্রের ওপরও যার স্থান। বিজ্ঞান বলছে শূন্যতার ঊর্ধ্বদেশে আরও সাতটি স্তর আছে। যাকে বলা হচ্ছে এসেন্স। তাহলে ধাপটি এখন কিন্তু দাঁড়াচ্ছে (৪২+৭=৪৯)। এর উপর দুটি পর্যায়ের কথাও বলা হচ্ছে। এক, অতি শূন্যতা। দুই, সেই নিশ্চল বিস্ফোরণের বেগ। আধ্যাত্মবাদে যা কিনা সৎ আর চিৎ। ৪৯-এর সঙ্গে এই ২ যোগে দাঁড়ালো ৪৯+২=৫১। এই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একান্নটি ধাপ, স্তর বা পর্যায়। তবে সাধারণত জীবের পক্ষে অনুভবযোগ্য ৪২টি ধাপ। অর্থাৎ হল গিয়ে মূল ছয়টি ধাপ। এই ছয়টি ধাপই ভৈরবী মায়ের বলা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিরূপ। বলা হচ্ছে যে, Big Bang থেকে যে শব্দ উঠেছিল সেই শব্দ থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি। সেই শব্দই সূক্ষ্ম থেকে স্থূল তানে ছয়টি ধাপে বস্তুজগতকে নাচিয়ে ছাড়ছে। বাঁশির শব্দ এই পৃথিবী উদ্ভূত

শব্দঝাঙ্কারেরই প্রতীকীরূপ। যার মধ্য দিয়ে ওঁ সুরছন্দ নৃত্যায়িত হচ্ছে। ওঁ-কেই বলা হচ্ছে আদি শব্দ। এই শব্দ বা অনেকে বলছেন নাদ, বিশ্বের ষড়রন্ধ্রে প্রবাহিত। এই ষড়রন্ধ্রকে আমরা শরীরবিশ্বে ষট্ চক্র হিসেবে দেখতেই পারি। সাধক তাই বলতে পারেন, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ষড়রন্ধ্রে আঙুল রেখে বিশ্বপ্রকৃতিকে চুপিসাড়ে বাজিয়ে চলছেন। আর সেই বাজনা যোগমায়া ভৈরবীদের মতো সমতানের মানুষজন ছাড়া আমরা কেউই শুনতে পারি না। তা শোনা সাধারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে আসলে কখনই সম্ভবপর নয়। এরজন্যই ভাবেন্দ্রিয়ের দরজাকে খুলে রাখতে হয়। আমরা সবাই যে তা পারি না।

মা-কে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কৃষ্ণ কী তাহলে মা?

মা উত্তর করলেন, কী আবার! কৃষ্ণ হলেন আমাদেরই স্থূল দেহ। সাধকের স্থূলদেহ নাশ হলে রজ, তম গেলে সত্ত্ব জাঁকিয়ে বসলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, আর রাধা?

বললেন— সূক্ষ্ম দেহে শরীরে কৃষ্ণ এলে সে কি আর রাধা ছাড়া থাকতে পারে বল? নারী ছাড়া পুরুষ অথর্ব। নারী জরা মারে পুরুষের। সূক্ষ্ম শরীরে কৃষ্ণ এলে শক্তি জাগে নারীর সহায়তায়। কৃষ্ণের নারী কারা?

জিজ্ঞাসু চোখে মা আমার দিকে তাকালেন। আজ মায়ের শরীর চন্দনচর্চিত। ভৈরবীর সেই লাল বসন এবেলা খুলে রেখেছেন মা। আজ যোগিনীর বেশ। গেরুয়া। রুদ্রাক্ষের দাপটও নেই বুকের ওপর। কণ্ঠিতে জড়িয়ে রেখেছেন কিছু তুলসীর মালা। কপালের জ্বলজ্বলে গোল টিপে চন্দনের কোলাহল। হাত ভর্তি পলা নেই। শরীর থেকে ভুরভুর করে চন্দনের সুবাস বেরোচ্ছে। ভৈরবী আজ বৈষ্ণবী হয়ে উঠেছেন। আমি সেই পরিমণ্ডলের দ্যোতনা পেতে-পেতেই মা-কে বললাম, কৃষ্ণের নারী গোপিনীরা আর রাধা নিজে।

খুশি হলেন যেন মা আমার উত্তরে।

— তুই কি আর ভাবগোপী, ভাবরাধাকে মানবি? তোর রাধা হতে হবে পরীক্ষিত। যুক্তিগত। ভাব তো তোর কাছে ভেক। তা নয় রে, তা নয়। ভাব তো তোর কাছে ভেক। তা নয় রে, তা নয়। ভেক থেকেও সঞ্চার আসে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা আছে না, মন্দিরে যেতে-যেতে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। ভেক তেমনি রে। লালই বল আর গেরুয়াই বল সব ভেকেই সুর থাকে।

— কীসের সুর?

— লালে থাকে শক্তির সুর। তেজঃপদার্থ। শরীরকে ব্রহ্মাণ্ড করতে বাহ্যিক লালের ভেক লাগে। ভেকই ঠাকুরের কথার সেই অনুরাগ মেলে ধরে।

— আর গেরুয়ার নিশ্চয়ই বলবেন থাকে হল ত্যাগের সুর?

ভৈরবী আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, জাতীয় পতাকার রঙের মূল্যতে সব কি হয় রে? বইতে পড়ে ভারত-ভূগোল চিনি আমরা। কতটুকু জানি দেশের বিস্তার। সাধনাও একটা দেশ। এই দেশের মূল্য এখনও আবিষ্কার হয়নি রে পুরোপুরি। সাধক একটু-একটু করে দেশ দেখাচ্ছে। সে দেশে শক্তির সঙ্গে প্রেম থাকে। ত্যাগ তো সাধকের দেহগঠনের সময় হয়। রিপু মারা হয়। পঞ্চতত্ত্বে শরীরে দেশ জেগে ওঠে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ছাড়া দেশ দেখাতে পারবি তুই? পারবি না। আর দেশে শক্তির পাশে প্রেম দরকার। প্রেম ছাড়া কিছু কি হয়? প্রেমকে তাই শক্তি বলে লোকে। গেরুয়ার সুর প্রেমের। যা পরলে প্রেমবৈরাগ্য হয়। সে বৈরাগ্য এলেই রাধা বোঝা যায়।

— রাধা তাহলে কী? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

যোগমায়া ভৈরবী বললেন, রাধা, গোপী সব নাড়ি রে। নাড়ি। যোগনাড়ি। রাধা যেহেতু কৃষ্ণশক্তির প্রধান দোসর, সেহেতু শরীরের প্রধান এক নাড়ি হল গিয়ে রাধা।

— নিশ্চয়ই আপনি সুষুন্মার কথা বলছেন।

— তাছাড়া কী? তোর তো আবার যুক্তি চাই। সাধক ভাব আর যুক্তিকে সঙ্গে রাখে। জ্ঞানী রাখে কেবল যুক্তিকে। তাই আধ্যাত্মপথে দিশেহারা হয়। সব জিজ্ঞাসা কী আর যুক্তিতে নিরসন হয়। জীবনের দুঃখ-কষ্ট-প্রেম-হতাশাকে কোন যুক্তিতে সাজাবি? সেখানে কেবল একটি যুক্তি খাটে জানিস। সহ্যযুক্তি। পরীক্ষার জায়গা নেই সেখানে কোনও। সুষুন্না প্রধান তিন নাড়ির মধ্যে সর্বপ্রধানা। এর গর্ভে বজ্রাণী নাড়ির জন্ম। শিশ্নদেশ থেকে শিরঃস্থান পর্যন্ত তার জায়গা। বজ্রাণীর মধ্যে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,শিব আছে।

বললাম— ও তো আপনাদের প্রতীক।

বললেন— মা-কে তো তুই মা-ই ডকিস। এই ডাক শুনে শুনে তুই শিখেছিস। বাবা, কাকা, পিসি, মামা সবই তোর শুনে শেখা, চেনা। এগুলো মানতে পারিস আর ভগবান মানতে তোর যত পরীক্ষা। অঙ্ক যখন করিস বীজগণিতে তখন তো প্রতীকই ধরিস x y z, ভগবান তবে নয় কেন? অঙ্কে প্রতীকে উত্তর হয় আর ভগবান প্রতীক নিলে যত দোষ। সম্পর্ক তো প্রতীক। বাবা-মা-বউ-বোন-প্রেমিকা— সবই তো ডাক অনুযায়ী আধার পায় সেই অনুসারে ভাব, ভাষা সব আলাদা। মা যখন শিশুকে স্তন দেয় আর স্বামীর হাতে সেই একই প্রত্যঙ্গ তুলে দেয় তখনকার দুই সাড়া তো আলাদা। মাতৃভাব, কামভাব একই শরীরে। শক্তি তো নামে আর কার্যে পৃথক হয়।

— সুষুম্না রাধা কর্মযোগে তাই-ই বলছেন আপনি?

— তাই তো। বজ্রাণীর মধ্যে আবার আদি ও অন্তে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দ্বারা আবৃত অতি সূক্ষ্ম চিত্রাণী। এই চিত্রাণীতেই চক্রপদ্মের সমাহার। এখানেই ব্রহ্ম নাড়ি। যা মাথার সহস্রদল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। সহস্রদল থাকে শরীরের শেষ পদ্মচক্রে। সহস্রারে। এই পদ্মচক্রেই শরীরের নাশ হয়। পরমাত্মা বিরাজ করে। শরীর কৃষ্ণ হয়। আর তা হয় রাধার কারণে। সুষুম্না তাই রাধা। কৃষ্ণজীবনে গোপীদের প্রেম ও সাড়া আর রাধার— দুটো তো আলাদা। রাধা প্রধান প্রেমের সহায়ক। রাধা তোলপাড় তোলে। জ্বলে। ক্ষয়। শোকে-দুঃখে-বিরহে-যাতনায় তার মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণ-পাওয়া। সুষুম্না রাধার মতোই স্থূল শরীরকে সূক্ষ্ম করতে সব ঝড়-ঝাপটা ধারণ করে। শরীর সূক্ষ্ম হলেই কৃষ্ণ হয়। আর তাকে কৃষ্ণ হতে সাহায্য করে কে? রাধা।

মায়ের এই যুক্তি যোগসম্মত যুক্তি। 'শিবসংহিতা'-য় বলছে যে, আমাদের শরীর কার্যক্ষম হওয়ার জন্যেই মূলাধার চক্র থেকে প্রধানত সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ি উৎপন্ন হয়ে অস্থিময় দেহের উপর ওতপ্রোতোভাবে পরিব্যপ্ত হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজগুলোকে চালনা করছে। এই সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ির মধ্যে চোদ্দটি নাড়ি আবার প্রধান— 'সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যং সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্। /প্রধানভূতা নাড্যস্তুতাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥' সেই চোদ্দটি নাড়ি হল: ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বদরী ও যশস্বিনী। এই চোদ্দর মধ্যে আবার প্রধান তিন ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না। সাধক এই চোদ্দ নাড়িকে পুণ্যনদী মনে করে নদী নামেই এদের অভিহিত করেছেন। কুহূকে বলছেন নর্মদা। শঙ্খিনী হল তপ্ত নদী। গোমতী অলম্বুষার নাম। গান্ধারীকে বলছেন কাবেরী নদী। পূষা নাড়ি তাম্রপর্ণী নদী। হস্তিজিহ্বা নাড়ি সিন্ধু। একে কিন্তু নদী হিসেবেই দেখছেন সাধক। নদ নয়। নাড়িতেই যেহেতু শক্তির জাগরণ হচ্ছে আর শক্তিকে প্রকৃতি মানছেন সাধক তাই নাড়িগুলো তাঁদের হল সব নদী। নদ নয়। ইড়াকে সাধক বলছেন গঙ্গারূপা। পিঙ্গলা নাড়ি যমুনাস্বরূপা। সুষুম্না সরস্বতী নদী হলে তা কীভাবে রাধাস্বরূপা হয়? ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি।

বলেছিলেন, সরস্বতী হল জ্ঞানের নদী। জ্ঞানতটিনীই তো ষট্‌চক্র ভেদ করে অগ্রসর হয়। সাধকের অন্তরে সৎ চৈতন্য-নদী নদী সরস্বতী। যা বাইরে প্রকাশিত হয়েছে। সরস্বতীকে কী মনে হয় তোর?

বললাম— আপনার মত ধরলে জ্ঞান-প্রাচুর্যের দেবী হলেন সরস্বতী।

— আমার মত কী? এ তো যুক্তিমত। সরস্বতী বাগ্দেবী কেন?

বললাম— কেন?

— কেন? এত পড়াশুনা করা ছেলে তুই, এটা জানিস না? বাক্যের থেকেই জ্ঞান আসে। জ্ঞান বাক্। সেজন্যই বাক্যের দেবী হলেন সরস্বতী।

মায়ের এই মতকে যোগসম্মত বাস্তবের দিকেই ঠেলে দেওয়া যেতে পারে। আর সরস্বতীকে বা সুষুম্নাকে রাধা বলার পক্ষে মত যেটা হয়, তা হল: সাধক তো সুষুম্নার শ্বাসক্রিয়াতেই অপরিহার্য সূক্ষ্ম কৃষ্ণময়তাকেই পাচ্ছেন। সেটা পেতে রাধার যেমন অপরিহার্যতা রয়েছে কৃষ্ণসত্তায় তেমনই সুষুম্নার প্রয়োজনীয়তাই তো যোগক্রিয়ায় প্রধানা ভূমিকা নিয়ে নিচ্ছে ওই কৃষ্ণজীবনে (এক্ষেত্রে সাধকের জীবনে) রাধার মতোই। ভৈরবী তাই সুষুম্নাকেই রাধা বলেছেন। সুষুম্নাই আবার সাধক অভিহিত সরস্বতী নদী। এরও কারণ আছে। 'সংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে' আছে: 'বাগ্বৈ সরস্বতী বাচমেব তৎ প্রীণাতি'— বাক্ই সরস্বতী, ইহা বাক্কে প্রীত করে রাখে। বাক্কে ক্রিয়া হিসেবে দেখা যেতেই পারে। বাক্ হল জ্ঞান। বাক্যকে আশ্রয় করেই জ্ঞান গড়ে ওঠে। সাধকের সংযমী সত্তাকে সরস্বতী ধরলে সাধক তো তাকে সুষুম্নারই শ্বাসক্রিয়াতে আয়ত্ব করতে থাকেন। জ্ঞান-তটিনী যখন ষট্চক্ররূপে শেষ পদ্মচক্র আজ্ঞা চক্রে আসে তখনই সরস্বতী স্বমহিমায় বিরাজিত হন সাধক শরীরে।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে শ্বেতবর্ণ দ্বিদল বিশিষ্ট আজ্ঞা পদ্মের কথা বলেন দেহসাধক। এই আজ্ঞা চক্রের উপরেই তো ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার মিলনস্থল। সাধক বলেন ত্রিকূট বা ত্রিবেণী। শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে যে— 'অন্তঃ স্নানবিহীনস্য বহিঃস্নানেন কিংফলম্!' অন্তস্নান বিহীন ব্যক্তির বাহ্যস্নানে কোনও ফল নেই। গুরুর শেখানো যোগকৌশলে সাধক শরীরের মধ্যস্থিত ত্রিবেণীতে স্নান করেই মুক্তিলাভ করেন। এই মুক্তি হলেই শরীরের স্থূলতা নষ্ট হয়। সূক্ষ্ম শরীরে সাধক বিরাজ করেন। শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে, এলাহাবাদে ত্রিবেণীতে সকলে কষ্টোপার্জিত পয়সা ব্যয় করে এবং শারীরিক ক্লেশ স্বীকার স্নান করতে যান, কিন্তু ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলে যদি মুক্তি আসত, তাহলে সেখানকার জলে জলচর কোনও জীবজন্তু থাকত না। সকলেই উদ্ধার হত। আসল মুক্তি হল সাধকের স্থূল শরীরের। তার জন্যই যোগচক্র। আজ্ঞা চক্রে ত্রিবেণীর ঊর্ধ্বে সুষুম্নামুখের নীচে অর্দ্ধচন্দ্রকার মণ্ডলের কথা বলে থাকেন সাধক। আর কল্পনা করেন, এই অর্দ্ধচন্দ্রের উপরে তেজঃপুঞ্জস্বরূপ একটি বিন্দুর। বলেন, ওই বিন্দুর উপরে ঊর্ধ্বাধোভাবে দণ্ডকার নাদ থাকে। যা কিনা দেখতে অনেকটা দণ্ডায়মান তেজোরেখার মতো। তার উপরে রয়েছে কল্পনার শ্বেতবর্ণ একটি ত্রিকোণমণ্ডল। এখানেই শক্তিরূপ শিবাকার শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। আসলে যেটা হয়, বায়ুর ক্রিয়া শেষ হয়ে পড়ে। সাধকের দিব্যযোগ ঘটে

বলা হয়। যোগের চরম ফলে হিতাহিত দশা নাশ হয়। সাধক বলেন নির্বাণ প্রাপ্তির কথা। বলেন এখানেই পরমাত্মার স্বরূপ বোঝা যায়। সেজন্যই আজ্ঞা চক্র জ্ঞান পদ্ম। এই জ্ঞানের সঙ্গেই সংস্রব ছিল বলেই একদিন স্থূল এই সরস্বতী নদী সাধকদের, যোগীদের, তপস্যীদের সুষুম্না নাড়িরূপ মানস নদী হয়ে ওঠে। আর এর থেকেই ভারতীয় দেবদেবীর জগতে ব্যক্তিরূপ নিয়ে দেবী সরস্বতী বিদ্যার দেবী রূপে অর্বিভূতা হয়ে পড়েছেন। 'ঋগ্বেদে' আবার দেবী বাক্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছেন। বাক্ হলেন বাক্যের দেবী। সেই দেবী হিসেবে তিনি বাগ্দেবী হিসেবেও সমাদৃতা হয়েছেন। বাক্‌কে আমরা ধরতে পারি মহাশূন্যে প্রথম বিস্ফোরণজাত ধ্বনি। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদে এর চিহ্নকরণ হয়েছে ওঁ বলে। শব্দ ব্রহ্মাণ। বলা হয়ে থাকে এর থেকেই সংস্কৃত একান্ন বর্ণের উৎপত্তি। তাহলে তো বলা যেতেই পারে বাক্ থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয়। এই বাক্ বা জ্ঞান অশ্রুত, দৃষ্ট, মধ্যম, শ্রুতি, ও স্থূলরূপে রয়েছে বলা হয়। শব্দের যে চারটি পর্যায় পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী— এগুলো সবই ধরা হয় বাক্ বা জ্ঞান হতেই উদ্ভূত। সাধক এই শব্দসমূহকে বা জ্ঞানরূপী সরস্বতীকে কীভাবে জাগ্রত করে থাকেন? শরীর বিকাশে সরস্বতী কীভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন? যোগমায়া ভৈরবীও যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিষয়টি এভাবে দেখা যেতেই পারে: কুলকুণ্ডলিনী যখন মূলাধার চক্রে শরীরের সর্বনিম্ন স্থানে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন সাধক শব্দ উচ্চারণ করতে থাকেন সশব্দে। এই সশব্দ শব্দকে তাঁরা বলেন বৈখরী। বিখর শব্দের অর্থ হল কঠিন। অর্থাৎ শব্দের বা শরীর ক্রিয়ার এই পর্যায় কঠিন। কঠিন বা বিখর থেকেই বৈখরী— শব্দের একটি পর্যায়ের রূপ নিয়ে নিয়েছে। কুলকুণ্ডলিনী যখন সূক্ষ্মতরে বিরাজ করতে থাকেন তখন সাধকদেহে নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হতে থাকে। সাধক বলেন দিব্যদৃষ্টি। শব্দের এই পর্যায়ে রয়েছে পশ্যন্তি বা দৃষ্ট। আর সাধক যখন তাঁর শরীরের সূক্ষ্মতাকে মধ্যম স্তরে নিয়ে চলে যান, যেটা ঘটে থাকে পশ্যান্তির আগে— সেটাই হল মধ্যমা শব্দপর্যায়। পরা হল সাধকের শেষ supervoid অবস্থার শব্দ। ওঁ শব্দ দ্বারাই ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞরা শব্দের চারটি পর্যায়ের কথা বুঝিয়েছেন। এই ওঁ বাক্যের দ্বারাই উদ্ভূত বলেই সরস্বতী হলেন জ্ঞানের দেবী। ওঁ জাত বর্ণসমূহই সৃষ্টি করে থাকে। শব্দসমূহ থেকে বাক্যের প্রকাশ। এর থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত— প্রতিটি সৃজনশিল্প এই ওঁ থেকেই এসেছে। সেজন্যই বাগ্দেবী হিসেবে সরস্বতীর আধুনিক যুক্তিরূপ ফুটে উঠেছে।

সরস্বতীর বর্ণ সাদা। যাকে সাধকগণ অভিহিত করেন শরীরের শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বলেই। দেবীর কখনও দুই বা চার বাহু। দুই বাহুতে তিনি বীণাবাদনরতা। চার

বাহুতে, তাঁর ডান দিকের এক হাতে পদ্ম অপর হাতে দেওয়া হয়েছে জপের মালা। বাঁ দিকের এক হাতে পুস্তক অপর হাতে আখের দণ্ড। এইসব প্রতীকী। পুস্তক জ্ঞানের। আখের দণ্ডটিকে সৃষ্টিদণ্ড বা পুরুষাঙ্গ হিসেবে দেখা যেতেই পারে। পদ্মটিকে এক্ষেত্রে যোনি করে নিলে সরস্বতী দেহগত প্রত্যঙ্গেই সামিল। আর বাকি রইল তাঁর বাহন হংস। হংসকেও সাধক জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে দেখে থাকেন। হংস পাখিকে দুধ ও জল মিশিয়ে দিলে তারা জল বাদ দিয়ে দুধটুকু খেয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ হংসের আছে সার সংগ্রহের ক্ষমতা। সারকে জ্ঞান হিসেবে দেখলে সে অনায়াসেই সরস্বতীর বাহন হতে পারে। আরও বাস্তব তাওপর্য হল হংসের: শরীর ক্রিয়ার সময় যে শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্ভূত ধ্বনি তাকে যদি কুম্ভক যোগ বা প্রাণায়ামে রেখে দিতে পারেন দেহসাধক, তা হলে ছন্দময় শ্বাসে আসে 'হং' 'স'। আর এই কুম্ভকেই সাধক জগতব্যাপী যে পরম ছন্দময় একমাত্রার একটি তার রয়েছে, যার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। জ্ঞানী হয়ে তিনি পরমহংস উপাধি পান। শিল্পে জ্ঞানের বর্ণ করা হয়েছে সাদা। সেজন্যই দেবীর বর্ণও সাদা।

মা যে রাধাকৃষ্ণের ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠবার কথা, জাগরণের কথা বলেছেন শরীরে তা সম্ভরপর ক্রিয়া। কৃষ্ণলীলার কাহিনিগুলোকেও যদি শরীরী যুক্তিক্রমে সাজানো যায় তাহলে দেখব যে, রাধাকৃষ্ণ যথার্থই শরীরক্রিয়া।

আমাদের শরীরে দুই ধরনের বায়ুর ক্রিয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণ বায়ু ও আপন বায়ু। প্রাণ বায়ুকে শ্বাস হিসেবে নিয়ে থাকি আমরা। এতে দেহের কুলকুণ্ডলিনী উর্ধ্বে উঠে পড়ে। ইংরাজীতে বললে বলতে হয়, potential energy সাধক বলেন এই potential energy বা কুলকুণ্ডলিনী নীচে নেমে যায়। ফলে মন স্থূল জগতের দিকে আকৃষ্ট হয়, চলে যায় বা ধাওয়া করে। আপন বায়ুকে তাই যাওয়ার বা ধাওয়া করার 'ধা' প্রতীকে সাজালে প্রাণ বায়ুকে স্বভাবতই 'রা' প্রতীককে দিতে হয়। এই হল গিয়ে শরীরস্থ 'রাধা'। শরীরের মধ্যে এভাবেই প্রাণ ও আপন বায়ুর ক্রিয়ার অহরহ রাধা নাম চলছে। এই রাধা তত্ত্বকে সাধক দেখছেন জগৎ তত্ত্ব হিসেবে। যেখানে বন্ধন ও মুক্তি দুটোই রয়েছে। 'ধা' তে রয়েছে স্থূলতার বন্ধন। 'রা' তে সূক্ষ্মতার অনুভূতি। যা হল গিয়ে মুক্তিস্বরূপ। রাধাতত্ত্ব হল দিব্যলীলার আনন্দানুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সাধক বলেন রাধাতত্ত্ব ভেদ হলে পুরুষতত্ত্ব উঠে আসে। রাধাকে মহাপ্রকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করাই যায়। গোপীদের বলা যায় বিশ্বপ্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতিই ছন্দে ছন্দে নাচ করছেন। পুরুষ সেই ছন্দের তরঙ্গে আনন্দবোধ করছেন। পুরুষ কী? পুরুষ হল সাধকের সূক্ষ্ম শরীর যার জন্ম হয়েছে অহরহ সেই রাধা নামে। স্থূল শরীর এতে ভস্মীভূত হয়ে সূক্ষ্মানুভূতির শরীর

'কৃষ্ণ'-র জন্ম হয়েছে। এতে রাধার ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনই গোপীদেরও। শরীরের তিন বিশেষ নাড়ির মধ্যে সুযুম্না যেমন রাধা: যোগমায়া মা তাই-ই বলেছেন কিন্তু, তেমনই সাধকমতে আবার ৭২০০০ নাড়ির কথাও বলা হয়ে থাকে শরীরে। এর মধ্যে ১৬০০০ নাড়ি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যার মধ্যে ১০০ নাড়ি বলা হয় কুণ্ডলিনীযোগে মূল্যবান। সাধক শরীরে যখন কৃষ্ণের জন্ম হয় অর্থাৎ কিনা সাধক যোগক্রিয়ায় স্থূল শরীরের আবরণ খসিয়ে যখন সূক্ষ্ম শরীরে পরম শূন্যতার ভেতর বিরাজ করেন, তখন এই নাড়িগুলো সবই আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। প্রত্যেক নাড়িই মনে করে যে, একাই সে কৃষ্ণলীলাকে আস্বাদন করছে। এই লীলাই হচ্ছে কাহিনিকল্পের পক্ষে যুক্তিগত রাসলীলা। তাহলে এখানে যেটা দাঁড়াল এক রাধা বা সুযুম্না ছাড়া বাদবাকি সব নাড়িই হল গিয়ে কৃষ্ণের গোপীবৃন্দ। কৃষ্ণ যাদের সঙ্গে লীলা করেছেন। যে লীলাকে শরীরক্রিয়ার যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। 'গোপীর' 'গো' কে যদি বিশ্বপ্রকৃতি ধরি বা দেখি তাহলে বিশ্বপ্রকৃতিই কৃষ্ণকে আপ্যায়িত করছে কিন্তু। গো = বিশ্বপ্রকৃতি। পী = আপ্যায়াতি ইতি পী। বিশ্বপ্রকৃতি এখানে শূন্যতাকে কাছে টানছে। যার থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই লীলা বর্ণময় উৎসবসমই। একে তাই হোলি উৎসব বলা যেতেই পারে। বঙ্গে যা দোল উৎসব। রাবীন্দ্রিক অভিধায় বসন্তোৎসব। একে আবার উৎসবাগ্নির বাতায়নের নৃত্য হিসেবেও দেখা যেতে পারে। হোলিকে আমরা বলতে পারি বিশ্বসৃষ্টির ছন্দায়িত তরঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়া। প্রকৃতি যখন তার বিস্ফোরণজনিত শূন্যতাকে কালোকে, কৃষ্ণকে বুঝতে পারেক তখনই সে আনন্দে তরঙ্গায়িত হয়। উৎসবে মাতে। যাকে আমরা বলছি যুক্তিপন্থার শারীরিক হোলি বা দোল কিংবা বসন্তোৎসব। হোলির রং এখানে হল শরীর শূন্যতায় চলে যাওয়ার বিস্ফোরণজনিত শব্দ। যদিও হোলি উৎসব নিয়ে কল্পকাহিনির গল্প আছে। অসুর কন্যা হুলি ও তার পুত্র মেড়াসুরকে নিয়ে গোপীদের আবীর খেলার গল্প। গোপীরা যে যমুনার তীরে কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করতেন বা কৃষ্ণ যে গোপীদের সঙ্গে দুষ্টুমিতে মাততেন তারও কিন্তু শরীরী যথার্থতা এইরূপ: যমুনা হল সাধকের পিঙ্গলা। একে তাঁরা চন্দ্র নাড়িও বলেন। গোপীরা তো হল বাকি অন্যান্য নাড়ি। যোগে চন্দ্র নাড়ি যখন ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে তখন বাঁ নাকের শ্বাসক্রিয়ার ফলে শরীর বা সূক্ষ্ম পরমাত্মা বা কৃষ্ণ উজ্জীবিত ও সচেতন হয়ে পড়ে। সে অন্যান্য নাড়ির বা প্রতীকী গোপীদের বস্ত্র সব টেনে খুলতে থাকে। বাসনা বা কামনার বস্ত্র এসব। যার পাশ খুলতে পারলেই সাধক মনে করেন যে, পরমাত্মাকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ এভাবেই সাধকের শরীরে গোপীদের বস্ত্রহরণ

করেন। যোগযুক্তিতায় এই ছবিই ফুটে ওঠে। কৃষ্ণের কালীয় দমনও যোগে চিত্রিত হয় এইভাবে: কৃষ্ণ তো যমুনার মাঝখানে বিষাক্ত সর্প কালীয়কে দমন করেছিলেন। যমুনা হল সাধকের চন্দ্র নাড়ি। সাধক বা শ্রীকৃষ্ণ এই চন্দ্র নাড়ির সাহায্যেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে নিজের নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন। যাকে কালীয় দমন হিসেবে দেখা যেতে পারে।

বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণ পরম পুরুষ। কৃষ্ণের সমার্থক শরীরী উপমার কথা আমাকে একবার শুনিয়েছিলেন মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাঠের বলরাম বাবাজি। সান্ধ্য কীর্তনের পর একদিন কথা চলছিল তাঁর সঙ্গে।

বললেন— 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'-তেই আছে: 'আপন মাধুর্য হরে আপনার মন। /আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন'॥ কৃষ্ণ জানেন কি?

বললাম— আপনি বলুন। আপনার কথাই শুনতে এসেছি।

বললেন— কৃষ্ণ হল শরীর। শরীরের নাড়িযোগ সব। আমাদের শরীরে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ি রয়েছে। এই নাড়িক্রিয়া হল কৃষ্ণক্রিয়া।

বললাম— কৃষ্ণ তাহলে যোগ?

বললেন— অবশ্যই। ধ্যানযোগ। ভাবযোগ। ভক্তিযোগ। যাতে শরীরের কৃষ্ণ জাগৃতি পায় জানবেন। শাস্ত্রে বলেছে: 'কৃষ্ণকে দেখিতে মোর হৃদয় সতৃষ্ণ। /কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ॥ '

— আর রাধা? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— নাড়িই শরীরকে যেমন কৃষ্ণ করে তেমনই রাধা করে। রাধা কৃষ্ণের সমার্থক জানবেন। আলোদর্শন না হলে যেমন সূর্যদর্শন হয় না, তেমনই গুরুদর্শন না হলে কৃষ্ণ-দর্শনও সম্পন্ন হয় না। গুরুই কৃষ্ণ চেনান। আর কৃষ্ণকে চিনতে পারলে রাধার উপলব্ধি এমনিই আসে বুঝলেন। আমি কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক আর কারও আমি সেবক নয়— এই দিব্যজ্ঞান এলেই কৃষ্ণাশ্রয় হয়।

বাবাজি ভাসা-ভাসা বললেন সব। যেটা মনে হয়, গৌড়ীয়রা নামসেবা নামসেবা বলে তৎপর, নাম ভজনে এত ব্যাকুল ততখানি ব্যাকুল নন মোটেই যোগক্রিয়ায়। চৈতন্যের সর্বক্ষণ হরিনামের সারটুকু তাঁরা নিয়েছেন শুধু কিন্তু সারবস্তুর মধ্যে ছিল সন্ন্যাসীর কষ্টের আচরণীয় বিধি, আর্তসেবা এসবের ধার ধারেননি। চৈতন্যের আত্মপ্রসার ঘটেনি তাই স্বাভাবিক তাঁদের মধ্যে। মহাপ্রভুর যে জীবনজুড়ে সুদূরপ্রসারী কর্মধারা যেখানে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার মুমূর্ষ ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাটাকেই মেরামতি— সংস্কার ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে লোকশিক্ষায় তাঁর সেই মহৎ ব্রতের আখর গৌড়ীয়দের হাতে পরে আজ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। যার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের

সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচশো বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁদের হেলদোল কেবল কৃষ্ণসেবায়। যা যোগমায়া ভৈরবীর বলা শরীরক্রিয়াও নয়। যা কেবল কিছু সংকলিত, সংগৃহীত ও লিখিত বাণীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার সারবস্তু সেই গুরুসেবা, নামসেবা। সেবাপ্রবৃত্তি কেবল ভগবানের। আর্তের স্থান সেখানে কোথায়? এই কি চৈতন্যদেব কখনও চেয়েছিলেন? তাঁর জীবনপথ তো কোনওভাবে শুধু এর দিগ্‌নির্দেশ করে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাই এখন্য মহাপ্রভুর পার্থিব দেহকে পাশ কাটিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণদেহ মেনে নিয়ে মাতামাতি করেন বেশি। বল ভাল, তাতেই তাঁরা মজে রয়েছেন। তাই কৃষ্ণ 'শরীর' তাঁদের কাছে কেবল মহাপ্রভুর শরীরেই। যোগশরীরের আকার-প্রকার বলেন তাঁদের মধ্যে বলরাম বাবাজির মতো কেবলমাত্র কয়েকজন। সাধন আধারে তা না থাকলে বলবেনই বা তাঁরা কোথা থেকে শুনি? তাই সেখানে স্পষ্টতা নেই কোনও। যে স্পষ্টতা আবার বাউল সাধকের মধ্যে আছে। যদিও অনেকে তাঁদের সাধনপদ্ধতিকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। তান্ত্রিক পদ্ধতিও কিন্তু সেখানে সামিল। অনেকের কাছেই বাউলের সাধন সঙ্গিনীর সঙ্গে বসবাস এবং তন্ত্রে ভৈরবী সহবাস পাশ্চাত্যের সেই লিভ টুগেদারেই সামিল। গৌড়ীয় মতামতে, ভ্রষ্ট বৈষ্ণবদের বৈষ্ণবী নিয়ে সাধনাও অনেকটা এই অভিমত সামনে আনে। কিন্তু কথা হচ্ছে এইসব পথে, মতে ব্যভিচার বা কারও সদার্থক করে বললে যৌনাচারই সুপরিকল্পিত সিংহাবলোকন— এ যুক্তি এখনও এইসব লোকধর্মপথের বিবেচনায় শরীরের তালকেন্দ্রে এবং রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুভূতির অনপনেয় মুর্ছনাকেই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যার আসল উদ্দেশ্য বা যুক্তি ছিল মানুষের প্রাণপরিসরে শক্তিসাধনার রৈখিক ধারাবাহিকতাকেই শরীরের ধারাবাহিকতার ভেতরে-ভেতরে এরকম বহুমুখীনতায় জাগিয়ে রাখা। সেখানকার সৎ, শাশ্বত উদ্দেশ্যটি হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে কিছু অসংযমী মানুষের হাতে পড়ে। তাই বলে ধর্মপথটি কেবলই যৌনতার সম্ভোগ পর্যায়টি পুরোপুরি তুলে ধরে উদ্ভ্রান্ত সমাবেশে বরাবরই সামিল ছিল একথা কোনও বিবেকী মানুষ কখনও বলবেন না। শরীরের নামগন্ধকে এ পথে নিয়ে কথা বলতে গেলে আগে ভালভাবে ভালরকম শাস্ত্রানুসারে জানা প্রয়োজন। তবেই এই প্রান্তিক ধর্মপথের প্রাচীনতাকে অনুধাবন করা যাবে। নবীনতার কালবেলার দিকে, অবক্ষয়, যৌনচার, ভ্রষ্টাচার, ব্যভিচার ইত্যাদিতে তর্জনী তুলবার আগে দু'দণ্ড হলেও সময় লাগবে তখন। কেন না এখানকার যুক্তিক্রমে সৃষ্টির সুন্দর আকারের সুসামঞ্জস্য আছেই। যোগমায়া ভৈরবী তারই নির্দেশিকা দিয়েছেন আলোচ্য কৃষ্ণময়তায়।

হাটগোবিন্দপুরের বাউল দয়াল সরকারও সেই একইভাবে কৃষ্ণের শরীরী সদার্থকতাকেই স্পষ্ট করেছেন। যা গৌড়ীয় বাবাজি পারেননি। কিন্তু তাঁদের চিহ্নিত ভ্রষ্ট বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী পেরেছেন।

একবার এক মাথায় সাদা পাগড়ি ও গায়ে সাদা পিরান পরা বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা চলছিল কাটোয়াতে বসে। যাঁদের সর্বকেশ রক্ষাই রীতি। গৌড়ীয়দের মতো মস্তক মুণ্ডন করে টিকি রাখা তাঁদের ধর্মপথের অন্তর্গত নয় কখনওই। তাঁরা বলেন: 'নারী মধ্যে রাধা/কাপড় মধ্যে সাদা/কর্ম নাম সাধা।' এঁদের সাধনা হল রাধা, পরিধেয় বস্ত্র সাদা আর কাজও হল রাধার নাম সাধা। এঁরা তাই প্রথমে 'জয় রাধে জয় রাধে গোবিন্দ' বলে থাকেন। নিম্বার্ক মতের বৈষ্ণবরাও আবার রাধা নাম আগে বলেন। তাঁরা ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর বলেন এভাবে: 'রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। / রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে॥ ' তবে প্রাচীন এই ধর্মপথকে আবার গৌড়ীয়রা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গেই দেখছেন। কৃষ্ণ-অস্তিত্ব ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেমন অন্য কোনও দেবতার অস্তিত্বে সায় দিতে চান না কৃষ্ণই সৃষ্টিকর্তা নিরিখে, নিম্বার্কদের এমন মতাদর্শ নেই সেভাবে। তাঁদের আশ্রমে আমি রামভক্ত হনুমানের মূর্তি পূজিত হতে দেখেছি। অনেকে হয়তো বলবেন, এ তো হরিভক্তেরই প্রতিচ্ছবির পূজা, তথাপি গৌড়ীয়দের তাতেও তো সায় নেই। কাটোয়ার সেই ভক্তদাস বাবাজির দীক্ষা হল রাধামার্গের। আবার কালনার গৌরভজা সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব প্রাণকৃষ্ণ বাবাজি বলেছিলেন, গৌরই সাধনা, গৌরই আশ্রয়, গৌরই স্বামী।

— গৌর স্বামী হলেন কীভাবে? জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাজিকে। বৈষ্ণবীই তার উত্তর দিলেন আমাকে।

বললেন— গৌরগোবিন্দ পৃথিবীতে একা গোবিন্দ হলেন পুরুষ। বাকি সব মানুষজন প্রকৃতি তা আপনে পুরুষ হন আর নারী। প্রকৃতিভাব না এলে গৌরসাধনা সম্পন্ন হবে না আপনের।

— কীভাবে এই সাধনা হয়?

— ও যে করণক্রিয়া। শরীরের সর্বত্র সবসময় রাধানাম চলে। শরীর রাধা হয় প্রথমে। তারপরই গোবিন্দের চরণ পায়।

গুহ্যতা আর ভাঙলেন না বৈষ্ণবী। বললেন, করণক্রিয়া কইতে নেই সবার দ্বারে। গোবিন্দের দোরে এলে গুরু গোবিন্দস্বরূপ সব বলে-কয়ে দেন।

বুঝলাম বৈষ্ণবী করণক্রিয়া বলতে শরীরে কৃষ্ণময়তারই ইঙ্গিত রাখছেন। যে যুক্তিপন্থাতেই কথা বলছিলেন ভৈরবী মা। ভৈরবীর কাছে কালীর কৃষ্ণ হয়ে ওঠার

যুক্তি বা ভাবনাক্রম যাই বলি না কেন, সেই অন্তঃশরীরের মুকুরিত বিম্ব চরম চেতনের প্রগাঢ় রঙের বর্ণায়নের মধ্যে না এলে ব্যক্ত করা কখনওই সম্ভবপর নয়। ভৈরবী বোধহয় সেই গুরুকুলেরই কিছুটা হলেও সামান্যীকরণ আয়ত্ত্ব করে নিয়েছেন যা তখন পর্যন্ত জানা আমার কোনওভাবেই স্তবপর হয়নি। তবে প্রকৃত সাধক-সাধিকা নিজের সম্পর্কে রহস্যবিধুর আলোকায়ন তৈরি করে রাখেন ভৈরবীও এক্ষেত্রে তার কিছু ব্যতিক্রম নন। তবে তাঁকে উচ্চ মার্গের সাধিকা বলে মেনে নিতে আমার এখনও আপত্তি আছে। তাঁর হঠাৎ-হঠাৎ রেগে ওঠার ইন্দ্রিয়বত্তা, ছিন্নভিন্ন বিপদজনক লক্ষণ, কটূক্তির নানা ব্যক্তিপ্রকৃতির প্রতিবিম্বতে আর যাই উঠে আসুক না, তিনি যে চরম মার্গের মহাসাধিকা কখনও নন, তা স্পষ্ট। তবে সদর্থক গুরুকুলের অংশেভাগ যে তাঁর সাধনাপন্থাতে যুক্ত হয়ে রয়েছে, তা তাঁর চিন্তার সুন্দরায়নে এখনও পর্যন্ত বারবারই মুদ্রিত হয়েছে। শরীরের অভিধায় না হলে দেবদেবীর লক্ষ্যমাত্রা তিনি আনলেনই বা কীরূপে! স্বচ্ছতা, বোধ, শিক্ষা শাস্ত্রপাঠ— এসব বিশেষ চিহ্ন তাঁর ভেতরে না থাকলে কখনও যুক্তিক্রমে কথা ও কল্পনার জাদুকরীকে তুলে ধরা যায় না। যে জাদুতে শরীর প্রবণতা তীক্ষ্ণ। গাঢ়।

বাউলের কৃষ্ণময়তাতেও শরীর অঙ্গাঙ্গিভাবেই সংযুক্ত। দয়াল খ্যাপা আমাকে সেদিন বলেছিলেন, শরীর দিয়ে শরীর লেখার কথা। হাটগোবিন্দ পুরের বিখ্যাত বাউল সাধন দাস বৈরাগ্যের আশ্রমেই থাকেন দয়াল। আগে ছিলেন নবাসনে। হরিপদ গোঁসাইয়ের আখড়ায়। দয়াল সাধনস্তরের মানুষ। সুন্দর পদ লেখেন। বললেন, তাঁর কথা তো তিনিই লেখেন তিনিই আবার মুছে দেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কার কথা বলছেন আপনি?

— কেন খ্যাপা! শরীরের কথা। শরীর দিয়ে শরীর লেখার কথা। বাউল তো তাই করে গো। শরীরই তাঁর গয়া-কাশী-বৃন্দাবন।

বললাম— শরীর মথুরা নয়?

বললেন— বুঝেছি। আপনে আসলে ঘুরিয়ে কৃষ্ণকথা জানতে চাইছেন।

— কৃষ্ণ কী আপনার চোখে?

— কী আবার! দেহ গো, দেহ। শরীরের এই ঘরখানাতে কৃষ্ণর বসবাস।

বললাম— নাড়িগুলোর কথা বলছেন আপনি?

— তা নয় গো, তা নয়। নাড়ি কৃষ্ণ নয়। রিপু কৃষ্ণ।

— ষড়রিপু? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বললেন— ছয় রিপু, দশ ইন্দ্রিয়, চার চন্দ্র, তিন দিনের রজঃধারা দিয়ে কৃষ্ণ গঠিত। সাধক রিপু দমন করেন। ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করেন। চারচন্দ্রকে বশীভূত করেন। তবে না সঙ্গিনীর রজে, মহাযোগে তাঁর কৃষ্ণবস্তু রক্ষিত হয়।

বাউল কৃষ্ণবস্তুকেই কৃষ্ণ মানেন। সাধন প্রক্রিয়ায় বীর্যের ঊর্ধ্বগতি দানই তাঁদের হল গিয়ে বস্তুরক্ষা। কৃষ্ণরক্ষা। তার জন্যই সাধনযোগ। মহাযোগ। সঙ্গিনীর রজঃপ্রবৃত্তির তিনটে দিনকে বেছে নেন তাঁরা। রজঃস্রাবের সময়কে অমাবস্যা, অম্বুবাচী ইত্যাদি রূপক-এ ঢেকে রাখেন। শ্বাসক্রিয়ায় মূলত ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার চালনায় রেচক, পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়াম ক্রিয়ায় তাঁরা শরীরের বাইরের বায়ুকে ভেতরে টেনে পূরক করে ধারণ করে কুম্ভকে আবার তাকে বাইরে বের করে দেন রেচক ক্রিয়ায়। এই যোগপ্রক্রিয়াতেই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হলে লিঙ্গমূলের জমা বীর্য সঙ্গিনীর সঙ্গে সম্ভোগক্রিয়ায় যোনিদেশে না পড়ে মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠে যায়। সঙ্গিনীও একাধারে গুরুনির্দেশিত শ্বাস আর দমের কাজে সাধক বাউলের বীর্যগতিকে ঊর্ধ্বরেতা দিতে সাহায্য করে থাকেন। বীর্যরক্ষাই হল বাউল সাধনে কৃষ্ণবস্তু রক্ষা। সাধকের বীর্য আর সঙ্গিনীর রজ এই দুই বস্তুকে বাউল দেহ গঠনের মুখ্য হিসেবে ধরেন। শুক্র বা বীর্যের যে প্রাণকনা তা বাউলের কৃষ্ণবস্তু বা তাঁরা বলেন কৃষ্ণবিন্দু। সঙ্গিনীর রজর ডিম্বাণু তাঁদের কাছে রাধাবিন্দু। এভাবেই বাউল সাধনাতেও রাধাকৃষ্ণ শরীরময়। আসলে শরীরে শক্তির অনুশীলনই দেহসাধকের মূল মান্য বিষয়। ভৈরবী মা তাই ইন্দ্রিয়গত ও চিদ্‌গত অভিজ্ঞতার অনুশীলনে প্রথমদিনই আমাকে সামিল করেছিলেন। কিন্তু আমি সঙ্কোচে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম সেই সময়। বলা ভাল, ভয়ও পেযেছিলাম, না হলে আমার শরীর কাঁপছিল কেন?

বিকেল-বিকেল বেশ হাওয়া ছাড়ছিল যবনের আখড়ায়। দুপুরের বেইজ্জতি সদানন্দ বাবাজির মধুর ব্যবহারে খানিকটা হলেও আলগা হয়ে এসেছিল। মনে মনে ভাবলাম, ও যেন আখড়ার বৃন্তচ্যুত কাঠটগর। হাওয়ার দোলায় এখন যেমন খসে-খসে পড়ছে। ইত্যবকাশে বৈরবী মায়ের কিন্তু ডেরা ছেড়ে গঙ্গাস্নানে বেরোবার সময়ও পার হয়ে যেতে থাকল। বাবাজি তো সেরকমই কালক্ষেপ উল্লেখ করেছিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হওয়ার জোগাড়। আখড়ার সান্ধ্যকালীন ক্রিয়াকর্মের সময়ও আগত। বাবাজি তাই ব্যস্ত হওয়ার আগে বলে উঠলেন, আজ বোধহয় উনি আর স্নানে যাবেন না। এখনি খোল-কর্তাল বাজবে। আর উনি বাঁশবেড়ার ধারে এসে তর্জন-গর্জন করবেন। গাল পারবেন।

একসময় সন্ধ্যাও মজে গেল। খোল-কর্তালের দাপটে ম-ম বৈষ্ণব আখড়ার তেজও যে কমে গেল। মা আমার তেজময়ী হলেন কই! বাবাজি বললেন, রাতে আর ঠাঁইনাড়া হবেন কোথায়! এখানেই প্রসাদ পেয়ে থেকে যাবেন। যদিও আমাদের ঘর কম। একটু তো অসুবিধে হবে আপনার।

বললাম— শ্রীগোবিন্দের ঘরে সমস্তরকম অসুবিধে সুবিধে হয়ে ওঠে। এ তো আপনারই কথা।

বাবাজি দেখলাম খুশি হলেন।

বললেন— গৌর গৌর।

চলে গেলেন রাতের ভোগের দরকারী তদারকিতে। ভক্ত-শিষ্যও আস্তে-আস্তে কমে যেতে থাকল। ভাবলাম, যে আশায় এতদূর ছুটে এলাম আজ— সে আশা আজ আর পূরণ হওয়ার নয়। দুপুরের অপমান আমার মধ্যে ঝাঁঝিয়ে উঠল। ঠিক এমন সময়ই ভাবনার মৃদুচর্চার প্রস্বরটি খানিক নাড়া খেল যেন। মন সরে এল বাস্তবিক নিরীক্ষণে দু'একজন ভক্ত-শিষ্যের কথকতায়।

একজন বললেন, মা গেলেন গঙ্গাস্নানে।

আমি তৎক্ষণাৎ-ই হিতাহিত শূন্য হয়ে পিছু নিলাম তাঁর। শুনশান পথ। পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যা একটু পেরোতেই রাত নেমে আসে। তাঁতিবাড়ি পেরিয়ে এলাম। ঠকঠকির দিশা এখন কোথায়! সবই যে নীরব হয়ে পড়েছে। তবু তার মাঝেই বাড়ি-ফেরতা একজন-দু'জনের চলাচল। আমিই হাঁটছি। দু'তিন হাত সামনে আমার লাল বসনের পৃথুল সেই মহিলা। হাঁটু সমান জটা। দুই বাহুর রুদ্রাক্ষের বলয় পেছন থেকেও বেশ বোঝা যাচ্ছে। ডান হাতের কব্জির বলয়টিও স্পষ্ট; উঁচু করে ত্রিশূল ধরার কারণে। ত্রিশূলে সিঁদুরের চক চক। বাঁ-বগলে ছোট লাল ঝোলা। স্বাস্থ্যের প্রচণ্ড দীপ্তি পেছন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। অনুমেয় বয়স পেছন হতেই লক্‌লক্ করছে। দেহে যৌবনের প্লাবন একেবারেই আর নেই। কণ্ঠে নারীত্বের কমনীতার লেশমাত্র যে নেই তা তো দুপুরেই টের পেয়ে গেছি। রং বেশ গৌরবর্ণের। আগত পূর্ণিমার খানিকটা গোল চাঁদে সেই ঝলক পেছন থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভৈরবী চলেছেন নিবিষ্ট মনে। পথে কেবল একবারই পথচারীর কুশল বিনিময়ে ঘাড় নেড়েছেন তিনি। কথা বলেননি কোনও। পেছন-পেছন আমি। ভাবছি ভৈরবী কি আমার চলার আওয়াজ টের পাচ্ছেন! বুঝছেন কি তাঁকে আমি অনুসরণ করছি। কঠিন পায়ে চলেছেন ভৈরবী। হাঁটার ছন্দভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, ভৈরবী পদব্রজে অনেক পথই পরিক্রমা করেছেন। গঙ্গার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ঘাট পেরিয়ে ভেজা মাটির আঘাটায়। জলে পা ডুবিয়ে বাঁ-বগলের ঝোলাটা ঘুরে-না-তাকিয়েই বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। যেন তিনি কারওকে সেটি ধরবার জন্য দিচ্ছেন। তাঁর এবং আমার মধ্যে দূরত্ব এখন হাত চারেকের বেশি নয়। ভাবছি, ভৈরবী কি বুঝেছেন আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে? সারা পথের অনুসরণকারী আমি— এটা বুঝেও তিনি মুখরা হয়ে ওঠেননি এতক্ষণ, যেটা

অসম্ভব; অন্তত তাঁর সকালের ব্যবহার নিরিখে। আমার ভাবনায় যেন বিস্ফোরণ ঘটালেন ভৈরবী। ডান হাতের ত্রিশূলটা সজোরে পাড়ের কাঁদায় গেঁথে দিয়ে বললেন, কী রে পুঁটলিটা ধর। কাঁদা মাখামাখির মধ্যে রাখব নাকি আমি। তন্ত্র জানতে ছুটে বেড়াচ্ছিস এ-ঘাট সে-ঘাট আর তান্ত্রিকের জিনিস ধরে দাঁড়াতে আপত্তি। তোরা হলি গিয়ে বাবু মাল সব। মোট বইতে অপমান। পাশভরা মানুষ। তন্ত্র তোদের কোন ভগবানের হদিশ দেবে শুনি? তা এসেছিস যখন কৌতূহলে, না হয় বোঝাই একটু ব না।

ভৈরবীর এত চড়া কথার মাঝখানে কখন যে আমার হাতে পুঁটলিটা চলে এসেছে; হাত বাড়িয়ে আমি ধরে নিয়েছি, সে খেয়াল আমার নেই। আমি যেন সম্মোহিত। এত কথা ভৈরবী বলছেন সবই আমার পিছন ফিরে। আমি তাঁর পাশাপাশি যাওয়ারও চেষ্টা করিনি। আর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মানে তো ভৈরবীর অবস্থানে আমাকে জলে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। সে তো আর হওয়ার নয়। তাছাড়া ভৈরবী যদি রেগে ওঠেন, আগেকার রূপ ধারণ করে একেবারে ত্রিসীমানা থেকে সরে যেতে বলেন, দুপুরে যেমন বলেছেন! তার চে' বাবা চুপচাপ মৌনী সেজে দাঁড়িয়ে যাওয়াই ভাল। এ পথে দেখেছি আনুগত্যে সাড়া মেলে বেশি। আমি তাই কোনও কথা বললাম না। ঝাঁঝালো বাণী শুনিয়ে ভৈরবী নেমে গেলেন জলে। তখনও পর্যন্ত তাঁকে সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। চারধার শুনশান। পাখি ডাকছে। মনে হচ্ছে বেশ রাত নেমে এসেছে এখানে। অথচ ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে আটটা মতো বাজে। দু'একটা কুকুরের ঘোরাফেরা; হঠাৎ-হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ, পাখিদের অগোচরে ডেকে ওঠার মাঝখানেই ভৈরবী উধাও। মাঝ কোমর জলে দেখার পর শেষ একবার দেখলাম খালি গলা জলে। ভাবলাম, জলে বোধহয় ডুবে আছেন। কিন্তু কতক্ষণ। মিনিট দশেক পার হয়ে গেল। তখনও জল থেকে উঠে এলেন না ভৈরবী। এদিকে আঘাটা ফাঁকা। কোলাহলহীন। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব মায়ের গতিবিধির কথা। ভেতরে এই ভাবনার অনুপলেই এক জেলে-নৌকো আঘাটায় এসে থেমে গেল। মাঝি ভাই মাছের হাঁড়ি নামাতে-নামাতে আমার দিকে ফিরে বললেন, এখনও মিনিট দশ দাঁড়াতে হবে গো। মা গিয়ে উঠেছেন ওদিকের চরায়। অশথের তলায় ভোলেবাবার থানে মন্ত্র কইছেন দেখে এলুম।

বললাম— আমি মায়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছি বুঝলেন কীভাবে?

— শোন কথা। হাতে আপনের মায়ের ঝোলা। ও দেখে বুঝতে পারব নি! সকাল-বিকেল দু'বেলা স্নান সারছেন তিনি। সাঁতরে ওধারে উঠছেন। মন্ত্র কইছেন। এ তো বছরভর দেখে আসছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডাও নদী পেরোচ্ছেন তিনি। দম আছে তেনার।

— কতদিন ধরে দেখছেন মা-কে?

— এয়েছেন তো বছর ঘুরে গেছে। এলাকার উপকারও করেছেন কত। তাবিজ-কবজ দেন। ওযুধপত্তর ভাল জানেন। জড়িবুটি দেন। জ্বরজ্বারি সারে। বাতের তেল করেন। বিনা পসায় বিলি করেন সব। তবে মেজাজ সব সময় ভাল থাকে না। দূরান্তের মনিষ্যিরা আসে। তাঁর ভক্তশিষ্য সব। কামেখ্যে মন্দিরে আগে যিনি সাধু ছিলেন, মায়ের গুরুদেব। তিনি দেহ রাখবার পরই মা সেই যে এলেন, এখন অবদি রয়েছেন। তবে মাঝে-সাজে দুবরাজপুর ছোটেন। সেখানে মায়ের আছ্রম আছে।

গঙ্গার জোয়ার আসছে। স্রোত আঘাত করছে পাড়ে। হালকা ছলাৎ কানে এসে লাগছে জায়গার নির্জনতায়। আমার হাতে পোঁটলা ধরা। মাঝি নৌকো নোঙর করে মাছের হাঁড়িতে বোঝাই চকচকে চুনো নিয়ে যাওয়ার পর-পরই গঙ্গায় চোখ ফেরাতেই দেখি কোমর জলে ভৈরবী দাঁড়িয়ে। স্নানে নামার সময় তো পেছন-ঘোরা অবস্থায় তাঁকে দেখেছিলাম। এই প্রথম আসার এতক্ষণ পর সামনা-সামনি আমার ভৈরবী দর্শন হল। সিক্তবসনা তন্বী যুবতীর মতো তিনি এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন জল থেকে উঠে এসে। উত্তুঙ্গ স্তনযুগলের হেম আভা তাঁর লাল কাপড় ভেদ করে যেন ফুটে বেরোচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তাঁর প্রায় হাঁটু লম্বা জটা থেকে। সিক্ত বসন এমনভাবে লেপ্টালেপ্টি হয়ে আছে যে নাভিদেশের ভাঁজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ভৈরবীর। বিদ্যুৎভরা চোখ নিয়ে তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে ইশারায় তাঁর দেওয়া পোঁটলাটা চেয়ে নিলেন। আর আশ্চর্য, আমার পুরুষত্বকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তিনি আমার সামনেই তার কাপড় ছাড়তে লাগলেন। আমি স্বাভাবিক লজ্জায় একটু সরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ভৈরবী তাঁর কঠিন হাতে আমার হাতকে পিষে ধরলেন যেন। হাতভর্তি পলার দাপট নেই। কব্জিতে রুদ্রাক্ষের বলয়। আমার হাতের সাড় যেন হারিয়ে গেল তাঁর বজ্রমুষ্ঠিতে। তিনি আমার হাতটিকে তুলে স্তনযুগলের একটিতে সজোরে থাবার মতো বসিয়ে দিয়ে খুব কাছাকছি সরে এলেন আমার একেবারে গায়ে। সঙ্কোচ আর অবচেতনায় আমি দিশেহারা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম ভৈরবীর গা ঘেঁষে। হাসতে থাকলেন ভৈরবী। তাঁর হাসিতে তাচ্ছিল্যের দিব্যভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকল। এত তার আওয়াজ। ভয় পেয়ে গেলাম। ভৈরবী বললেন, কাঁপছিস কেন তুই? ভেবেছিস তোকে আমি সম্ভোগে টেনে নেব। কাপুরুষ কোথাকার।

একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম।

তিনি বললেন, নারীর স্তন ছুঁয়েছিস কোনওদিন?

উত্তর করলাম না আমি।

আবার তিনি হাসতে লাগলেন। আমার হাতটিকে যুগলের আরেকটিতে পিষে ছেড়ে দিলেন।

তখন আমি দর দর করে ঘামছি। আর তিনি সজোরে হাসছেন।

শুকনো কাপড় পরার পর তিনি এবার আমার মাথায় হাত রাখলেন।

এইবার মনে হল স্নেহময়ী এক জননীর স্পর্শ ঘটেছে আমার শরীরে।

আমি স্বস্তিবোধ করতে থাকলাম।

ভৈরবী বললেন, নারীর কামিনীভাব আর মাতৃভাব দুটোই আরোপিত রে। একই শরীরে দুই রূপ। কামিনীভাবেই সম্ভোগে সৃষ্টি আসে। প্রাণ আসে। সন্তান ধারণ করে নারী। জননী হয়ে ওঠে সে। মায়ের যে স্তন নাড়াচাড়া করে; তার থেকে দুধ টেনে খেয়ে তুই বড় হয়েছিস সে তো জননীর স্তন। তোর বাপ কামিনীর স্তন নাড়াচাড়ায় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করেছিল। তুইও একদিন তাই-ই করবি। এই তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তন্ত্র এই প্রক্রিয়াকে মারে। তোর তো ভোগই হয়নি। যোগ হবে কীভাবে!

স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে হয় যোগ মা?

বললেন— কামে নারী নারী থাকে। পুরুষ কামের দাসত্ব করে বলে নারীর শক্তিকে জাগাতে পারে না, কিন্তু যোগে নারী যখন ভৈরবী হয় আর পুরুষ ভৈরব তখন পুরুষের কামের দাসত্ব ছিঁড়ে পেলে নারী তার ভেতরে শক্তির জাগরণে সাহায্য করে।

বললাম— কিছু কিছু আমি এইসব বইপত্রে পড়েছি।

বললেন— তন্ত্র কী পড়বার জিনিস বাবা! তন্ত্র করবার জিনিস। এ যে সম্পূর্ণ ক্রিয়াযোগ। তোমার ভেতরে এ যোগ আসছে বোধহয়। শরীর রচনা করো আগে। শক্তিমান হও। ভাবমার্গে বিচরণ করো। তবে আপনেই তোমার জিজ্ঞাসা সব কেটে যাবে। চিন্তা কী। এ পথে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার লক্ষণ আছে শক্তির জাগরণের।

কথা বলতে বলতে মা তাঁর স্নেহময়ী রূপ আরও প্রকট করলেন। বললেন, কাল আসিস তোকে আমি শক্তি তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবো। জান বোঝ। দ্যাখ লৌকিকতার মধ্যে কত অলৌকিকের ছোঁয়া আছে যা ভগবানের স্বরূপ ধরতে সাহায্য করে।

ভৈরবীর সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছে— সেই আনন্দ নিয়ে যবনের আখড়ায় ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, মায়ের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করার দিন তো কালকেই আসবে রাতটা পেরোলে। ধড়াস্ ধড়াস্ আনন্দে তখন আমার শরীর কাঁপতে

থাকল। তবু আমি কিছু আগের সেই দিশেহারা কাঁপুনিকে কিছুতেই আর মনে করতে চাই না। চাই না দেখতে আর মায়ের অমন রূপ। যে রূপে আমার বুকের তরঙ্গে তন্ত্র জিজ্ঞাসার ব্যাকুল চিত্ত পর্যন্ত মরে যায়।

মা যে নারী-পুরুষের একাত্মভাবের কথা বলছেন সেটা নতুন কোনও চিন্তনসূত্র নয় তন্ত্রক্রিয়ায়। মা আসলে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টিই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন প্রথম সাক্ষাতে। তন্ত্রশাস্ত্র নারী-পুরুষ বা প্রকৃতি-পুরুষের একাত্মভাবকে 'ব্রহ্ম' হিসেবে দেখছে। এই ব্রহ্মময় স্বরূপ দিয়েই পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেখানে— 'শিবঃ প্রধানঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা। /শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ'।।অর্থাৎ শিবই হলেন পরম পুরুষ এবং শক্তি পরমা প্রকৃতি। তত্ত্বদর্শী যোগীগণ প্রকৃতি-পুরুষের একাত্মতাকে ব্রহ্ম বলে ভাবছেন। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে যে, পুরুষ কীভাবে শিব হয়ে উঠছেন? আর নারী কীভাবেই বা শক্তিময়ীর রূপ পাচ্ছেন?

ভৈরবীকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শিব বলতে আপনি কী বোঝেন?

বললেন— শিব হলেন গিয়ে পরম শূন্যতা। যার কোনও বোধ নেই, আলোড়ন নেই, শিহরণও নেই। শিবের হাতে ডমরু কেন দেওয়া হয়েছে জানিস?

বললাম— কেন মা?

— কেন আবার! যার কোনও সানা নেই তার শব্দ থাকবে কোথা থেকে। নিরাকার শূন্যতাকে সাধক বাজাতে পারেন বলেই তো তিনি শিব হয়ে উঠতে পারেন। শিব হল আদি ছন্দ। সঙ্গীতও বলতে পারিস তুই। এই জন্যই তো মহাদেবের হাতে ডমরু ধরানো হয়েছে। দেখেছিস কোনওদিন এই যন্ত্র?

— হ্যাঁ। ডমরু দু'দিক থেকে বাজে। খোলের মতো।

— ঠিক বলেছিস। এই দু'দিকেই রয়েছে লয় আর ধ্বংস।

বললাম— ঠিক স্পষ্ট হল না মা।

বললেন— লয় কী?

— বিনাশ।

— ঠিকই বলেছিস। তবে তন্ত্রে লয় হল গিয়ে বুঝলি, নিজের সত্তার অস্তিত্বকে পুরোপুরি নষ্ট করে নেওয়া। লয় তাই বিনাশ ঠিকই। কিন্তু এই নাশে স্থিতি আসে রে। স্থিতি। জিজ্ঞাসা করলাম, কীসের স্থিতি?

বললেন— তালের, ছন্দের। প্রচণ্ড ঝড়কে মহাপ্রলয় বলি তো আমরা। মনে কর যোগে কুণ্ডলিনী জাগলে পরে শরীরের মধ্যে মহাপ্রলয় হয়। তখনই শরীর পরম শূন্যতাতে ডুবে যায়। শিবদশা চলে আসে শরীরে। পুরুষ এভাবেই শক্তির

আরাধনা করে শিব হয়ে। নারী নিজে শক্তি হলে হবে কী, সেও যোগে প্রথমে শিবকে জাগায় রে। স্থূল শরীরের প্রলয় ঘটলেই শিব আসে শরীরে। তারপর শক্তিকে আবার জাগিয়ে তোলে শক্তিময়ী।

ভৈরবী যা বলছেন, তা প্রথম অবস্থা বা আদি অবস্থাতে ফিরে যাওয়ার কথা। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে শব্দ উঠেছিল তাকে বলা হচ্ছে ওঁ। এই শব্দই প্রলয়ে ডুবে যায়। ছন্দ ও সুরে সেই শব্দই ছন্দময় তালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একতানে রেখে দিয়েছে বলা হচ্ছে। প্রলয়ে সৃষ্টির বিনাশ হলেও একটি বিন্দু বা নাদের অস্তিত্ব কিন্তু অবশ্যই থাকে। যা মহাশূন্যে ঘনীভূত শক্তির বিস্ফোরণজাত আলো। একেই অভিহিত করা হচ্ছে সৃষ্টির অপরিচ্ছন্ন জ্যোতি হিসেবে। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় undifferentiated plasma. যাকে পশ্যন্তি শব্দও বলা চলে।

শিবের মাথাতে যে বাঁকা চাঁদ তা কিন্তু প্রতীকপূর্ণই বলা চলে। ভৈরবী সাধকের পরম শূন্যতাকে শিব বলছেন। এই শূন্যতাতেই সাধকের মনে অন্তর্চেতনার জন্ম হচ্ছে। চেতনাকে নাদ পূর্ণ বলা হয়ে থাকে। নাদ অর্থ যে শব্দ সবে শুরু হয়েছে কিন্তু প্রকাশ ঘটেনি। ইংরেজিতে বলা চলে Inchoate sound. এই নাদের পথই শব্দের আসা-যাওয়া চলতে-চলতে সাধক পরম শূন্যতায় অবস্থান করেন। কীসের শব্দ এই স্তরে সাধক আসলে শুনতে পান? অবশ্যই সেটি শ্বাসশব্দ। কুণ্ডলিনী যখন দেহস্তরের চূড়ান্ত পর্যায় সহস্রারে এসে ঠেকে তখন শ্বাসাবেগে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। শরীর হালকা হয়ে পড়ে। কুণ্ডলিনী শরীরের চতুর্থ চক্র অনাহততেই পৌঁছলে সাধক বলেন তিনি শব্দ শুনতে পান। কেউ বলেন কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ, কেউ আবার শিবের ডমরুর শব্দ। আসলে শরীরের ভেতরকার শক্তি জাগরণের ফলে ক্রিয়াযোগের নিয়ন্ত্রণহীন শব্দ এসব। স্থূল শরীরের আবরণ খসলেই শ্বাসক্রিয়ার প্রচণ্ড বেগাবেগ সব। যেগুলো সাধকের প্রতীক কল্পনার আধারে ধ্বনিত হয়।

শিরে চন্দ্রকে শিব ধরে রেখেছেন কেন? ভৈরবী মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমায়।

বললাম— শিবকে শূন্যতা বলছেন। শূন্যতা কখনও ডোবে আবার কখনও জেগে ওঠে যা চাঁদসম শরীরের ভেতরকার জ্যোতি।

বললেন— কাছাকাছি গেছিস তুই। তোর হবে। বোধ আছে। যোগ নেই তোর। যোগ তৈরি করলেই বোধ যুক্তি সবই তোর ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। তখন কেবল থাকবে তোর শক্তির শূন্যতা। শূন্যতার শক্তি বাসা বাঁধবে তোর শরীরে। সেই উপলব্ধিতে কোথায় চলে যাবে তোর বোধযুক্তি। যুক্তিবোধ। সব কেয়ে নেবে

তোর সিদ্ধ শরীর। 'ব্রহ্মসূত্রে'র প্রথম সূত্রতেই বলা হয়েছে : 'অথ অতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' মানে হল চূড়ান্ত সত্যকে জানার ইচ্ছা দেখা দিয়েছে এখন। এর অর্থ কী জানিস?

— কী?

— 'অথ' কথার অর্থ হল যখন আধ্যাত্ম সত্যকে জানার ইচ্ছা প্রবলতর হয়ে পড়ে।

বললাম— ওতো আমার কৌতূহল।

বললেন— তোর বয়সী কত-কত তো মানুষ আছে, তাদের তো হয় না এই কৌতূহল। তোর হল কেন?

বললাম— কেন?

— কারণ তোর ওই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আসছে মনে। যার-যার তা হয়েছে তারা সকলে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য মায়ার ডোর ছিঁড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে পথ। সত্যই হল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। যা জানবার জন্য তুই কাল থেকে ঘুরঘুর করছিস। আজ এসেছিস সকালবেলা। জানি তুই তন্ত্র করবি না। তবু তোকে কেন বলছি এসব জানিস?

রীতিমতো আমি চমকে গেলাম।

বললাম— বুঝলেন কী করে যে, আমি তন্ত্র করব না?

মুচকি হাসলেন ভৈরবী।

বললেন— গুরুকুলে বড় হওয়া মেয়ে আমি। আমার মা ছিলেন সিদ্ধাই ভৈরবী। ঠাকুমা জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন। বনগাঁ-গোপালনগরের পুরনো মানুষদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবি। শেষ জীবনে ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াতেন পথে। যাকে ছুঁতেন তারই চমৎকার হত।

বললাম— সুশীলা ভৈরবী!

ঘাড় নাড়লেন যোগমায়া ভৈরবী।

বললেন— বললাম না, তোর পথ হল যুক্তি-তর্কের পথ। বিচারের পথ। এসব করে তুই ঈশ্বরকে লিখবি। আমাদের সাধন-অস্তিত্বকে চিহ্নিত করবি। কালই বুঝেছি তোর পথ। কিন্তু মুস্কিল কী জানিস বাবা, যুক্তিক্রমে সব অনুভূতি আসে না যে। স্নেহ, স্বপ্ন, কল্পনা, প্রেম— এগুলো কোনও যুক্তি মানে? এগুলো প্রতীক মানে? ঈশ্বরের মতো।

বললাম— চাঁদের বিষয়টা স্পষ্ট হল না কিন্তু।

ভৈরবী বললেন— তোর ঝোলার ভেতর টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেট শেষ হয়েছে। খুট্ করে শব্দ হয়েছে যে। একথা আর উঠবে না। তুই বের করে সামনেই

রাখ। ক্যাসেট পাল্টা। তোকে বলব যা তোর জিজ্ঞাসা। তবে একটা কথা, আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর দেবো না। বরং মেরে তাড়াব।

বললাম— নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। আমি জানি পূর্বজীবনের কথা সাধক সাধিকাদের বলতে নেই কখনও।

বললেন— বুদ্ধিমান ছেলে তুই। তবে বাবা যখন লিখবি, বই বেরোবে সবাইকে যৌনাচারী মাতাল হিসেবে দেখাস না। পথটা ভুল নয়। সাধক হয়তো ভ্রষ্ট। তা কোন পথে বাবা ব্যভিচারী নেই। পাশ-ফেল নেই! হতাশা নেই! সুযোগসন্ধানী নেই! সব পথে আছে। আধ্যাত্মজগতও একটা পথ তো। না হলে তুই বা ঘুরে মরছিস কেন? তোর আমার পার্থক্য শুধু এই— সাধন অস্তিত্বকে নাড়াঘাটা করা তোর কাজ। আমার কাজ উপলব্ধির স্তরে থাকা। সেই স্তরের যতটা দেওয়া যায় ততটা তোকে দেবো। জানি তুই নেড়ে-ঘেটে হেগে রাখবি। তোদের চিনি তো। দুই পথের মানুষ আমাদের কাছে আসে। ক, জানতে-বুঝতে। বিদ্বান সব লেখকের দল। দুই, মাতাল আর গাঁজারু। ফোকোটিয়া নেশাবস্তু মিলবে বলে মা-মা করে।

— ভক্তও তো আসে? না কি?

— তাদের তো জিজ্ঞাসা থাকে না। নেশা করার উদ্দেশ্য থাকে না। তারা কেউ জ্বালায় না। ভক্তিভাবে আসে ও ফিরে যায়।

বললাম— শিবের চাঁদ প্রতীকটা এবার যদি বলেন।

— কুণ্ডলিনীশক্তি যখন আজ্ঞা চক্রে প্রবেশ করে তখন সেখানে জ্যোতির জগৎ প্রকাশিত হয়। চন্দ্রজ্যোতি কিরণ ছড়াতে থাকে। যা ব্রহ্মারন্ধ্রে শিরে পর্যন্ত উঠে যায়। সাধক শিব হলে সেই জ্যোতি তো তার চাঁদই হল রে।

যোগশাস্ত্র বলছে আজ্ঞা চক্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতা আছে। সাধক একে, সত্ত্ব, রজ, তম হিসেবেও মানছেন। স্পষ্ট করছেন। চিহ্নিত করছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আধ্যাত্ম ধারণাতে ভাবলে কিন্তু একই সত্য বা পরমের তিনটি দিক। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু পালন করেন। শিব ধ্বংস করেন। সৃষ্টি , পালন, ধ্বংস সবই তো সাধন শরীরে পরম শূন্যতার জন্যই। আমাদের শাস্ত্র একে বলছে 'ব্রহ্মাণ'। যার কোনও লিঙ্গ নেই। এর কোনওরূপ নারী-পুরুষের ভাগ নেই। আধ্যাত্মবাদ বলছে নিস্তরঙ্গ সত্য বা পরমের কথা। বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে একে Psychic mind field-এ রাখা যায়। ঘনীভূত বস্তুকে ব্রহ্মা বলা যায়। বস্তু বিজ্ঞানের মতাদর্শে যা হল Material manifestation of psychic mind field ব্রহ্মা তাহলে এখানে এল আধ্যাত্মবাদে পুরুষ ও প্রকৃতির একাত্মবোধ। Principle of Expression বলা চলে ইংরেজিতে। জগৎ তৈরি হলেই পালনের প্রশ্ন। তখনই বিষ্ণুর আগমন। বিজ্ঞান একে বলছে Neutron field. পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনার যে

তৈরি হয়ে ওঠা একেই বিষ্ণুনামে রাখাই যায়। বিজ্ঞানযুক্তিতে একে বলা যেতেই পারে ইংরেজি তর্জমায় Phenomenon of space. আর বাকি রইল কেবল ধ্বংস। শিব। যা বস্তুপুঞ্জের আঘাতজনিত গতিবেগ থেকেই সৃষ্টি। শিবরূপ এই শূন্যতাকে বা শূন্যতার উৎপত্তি রূপকে বলাই যায় Motion. বিজ্ঞানের ভাষায় নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলেই সৃষ্টির উপাদানের উৎপত্তি হয়েছে। এখানে কিন্তু সেই আধ্যাত্মবাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের চরিত্র ধরা পড়ে। নিউট্রন = ব্রহ্মা, প্রোটন = বিষ্ণু, ইলেকট্রন = শিব। প্রোটন ও ইলেকট্রন যেখানে থাকছে সেটা হচ্ছে গতিময় দেশ (space)। প্রোটন আর ইলেকট্রন তো একটা নির্দিষ্ট গতিবেগে ঘুরে চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই বেগ কমে গেলে ইলেকট্রন প্রোটনের গায়ে এসে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হবে। তখনই জন্ম নিয়ে নেবে শিব। আমরা যদি নটরাজের নৃত্যময় মূর্তি ভঙ্গিটিকেও কেউ আলোচনায় সামনে আনি তাহলে দেখব সেই ছন্দময় লয়কেই। যা মহাজাগতিক চিত্রও বটে। আবার শারীরিক যোগ ক্রিয়ারও ছবি। এই মূর্তিতে তো আমাদের প্রতিদিনকার জন্ম-মৃত্যুর ছন্দায়িত রূপও ফুটে উঠেছে। এই মূর্তিই ইঙ্গিত রাখছে জগতের বিচিত্র রূপের মায়াকে। তার ভঙ্গিমাকে আমরা বিশ্বরূপের মায়া হিসেবে দেখতে পারি। নটরাজ মূর্তির তরঙ্গায়িত হাতের ভঙ্গিমা, পদদ্বয়, বাঁকাচোরা দেহের মধ্যভাগ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সদা তৎপর জন্মপ্রবাহ মৃত্যু-প্রবাহকেই স্পষ্ট করছে। দুই হাতে তার জন্ম আর মৃত্যুর সমতা। বাকি দুই হাতের একহাতে ধ্বংস অপর হাতে সৃষ্টির ইশারা। নটরাজ মূর্তির ওপরের ডান হাতে যে ডমরু তাকে তো Big Bang-এর বিস্ফোরণের শব্দ বলতেই পারি। আধ্যাত্মবাদে যা কিনা হয়েছে ওঁ। বলা হচ্ছে যে এর দ্বারাই জগত সৃষ্ট। ওপরের বাঁ হাতে আগুনের লেলিহান শিখা ধরে থাকার অর্থ কিন্তু মৃত্যুরই নিশানা। দুই হাত এমনভাবে প্রসারিত যা গতিময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম ও মৃত্যু দ্যোতব ইশারাকেই যেন জাগ্রত করছে। মূর্তির মুখাবয়বে যে নিরাসক্তি তা কিন্তু জন্ম-মৃত্যু ছাপিয়ে বেঁচে থাকার প্রসস্তিকেই বারে বারে জাগ্রত করেছে। দ্বিতীয় ডান হাতের মুদ্রা কিন্তু ভয় না পাওয়ার মন্ত্ররূপটিকেই দেখাচ্ছে যেন, আর বাঁ হাতটি উত্থিত বাঁ-পাকে নির্দেশ করে বোঝাচ্ছে যেন মায়ামুক্তিরই কথা। নটরাজ নাচ করছেন কিন্তু দৈত্যের পিঠে। এ দৈত্য কী? দৈত্য হল আমাদেরই অজ্ঞানতার স্বরূপ। সাধনার জন্য এই অজ্ঞানতাকে দূর করতে হবে। সে সাধনা যোগসাধনা আধ্যাত্ম সাধনা ঈশ্বর সাধনা যেমন, তেমনই একে বলা চলতে পারে জীবন সাধনা। দেবদেবীর মূর্তিগুলো কিন্তু সব সময়ই জীবনের প্রসারতাকে স্পষ্ট করেছে। মৃন্ময় রূপের কারসাজিকে জীবন তাই কখনও যুক্তিযুক্ততায় কোনওভাবেই খারিজ করতে পারবে না। এমনই ভেবেচিন্তে প্রতীককে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে।

যোগমায়া ভৈরবী শিবময়তার মধ্যেই শক্তির জাগরণ করতে-করতেই আমাকে বলেছিলেন, মহাশক্তির হাতে ত্রিশূল দেওয়া হয় কেন? এর ব্যাখ্যা কি আছে তোর কাছে?

বললাম— ত্রিশূল শরীরের তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজ আর তম।

ভৈরবী বললেন, একেবারে ঠিক ধরেছিস তুই। তিন গুণ শরীরে না এলে শক্তি জাগবে কীভাবে শুনি! শক্তি বলতে তোরা তো বুঝিস শুধু কাম। ভাবিস ভৈরব ভৈরবী সারাক্ষণই শুধু তোদের মতো জড়াজড়ি করে। যখন-তখন। তা যে কত ভুল তোদের বোঝাবে কে! তা তোদের বুঝ তোরা বোঝ। জড়াজড়ি করে মর। ত্রিশূলের ত্রিকোণে দ্যাখ যোনি আছে। কামযোনি। কামাখ্যাতেই তাকে নাশ করতে হয়।

বলতে বলতেই মা বললেন, চল ভোগারতির সময় হয়েছে মন্দিরে যাই। যবনেরও আখড়াতেও কর্তাল তখন বাজাচ্ছে আর শক্তিপীঠের ঘণ্টার দাপটও কানে আসছে মন্দিরে যেতে-যেতে। ভাবছি, পুরুষ-নারীর যুগ্ম নকশারূপই আসলে আমাদের ইন্দ্রিয়চেতন আইডিয়া। ইংরাজিতে যাকে বলা চলে Reprsentationes sensitivae. যার ছড়ানো সংবিৎ দেহের সংবেদনকে জাগিয়ে তোলে। মা সেই অনুভূতিতেই শক্তিতত্ত্বকে জাগাচ্ছিলেন এতক্ষণ। আমি দেখলাম মন্দিরের দেবীর শরীরেও সেই মনোহরণের লালিত্য লেগে। এভাবে আমি কখনও দেবীমূর্তি দর্শন করিনি। আগে যোগযুক্তিকতায়। আমার জোড় হাত আপনা আপনিই যেন বুকের কাছে উঠে এল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি বিকেল-বিকেলই থেমে গেল। মা বললেন, ছ্যাঁক দিয়েছে গো এবার। ছ্যাঁক দিয়েছে। হোমকুণ্ডটা এখনই করে ফেলো সব। সারারাত হোম হবে আজ। দেখলাম অম্বিকা ভৈরব আর খুশি ভেরবী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কুণ্ড তত্ত্বাবধানে। দুবরাজপুর থেকে ভোর-ভোর এসে পৌঁছেছেন দু'জন। ইতিমধ্যে আলাপ হয়ে গিয়েছে। যোগমায়া মা-ই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে বলেছেন, জিজ্ঞাসু মানুষজন। করণক্রিয়ার যতটা পারা যায় বিস্তারিত বলবেন। ওর ধর্মাজিজ্ঞাসার কাছে লাগবে।

অম্বিকা ভৈরব বললেন, আসেন কর্তা। আপনে সাথে থাকেন। হোমে আঁকাবুঁকির করণক্রিয়া জানা আছে কিছু আপনের?

বললাম— কিছু কিছু জানি। তবে আজ আপনার মুখে শুনতে চাই।

ভৈরব বললেন— যজ্ঞাগ্নির তাপে থাকা ভাল। আপনের ভুলচুক সব পুড়ায়ে ছাই করে দেবেন অগ্নি। আগুনও তো শক্তিদায়ক। হোমে তো শক্তিকেই বাঁধা হয় কর্তা।

বললাম— কুণ্ডলিনীর আগুনও তো ফলদায়ক বলে শুনেছি।

ভৈরবী বললেন— আপনের কথা ঠিক। তবে জানেন কী তন্ত্রে যে হোমের কার্য তা আপনের চেতনকে শুদ্ধ করে।

বললাম— কীভাবে?

ভৈরবী তখন হোমকুণ্ডের নীচে যন্ত্র আঁকতেই ব্যস্ত। সোজা ত্রিভুজ এঁকে ফেলেছেন তিনি। উল্টোটা আঁকতে-আঁকতে বললেন, হোমে যে মন্ত্র ব্যবহার এর কাণ কী জানা আছে আপনের?

বললাম— আপনার অনুভূতি শুনি না?

হেসে উঠলেন খুশি ভৈরবী।

বললেন— অনুভূতি কী বল্লেন আপনে? বিশ্বাস, চেতন এই সব কী দেখাবার জিনিস বলেন আপনে? সবই তো অনুভূতি। অনুভূতিতেই ইচ্ছা নড়ে জানবেন। ইচ্ছা নড়লে তরঙ্গ খোলে। তাতেই ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ও যে শক্তিরূপ। মন্ত্র তো শক্তি। আপনে নিশ্চয়ই মানবেন।

বললাম— সে তো শাস্ত্রেই বলেছে : 'জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ।'

— ঠিকই বলেছেন আপনে। জপে মূর্তি সাক্ষাৎকার হয়। আপনে তো বললেন কুণ্ডলিনীর আগুনের কথা। আমরা বলি জঠরাগ্নির কথা। দেহভাণ্ডে আগুন কোনখানে জায়গা করেছেন জানেন তো?

— মণিপুরের কথা তো আপনারা বলেন।

সজোরে হেসে উঠলেন খুশি ভৈরবী। তাঁর দাঁতে পান-জর্দার ছোপ অনেকখানি বেরিয়ে এল হাসির ফোয়ারায়।

বললেন, ও কী কথার কথা! ও যে প্রমাণ। হিল্লি-দিল্লি যখন ফোন করেন তখন তো কোড দেন না কি? শরীরকে যখন ফোনের মতই তরঙ্গ পাঠিয়ে তার মধ্যেকার শক্তি জাগানোর বার্তা দেওয়া হয় তখনই চক্রগুলো সব কোড হয়ে যায়। শরীরের মণিপুরে হল গিয়ে সেই আগুনের কোড।

ভৈরব বললেন, সবই কর্তা হল গিয়ে বুঝলেন প্রাণ দ্বারা প্রাণ নাশ।

বললাম— ঠিক বুঝলাম না।

ভৈরব বললেন, মা যে বললেন আপনে জিজ্ঞাসু লোক। তা শই জিজ্ঞাসার নাশ হয়নি যে দেখছি! আরও বিস্তারিত যাবেন ক্যামনে?

বললাম— ও বুঝতে পেরেছি প্রাণ বলতে প্রাণবায়ুর কথা বলছেন।

ভৈরবী বললেন— মনের নাশ না হলে মনোবৃত্তি নষ্ট হবে না। মনের বাহক কে জানেন?

— কে?

— মনের বাহক হল গিয়ে বায়ু। বায়ুকে সম্পূর্ণ নাশ না করতে পারলে মনের নাশ হবে না কর্তা। মনের নাশ হলেই বৃত্তির নাশ। বৃত্তির উপরে না উঠতে পারলে ঈশ্বর লাভও যে হবে না। মণিপুরে আগুনের বন্দনা হোমে মন্ত্রগুণের মতোই কর্তা।

— মনের মধ্যে বৃত্তিনাশ বলছেন আপনি?

— ঠিক তাই।

ভৈরবী বললেন, মন্ত্রও মানে তো তোই। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যা আমরা বলি ভাবি নিবেদন করি তাই তো মন্ত্র।

— তাহলে হোমকুণ্ডে যে রেখাচিত্র আঁকছেন তা মনের বৃত্তিকে নষ্ট করার জন্যই একেকটি Code Language বলছেন আপনি?

— তাই তো। এই যে যন্ত্র আঁকিবুকি করলাম সোজা ত্রিভুজ আর উল্টানো ত্রিভুজ এর তো দুই মানে। প্রকৃতি আর পুরুষ।

ভৈরব বললেন, যে ত্রিভুজ ঊর্ধ্বমুখী সেটি হল লিঙ্গ আর নিম্নমুখী ত্রিভুজ যোনি, দুই ত্রিভুজ হল গিয়ে শিব ও শক্তি।

তন্ত্রশাস্ত্র এই শক্তি জাগরণের জনই কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছে আর যজ্ঞে বা হোমকুণ্ডের রেখাচিত্র বা যন্ত্র ভৈরবীর বলা কোড হিসেবে মানাই যেতে পারে অনায়াসে। মণিপুর (Solar Plexus/ Adrenols gland) শরীরের তৃতীয় পাদচক্র। নাভিদেশে এর স্থান বলা হচ্ছে। মণিপুর পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডলের কথা বলে থাকেন দেহসাধক। যার মধ্যে বলা হয় বহ্নিবীজ রং আছে। এর রঙও রক্তবর্ণ। এই বহ্নিবীজের মধ্যেই সাধক কল্পনা করেন চারহাতযুক্ত রক্তবর্ণ অগ্নিদেব মেষের পিঠে অধিষ্ঠিত আছেন। বলা হয় অগ্নিদেবের কোলেই জগন্নাশক বা জগতের আধার নামক ভগবান বিষ্ণু ভস্মভূষিত সিন্দুরবর্ণ রুদ্রবেশে ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসে আছেন। তাঁর দুই হাতে বর ও অভয়। ত্রিনয়ন তাঁর। পরিধানেও বাঘছাল। বিষ্ণুর কোলেই সাধক কল্পনা করে নেন চতুর্ভুজা সিন্দুরবর্ণা লাকিনী শক্তির। মণিপুর পদ্মের দশ দলে দশটি বৃত্তি থাকার কথাও বলা হয়। এই দশ বৃত্তি— লজ্জা, পিশুনতা, (কুৎসা), ঈর্ষা, সুষুপ্তি (গভীর নিদ্রামগ্নতা), বিষাদ, কষায় (কষা স্বাদ), তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা ও ভয়। যেগুলো সব এই পদ্মচক্রে ধ্যানে উপবেশন করলেই অগ্নি পুড়িয়ে দেয়। খুশি ভৈরবী যে ইচ্ছেশক্তির কথা বলেছেন মণিপুর চক্রে কুণ্ডলিনী তা সৃষ্টি করে। আসলে যেটা হয়, কুণ্ডলিনীশক্তি একেকটা চক্রে উঠলে একেক রকম বোধ, বর্ণ ও চিত্র দর্শন হয়। দেহের মধ্যে একেক চক্র একেক রকমের কাজ করে থাকে। মূলাধারে

কুণ্ডলিনীশক্তি দেহের প্রাণশক্তির কাজ করে। স্বাধিষ্ঠান চক্রে এই শক্তিরই প্রজনন শক্তিক্রিয়া হিসেবে দেখা মেলে। যৌনবোধ, প্রজনন ক্ষমতা ও পার্থিব সৃষ্টির প্রেরণা কুলকুণ্ডলিনীযোগে বলা হয় স্বাধিষ্ঠানেই ঘটে। মণিপুর সেই ইচ্ছেকেই বয়ে বেড়ায়। অনাহত প্রেম বা ভালবাসার সৃষ্টি করে। আজ্ঞাতে এসব নাশের ফলে অন্তর্দৃষ্টি, অনুভবশক্তি, আত্মিক ক্ষমতা— এই গুণাবলীর উদয় হয় শরীর সাধকের। সহস্রারে মানুষের জ্ঞানজগৎ সব অজ্ঞানতার জগতে গিয়ে পৌঁছে যায়। পরমাত্মার জাগরণের কথা বলা হয় এই পদ্মচক্রে ধ্যানযোগক্রিয়ায়। এই শেষ চক্রপদ্মের ঊর্ধ্বেও অনেক সাধক আরও একটি চক্রের কল্পনা রাখেন। সেটিকে বলা হয় স্টার চক্র। এর অবস্থান স্থূল শরীরের চার ইঞ্চি ওপরে। যাকে সূক্ষ্ম দেহ বা বায়োপ্লাজমিক বডি বলা যেতে পারে। মানুষের দেহের যে জেনেটিক কাঠামো কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এখানে তা ঠিকঠাক নির্ধারণ করে রাখে। সাধক বলেন বিশ্বের সমস্ত অভিজ্ঞতা এখানেই জমা হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন এটি হল আকাশী মহাফেজখানা। বাউল সাধকও শরীরকে 'মহাফেজখানা' হিসেবে চিহ্নিত করেন। 'মহাফেজ'-এর আভিধানিক অর্থ এল গিয়ে কাগজপত্ররক্ষক। ইংরেজিতে বলা চলে Record keeper. শরীরের সমস্ত অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতা এই স্তরে সামিল হয় বলেই বাউল একে 'মহাফেজখানা' বলে থাকেন। তন্ত্রসাধকও প্রায় এক মতেই সামিল। শরীরকে বিশ্বাকাশে নিয়ে গিয়ে তাই এর নাম আকাশী মহাফেজখানা। কুলকুণ্ডলিনী একেকটি চক্রে উঠে সাধকের যে মানসিক বোধ সেই বোধেই আবার বর্ণ দর্শন ও চিত্র দর্শন হয়ে থাকে। অম্বিকা ভৈরব ও খুশি ভৈরবী মণিপুরের আগুন বা জঠরাগ্নির যে কথা বলেছেন তা তো বর্ণ দর্শনই। ক্রিয়াযোগী মণিপুর চক্রে কুণ্ডলিনীশক্তি উঠে গেলে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন আকাশের যে তাপপ্রবাহ সেই মানসছবির অনুভূতির কথা বলে থাকেন। মূলাধারে রক্তিম বর্ণের কথা বলেন ক্রিয়াযোগী। বলেন এখানে ছায়া ছায়া ছবি দর্শনের কথা। অনেকে এগুলোকে অস্পষ্ট ভৌতিক ছবি বলেও উল্লেখ করেন। স্বাধিষ্ঠানে সবুজাভ বর্ণ আর ছায়া-ছায়া তরল ভাবতরঙ্গের ছবির কথা বলা হয়। মণিপুরে তাপপ্রবাহের ভেতরই সাদাটে মেঘের ফাঁকে নীলাভ বর্ণ মানস চোখে আসে ক্রিয়াযোগীর। বহু সূক্ষ্ম প্রাণীর ঘোরাফেরার কথা বলেন তাঁরা। ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ শরীরক্রিয়ায় এই তিন স্তরকে বলেন নরকের স্তর। অম্বিকা ভৈরবও সেরকম বলেছিলেন অম্বুবাচীর হোমক্রিয়ায় দিন।

বললাম— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুরকে নরক কেন বলছেন আপনি?

ভৈরব উত্তর করার আগে ভৈরবীই বললেন, আমাকে, নারী বলা হয় নরকের দ্বার। আমাদের নরক কী জানেন?

বললাম— আপনার চোখে কী নরক?

— নারীকে যে নরকের দ্বার বলা হচ্ছে তার কারণ হল পুরুষ মানুষই নারীর দ্বারকে পরিগ্রহ করে। নারীকে বিবাহ করে স্ত্রী করে নেয়। আর নারীই পুরুষ মানুষের শরীরের ভোগবাসনার আধার হয়ে ওঠে। তন্ত্রে এই তিন চক্রে নারীর শক্তিকে জাগিয়ে ভোগবৃত্তিকে মারা হয়। যে ভোগ আমাদের মানসিক যন্ত্রণা দেয়। স্থূল শরীরের ভোগবাসনা নরকেরই সমান। এই তিন চক্র হল গিয়ে নরক।

ভৈরবীর এই কথা যথার্থই ভারতীয় আধ্যাত্মবাদেরই কথা। মানুষ এই তিনটি স্তরে পদ্মচক্রে পার্থিব কামনা বা ভৈরবীর বলা ভোগবাসনাকেই আধার করে রাখে। শরীর সাধক এই তিনি চক্রপদ্মে শ্বাসক্রিয়ায় ধ্যানে জপে স্থূল শরীরে ভোগবাসনাকে নষ্ট করে সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে ওঠেন। ইংরাজি তর্জমায় পশ্চিমীরা একে বলছেন Ideoplastic Plane. শরীর জগত যখন সূক্ষ্মতাতে আসছে অনাহত চক্রপদ্মে গিয়ে, যখন স্থূলজগতের সমতার কারণে ক্রিয়াযোগী বহু স্থূল পার্থিব দৃশ্য দেখার কথা বলেন। বলেন ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে অদ্ভুত সুন্দর নীলাকাশ দেখার কথা। মানবাত্মার ছবিও ফুটে ওঠার কথা বলছেন ক্রিয়াযোগী। অগ্নিগোলকের ছুটে আসার কথা বলা হচ্ছে। আসলে শরীর যখন মহাবিশ্বের কল্পিত পরিণতি পাচ্ছে, তখন যোগে ধ্যানে নিভৃত শ্বাসখেলায় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের ছুটে চলা স্বাভাবিক। তাই সেখানে তরঙ্গিত সমুদ্র, ধূসর পাহাড়, নতুন গ্রহ-নক্ষত্রের কাল্পিক আনাগোনা মোটেই কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ক্রিয়াযোগী মানসজগতকে তো সেরকমই সদার্থক মহাবিশ্বের নামান্তর করে নিচ্ছেন যোগে মনঃসংযোগের সেই কঠিন প্রক্রিয়ায়। তাই শরীরের স্থূলতা নষ্ট হতে হতে স্থূল পারিপার্শ্বিকের আধিক্যও এক সময় কমে আসার কথা বলছেন তাঁরা। স্থূল এইসব পার্থিবতাকে বলা যেতে পারে ইংরেজি মতে Telepathic vision. তারপরই যখন সূক্ষ্মতা গ্রাস করছে শরীরকে তখনই সাধক ত্রিদেবের মূর্তির কল্পনাতে সামিল হয়ে পড়ছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। বিশুদ্ধ চক্রপদ্মে যখন কুণ্ডলিনীশক্তি চলে আসছে তখনই শরীরের জরা বা স্থূলতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ পঞ্চতত্ত্বের ব্যোমমার্গকে চিহ্নিত করে। এই অঞ্চলে যখন কুণ্ডলিনীশক্তি চলে আসে তখন ছয় ধরনের যে আমাদের স্থূল আস্বাদন শক্তি বা ছয়টি স্বাদ— মিষ্টি, টক, লবণাক্ত, তিতো, ঝাল ইত্যাদি অতিক্রম করে যায়। কুণ্ডলিনী এখানে এলে স্থূল আবরণ আর কিছুই কিন্তু থাকে না। স্থূল তিন আবরণের কথা বলা হচ্ছে শাস্ত্রে। প্রথম হল— তিন-তিনটে গুণ। সত্ত্ব, রজ, তম। তারপর ছয়টি স্বাদ। যার কথা এখুনি বললাম আর পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ উপাদান— ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। বিশুদ্ধ চক্রেই ব্যোম শেষ হয়ে

যাচ্ছে। শরীরে সূক্ষ্মতা জাগছে। শিবত্ব পাচ্ছে শরীর। শরীরে কীভাবে শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটছে খুশি ভৈরবীকে বলায় উত্তর দিয়েছিলেন, পাঁচটি চক্রে পাঁচ বীজমন্ত্র পড়তে হয় আমাদের। জানেন নিশ্চয়।

বললাম— হ্যাঁ। মূলাধারে পৃথ্বীবীজ, স্বাধিষ্ঠানে বায়ু...

বলতে দিলেন না মা আমাকে।

বললেন— বিশুদ্ধ চক্রে হং বীজ থাকে। যা আকাশকে চিহ্নিত করে। আকাশ কী?

— শূন্যতা।

— শূন্যতাই তো পরম শিব। মূলাধারের বীজ লং। এই 'হং', আর 'লং' নিয়েই শিব বুঝলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে তৈরি হল শিব?

ভৈরব বললেন, 'হং' কে 'হ'-এ আনেন আর 'লং' কে 'ল' অক্ষরে। এই 'হ' আর 'ল' কে এবার আনেন কর্তা হলাহলে। যা শিব পান করেছিলেন। কণ্ঠে ধারণ করে রেখেছিলেন। নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন।

— সাধক বিশুদ্ধ চক্রে ধ্যানে নীল রং দেখেন। তা কী জানেন?

— শুনেছি। আপনাদেরই কারও কারও মুখে। তবে আপনার মত কি?

ভৈরবী মা-র এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন কিন্তু ভৈরবই।

বললেন— নীল রং হলাহলের প্রতীক।

বললাম— শরীরে তা কীভাবে এসে গেল শুনি?

— কীভাবে আবার! হলাহল হল শরীরের পঞ্চভৌতিক উপাদান সব। যেগুলোকে নষ্ট করতে হয়। তা তো পান করাই হল না কি? তাহলে শরীর এখানে শিব হল কি না বলেন?

ভৈরব ভৈরবীর এই শারীরিক শিবত্বে স্থূল শরীরের অনিত্যতাই দূর হচ্ছে কিন্তু যোগকার্যক্রমে। ক্ষিতিকে যদি ধরি আমরা মূলাধার চক্র, অপ্ সাধিষ্ঠান, তেজ মণিপুর, মরুৎ অনাহত ও ব্যোম বিশুদ্ধ তাহলে শিব এই পাঁচ উপাদানেরই উর্ধ্বে। তিনি তাঁর দিব্যজগতকে অনিত্য উপাদান থেকে দূরে শরীরে রাখছেন। সাধকই যদি শিব হন, তবে তাঁর কণ্ঠে এইসব হলাহল থেমে আছে। বিষয়টিকে পুরোপুরি পুরাণকাহিনিতে যেন আরও সহজভাবে দেখা যেতে পারে।

সমুদ্র মন্থনে হলাহল উঠে এসেছিল। ইন্দ্রিয় মন্থন করলে হলাহলই ওঠে। সাধক ইন্দ্রিয়গুলোকে মন্থন করেই হলাহলকে ধারণ করেন। রিপু, পঞ্চভূত, তিনগুণ ও ছয় স্বাদ এগুলো সবই হলাহল সম, আর দেবতা এবং অসুর? দেবতা

হল সাধকেরই শুভযোগচিন্তা। অসুর অশুভ চিন্তার হলাহলই। তাহলে কীভাবে শরীরে দেবতা আর অসুরের যুদ্ধ চলছে? কীভাবে দেবতা অমৃতকুম্ভকে লুকিয়ে রাখছেন? ভাবা যেতেই পারে যে, অমৃত কুম্ভ হল সহস্রার পদ্মচক্রের ব্রহ্মারন্ধ্রস্থ কূটস্থান। শুভ শক্তি জাগানোর জন্যই অশুভ চিন্তার হাত থেকে অমৃত কুম্ভকে সাধক লুকিয়ে রাখছেন। তার জন্যই ব্রহ্মারন্ধ্রস্থ কূটস্থানে কুলকুণ্ডলিনী তার সর্বোচ্চ ক্রিয়াযোগে সামিল হচ্ছে। তারজন্যই শাধক শরীরের ত্রিবেণী বা ইড়া (গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা), সুষুম্নাকে কাজে লাগাচ্ছেন। বিষ, হলাহলকে বিষয় ভাবা যেতে পারে। সাংসারিক চিন্তাই সাধকের হলাহল বা বিষ। তাকে সাধক থামিয়ে রাখেন। স্থূলবোধ নাশই হল সাধকের অসুরনাশ। তার জন্যই দেবতা অসুরের যুদ্ধ। শুভ-অশুভ চিন্তার দ্বৈরথ। আর এখানেই হলাহল সব থেমে যাচ্ছে। তন্ত্র বলছে পাশ নষ্ট হচ্ছে। বলা হয় কুলকুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধার চক্রে নিদ্রিত অবস্থাতে থাকে। কুণ্ডলিনীকে সাপসমই মনে করা হয়। সাধক যদি শিব হন তবে কুণ্ডলিনীর দ্বারাই তো মন্থন চলে। হলাহল ওঠে। যা সাধক অবলীলায় পান করে অনিত্যতা বোধকে নষ্ট করে রাখেন। তখন শুভচিন্তার, শক্তিচিন্তার অমৃত উঠে আসে। শরীরকে সমুদ্রসম বা ত্রিবেণী মনে করেই সাধক তা মন্থন করেন। এই হল গিয়ে শিবত্বপ্রাপ্তির জন্যই মন্থনক্রিয়া। কুণ্ডলিনীর মন্থনক্রিয়া শুরুর পর বিশুদ্ধ চক্রে সাধক জ্ঞানের আলোকে দেখতে পারেন। যে জ্ঞানে সাধক বলেন মানুষের কর্মফলকে ব্যক্ত করা যায়। মানুষ আর ইতিহাস সম্পর্কে অকাতরে ভবিষ্যতবাণী করা যায়। তবে ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক, অলৌকিক কিছুই নয়। বরং স্পষ্ট স্বাভাবিক এক ক্রিয়া। নস্ত্রাদামু যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন একশোটি, যার মধ্যে বহুলাংশের সময় দেশ চিত্রর মিল পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ কিন্তু ক্রিয়াযোগ। বিশুদ্ধ চক্রক্রিয়ায় শরীরের কাল যখন নাশ হয়ে আসে তখন জাগতিক নাশের ছবিও দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। যার ফলে মানুষের কর্মফল পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা ইতিহাসের ভবিষ্যৎ সাধকচিত্তে জ্ঞানের আলোকে জেগে ওঠে। যে জ্ঞান অনেকাংশেই পঠনজনিত। যা যোগ নিবিষ্টতায় চিন্তাসূত্রে গ্রথিত হয়ে খানিকটা ভবিষ্যৎ হিসেবে ধরা দেয়। যার ফলে ভবিষ্যদ্বাণী কিছুটা মেলে। তবে হুবহু তা কখনও সম্ভব নয়।

পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে শরীর বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি অনেকখানিই আধুনিক মনস্কতায় দেখা যেতে পারে। যেখানে কিন্তু বহুলাংশেই বিজ্ঞানমনস্কতাও জড়িয়ে যাচ্ছে। দেহসাধক যা বলছেন, যেভাবে বলছেন, সেখানে বিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার কিছুটা হলেও ঘটছে। খুশি ভৈরবী শিবত্বপ্রাপ্তির কথা বলতে গিয়ে দক্ষযজ্ঞের কথাও কিন্তু তুলে এনেছিলেন যাতে শরীর মনস্কাতরই আধুনিক সব ছায়াপাত ঘটেছিল।

ভৈরবী আমাকে বললেন, দক্ষকে কী হিসেবে দেখবেন আপনে?

— আপনিই বলুন না?

— দক্ষ তো আসলে মানুষের মন। যা কর্মকে ধরে রাখে। সেখানকার অসৎ কর্মকে নাশ করাই তো দক্ষযজ্ঞ। আজ যে এখানে যজ্ঞ হবে যোগমায়া মায়ের পরিচালনায়, যার জন্য এত ভক্ত-শিষ্যদের আগমন, সে তো মনকেই, ইচ্ছাকেই শক্তিরূপে বাঁধার জন্যই।

জিজ্ঞাসা করলাম, ইচ্ছেকে কীভাবে বাঁধছেন আপনারা?

বললেন— ইচ্ছা তো বাঁধা পড়ে হোমাগ্নিতে আর জঠরাগ্নির কথা বাবা যে কইলেন সে সবই তো শুদ্ধ চেতনের জন্যই। মণিপুরের আগুন আ হোমাগ্নি সবই মানুষের অবচেতনকে চেতনে এনে শরীরের স্থূলতাকে সূক্ষ্মতার ভেতরে নিয়ে যাওয়া।

— কীভাবে হয় তা?

— অগ্নি তো দু'রকমের কর্তা।

ভৈরব উত্তর দিলেন।

— কী তার রকমফের?

— ভূতাগ্নি আ জঠরাগ্নি। দুই হজম করায় খাদ্যবস্তুকে। খাদ্য তো কর্তা দু'রকমের। না কি? মনের খাদ্য হজম করায় ভূতাগ্নি। আর শরীরের খাদ্য জঠরাগ্নি আর হোমাগ্নির কাছাকাছি থাকলে ভূতাগ্নিকেই পাওয়া যায়। মনের খাদ্যই তো শরীরে জারি থাকে কর্তা।

অম্বিকা ভৈরবের কথার একটা ইতিবাচক মূল্যাঙ্কন অবশ্যই আছে যোগশাস্ত্রে। যা বিজ্ঞানমনস্কতাকেও সামনে আনে কিন্তু। বিজ্ঞান বলছে যে, আগুনের বিভিন্ন ধরনের বর্ণের অর্থাৎ কিনা আলোর বিভিন্ন ধরনের বর্ণের মানব দেহ ও মনের উপর বিরাট প্রভাব রয়েছে। ভৈরব ভৈরবীর কথাও কিন্তু আগুন-বিহ্বলতারই জন্ম দেয়। আমাদের শরীরের যে Pituitary,Pineal ও Hypothalamus গ্ল্যান্ড তার উপর আগুনের যথেষ্ট প্রভাব আজ প্রমাণিত। এতে আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রও প্রভাবিত হয়। কোনও বর্ণ ক্রোধকে জাগায়, কোনওটা আনন্দকে, কোনওটা আবার মনঃসংযোগে সাহায্য করে। হোমাগ্নির আগুন সাধকের শরীরের আধ্যাত্ম আগুনের ব্যারোমিটার হিসেবেই বলা ভাল কাজটি করে। যেটিকে ভূতাগ্নি বলা চলে। ভূতাগ্নির কাজ কিন্তু শুরু হয় সূক্ষ্মদেহে। যখন কিনা দেহে প্রতীকময়তার শক্তি জাগরণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায় তখনই সাধকের সঙ্গে ভূতাগ্নির সম্বন্ধ হয়। জঠরাগ্নি থাকে স্থূল শরীরে। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না— এই প্রধান তিন নাড়িই

যথাক্রমে সূর্যনাড়ি, চন্দ্রনাড়ি, অগ্নিনাড়ি। ডান বা দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সূর্য নাড়ির (ইড়া) সঙ্গে সংযুক্ত। বাম নাসারন্ধ্রটি চন্দ্র নাড়ির (পিঙ্গলা) সঙ্গে। এই ডান নাক দিয়েই যখন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তখনই খিদে পায় আর জঠরাগ্নি জ্বলে ওঠে। আবার যখন বাঁ নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তখনই খিদে কমে যায়। শরীর ঠান্ডা থাকে। এক এক নাসায় বায়ু দেড় ঘণ্টা ক্রিয়া করে। সাধক বলেন বাঁ নাকে বায়ু ক্রিয়ার সময় বিনয়ের ভাব জাগে। স্বাভাবিকই। শরীর তখন ঠান্ডা থাকে। খিদে নেই। মনও তাই প্রফুল্ল। আর ডান নাকে বায়ুর ক্রিয়ায় প্রভুত্ব জাগে। খিদের সময় সর্বগ্রাসীতার ইন্ধন অস্বাভাবিক নয়। যখন সাধক এই দুই বায়ুপ্রবাহকে সাম্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হন তখনই প্রাণ বায়ু অগ্নি নাড়িতে (সুষুম্না) ঢুকে পড়ে। তখনই কুণ্ডলিনীশক্তি শরীরের নীচ থেকে উপরে উঠতে থাকে। সাধক সূর্য নাড়িকে (ইড়া) সাধনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। আর আমরা সাধারণ মানুষ-সূর্য নাড়ির শ্বাস-প্রশ্বাসকে জঠরাগ্নিতেই পরিণত করতে পারি। যা ভূতাগ্নিকে দুর্বল করে দেয়। সাধক ভূতাগ্নি প্রজ্জ্বলন করতে পারেন বলেই হোমাগ্নিকে শরীরে নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন খুশি ভৈরবীর বলা সেই কোডে বা প্রতীকে। ভৈরব ভৈরবী যে ইচ্ছেশক্তির কথা বলেছেন তাকেই 'ঋগ্বেদে' 'নাসদীয় সূত্রে' বলা হয়েছে 'ইচ্ছার উত্তাপ'। যা আগুনকেই চিহ্নিত করে। বিজ্ঞান বলছে 'Chaos within the Blackhole.' প্রাচীন ঋষিরা সব কাঠে-কাঠে ঘষে আগুন জ্বালতেন। আদিম যুগে চকমকির ব্যবহারও নির্দেশিত হয়েছে। গাছে গাছে ঘর্ষণে দাবানলও জ্বলে উঠেছে। সূর্যের ভেতরও এইরকম অনবরত ঘর্ষণ বা সংঘর্ষ হচ্ছে। যার ফলে তাপ বিকিরণ হয়ে চলেছে সমানে। সাধক সূক্ষ্ম শরীরে ভূতাগ্নি জ্বালছেন। বিজ্ঞান বলছে একে Bio-plasma. ক্রিয়াযোগী তপস্যার দ্বারাই এই বায়োপ্লাজমাকে উত্তেজিত করে দেন শরীরে। তারপর যেটা হয়, চোখ, কান, নাক, যে অঞ্চলে সূক্ষ্ম Bio-plasmic শরীর প্রক্রিয়াতে উত্তেজিত হয় সেই সব অঞ্চলে অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ করে ফেলেন সাধক। সাধকের যে দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, দূরঘ্রাণশক্তির কথা বলা হয় তা এভাবেই অর্জিত হয়। হোমে যেটা করা হয় প্রতীকী অর্থে ভূতাগ্নিকে আসলে জাগ্রত করা হয়। তবে তার ক্ষমতা নিশ্চয়ই কুণ্ডলিনীতে জাগরিত বায়োপ্লাজমিক শরীরের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার থেকে বেশ কম। আমাদের শরীরে যে রোগ আসে তখন দেখা যায় এই বায়োপ্লাজমিক শক্তিই কমে আসে। ভারতীয় শাস্ত্র ভূতাগ্নির যে কথা বলছেন তার সঙ্গে যে আমাদের যথেষ্ট বিজ্ঞানময়তাই যুক্ত তা কিন্তু প্রমাণিত। উপনিষদও আগুনের কথা বলছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, নারী অগ্নি, পুরুষ জ্বালানি। পুরুষ বলতে পনিষদ আসলে বলতে চেয়েছে সাধক শরীরকে।

নারী অর্থাৎ কি না শক্তিরূপ যাকে জাগিয়ে তুলছে। তাই তো হিন্দুশাস্ত্রে শক্তিপুজোর প্রতীকী চল।

হোমে যে যন্ত্রপ্রতীক তার দুটো তো শিব ও শক্তি। প্রথমে সোজা ত্রিভুজ এঁকে পুরুষাঙ্গের অবয়ব রেখে তারপর উল্টো ত্রিভুজ বা যোনি আরোপিত। এভাবেই শ্রী যন্ত্রে কতকগুলো ত্রিভুজ একে অপরকে ছেদ করে ৪৩টি ত্রিভুজ সৃষ্টি করেছে। এই ত্রিভুজগুলোর মাঝখানে রয়েছে একটি বৃত্ত। মধ্যবর্তী যে ত্রিভুজ সেটিকে মানা হয় ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর প্রতীক। যিনি ৪২টি প্রহরী দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে আছেন। যজ্ঞে যে শক্তিকে আহ্বান করা হয় যন্ত্রগুলো সেই শক্তিরই প্রতীক। জ্যোতিষীরা শ্রী যন্ত্রকে ঘরে রাখতে বলে এই কারণেই যে, শুভশক্তিকে ঘরে প্রতীকে জাগ্রত করে রাখা। এটা আর কিছুই না একটি বিশ্বাস মাত্র। তবে এটাও আবার ঠিক বিশ্বাসের শক্তি অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যজ্ঞে যে তাবিজ-কবজ তৈরি করে তান্ত্রিক জ্যোতিষীরা এখন ক্ল্যাইন্টদের হাতে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন তা হল ওই শক্তি-বিশ্বাস। এর বেশি কিছু নয়। আর এতে যে অনেকে বলেন, কাজ হচ্ছে। গুণাগুণ মিলছে। তার কারণ ধারণকারীর বিশ্বাসের শক্তিই এসব ক্ষেত্রে জাগ্রত হচ্ছে। মন্ত্রশক্তির কথাও যে বলা হয় তাও কিন্তু একপ্রকার শক্তি-বিশ্বাসই। যা উচ্চারণ মাত্র হৃদয়তরঙ্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতায় থাকে বলে ভাল ফলদায়ক হতেই পারে। বিশ্বাস থাকে মনে। এই মন যদি সুস্থ থাকে তাহলে কোনও রোগেরই সূত্রপাত হবে না। কেন না অধিকাংশ রোগেরই সূত্রপাত ঘটে মন থেকেই।

হোমে যে যন্ত্রক্রিয়া তা যেমন সম্পূর্ণ প্রতীকী শরীর জাগরণেরই ক্রিয়া, তেমনই হোমকার্য যখন সম্পন্ন হয়ে যায় তখন তাতে যে নারকেল দেওয়া হয় সেটি প্রতীকী শক্তি জাগরণেরই ইঙ্গিত। কলা আর পানও দেওয়া হয়। যা পুং এবং নারীর জননাঙ্গেরই ইঙ্গিত। বেলপাতাও তাই। ত্রিশূলসম এই পাতা যজ্ঞে দেওয়ার অর্থ শরীরের তিনটি গুণকেই বিদ্ধ করা। এই তিনগুণেই মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটে। বলা হয় সত্ত্ব, রজ ও তমগুণে ক্ষোভের সৃষ্টি। তমগুণে সংঘর্ষ হলে তর্ক, ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা ইত্যাদির দেখা মেলে। রজগুণে সংঘর্ষ বাঁধলে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সাধক তাই রজ আর তমকেই আগে নাশ করেন। তা না হলে সত্ত্ব গুণ প্রকাশ পাবে না কখনওই।

খুশি ভৈরবী হোমযজ্ঞের সমাপ্তিতে নারকেল ছুঁড়ে দেওয়া অর্থ আমাকে বুঝিয়েছিলেন। অম্বুবাচীতে প্রায় মাঝরাতে শেষ হল হোম। যোগমায়া মা ভক্ত-শিষ্যদের তখন যজ্ঞকুণ্ডের ভস্মতিলক কপালে পরিয়ে দিচ্ছেন আর তাঁরা

নমস্কার করলে তিনি 'জয় মা কামাখ্যা' বলে বারবার চেঁচিয়ে উঠছেন। তখন আবার সমবেত ধ্বনি দিচ্ছেন সবাই।

এরই ফাঁকে অম্বিকা ভৈরব আমাকে বললেন, জানেন কর্তা, কেন ভস্মতিলক কপালে এঁকে দেওয়া হচ্ছে?

আমার কপালেও তখন আঁকা হয়ে গেছে তিলক।

বললাম— কেন?

বললেন— দেবতারা ভোজন করেন ঘ্রাণে। যজ্ঞের ভস্মতিলক ঘ্রাণেরই অংশ। দেবতারা তা গ্রহণ করার পর প্রসাদস্বরূপ আমরা তা কপালে এঁকে রাখি। ও তো আর নৈবেদ্য নয় যে খাওয়া চলবে। তাই আমার একে প্রসাদ মনে করে শরীরের উচ্চস্থ জায়গায় স্থান দিই।

বললাম— এ তো কল্পনা মাত্র।

— সবই তো তাই কর্তা। অম্বুবাচীতে পৃথ্বী রজঃস্বলা। এও কী আপনে জেনেছেন?

— মনে করছি। অম্বু হচ্ছে বারিবর্ষণের সূচনা। আষাঢ়ে-শ্রাবণে যাতে ভাল বৃষ্টি হয়, ফসল হয় তারই সূচনা আমার মতে।

ভৈরব বললেন,যদি আমি বলি ও আপনার যুক্তিকল্পনা।

বললাম— তা এক অর্থে ঠিক। পৃথিবীকে দেবী মানছি আমরা। তিনি প্রথম জল বর্ষণ করছেন তাই তিনি রজঃস্রোতা হচ্ছেন এরকমই মনে করা যেতে পারে।

— এই মনে করেই তো কর্তা, যোনিপীঠ বন্ধ থাকে। আজ দেখুন সব দেবীদুয়ার বন্ধ। কেন?

— মানা হয় দেবীরা সব রজঃস্বলা হয়েছেন।

— এজন্যই আজ এই কামাখ্যাও বন্ধ। দেবী ঋতুমতী হয়েছেন। মত্ততাকে কী বলবেন কর্তা?

— অবশ্যই কাম।

— তা কাম মারতে পারাই হল গিয়ে কামাখ্যারূপ। হোমে ক্রিয়ায় আর শরীর ক্রিয়ায় তাই-ই মনে করেন সাধক।

এই সময় দেখি খুশি ভৈরবী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মস্ত সিঁদুরের টিপের ওপর ভস্মকালি।

বললেন— হোমে যে নারকেল ছুঁড়ে করণক্রিয়া বন্ধ হল তার মানে কিন্তু শরীরক্রিয়াই।

বললাম— কীভাবে?

— মনে করেন না আপনে, নারকেল আমার-আপনের মাথা। নারকেলে জল আছে, শাঁস আছে। মাথার জল রক্ত। শাঁস ঘিলু। মাথা থেকে কখন রস ক্ষরণ হয় বলেন?

জিজ্ঞাসা রেখেও ভৈরবী বলতে দিলেন না আমায়। উত্তরের ভ্রূক্ষেপ না করেই নিজেই বলে চললেন। সবে তখন ভোর হচ্ছে। দু'একটা করে পাখি ডাকছে। তার ভেতরই মা বলে চলেছেন, সহস্রারে তা হয় তো? এই সহস্রারে চিৎসত্তা চৈতন্য পায় যে। নারকেল দিয়ে শেষ মানে চৈতন্যের জাগরণে প্রতীক ক্রিয়ার সমাপন। তখন চৈতন্য আর চৈতন্য। পরমাত্মা দেহ নেই। কাম নেই। কামাখ্যায় তা নাশ হয়ে গেছে। তখন কেবল চৈতন্যের বিকাশ আর প্রকাশ।

এই বলে মা থামলেন।

আমি তখন দেখলাম ভোরের হালকা আভায় আরেক চৈতন্যের জাগরণ। এক ভক্ত নিমগ্নতায় গান ধরেছেন। কোনও দিকে তাঁর হুঁশ নেই। কামাখ্যা মায়ের বন্ধ দরজার সামনে বসে এক মনে তিনি গেয়ে চলেছেন মায়েরই গান :

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়!
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়,
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥

গান শুনছি আর ভাবছি, মদনের যাগযজ্ঞ তো শেষ হয়ে গেল। ব্রহ্মময়ীর দুয়ার খুলতে এখনও ঢের দেরি। অম্বুবাচী তিথির নিবৃত্তি হতে এখনও তিনদিন বাকি। সত্ত্ব, রজ, তম— এই তিন গুণক্ষোভের মানুষ আমরা কামাখ্যার অর্থময়তায় ভোর-ভোর বসে গান শুনছি। কিন্তু কতখানি বা আমাদের কামনার নাশ হল আজ! কেন না মানুষের কামনা-বাসনার কি কোনও শেষ আছে?

— A.B.

